ইসলামী মনোবিজ্ঞান

ISLAMIC PSYCHOLOGY

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

علم النفس الإسلامي

ইসলামী মনোবিজ্ঞান

Islamic Psychology

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

গ্রন্থকার, আহকামে যিন্দেগী, ফাযায়েলে যিন্দেগী,
ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, আহকামে হজ্জ,
বয়ান ও খুতবা, ইসলামী ভূগোল
ইসলামী ইতিহাস
প্রভৃতি।

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল আবরার

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪

www.maktabatulabrar.com

www.facebook/maktabatulabrar.com

ইসলামী মনোবিজ্ঞান
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

প্রকাশক
লেখক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশ কাল
রজব ১৪২২ হিজরি
জুলাই ২০০১ ইংরেজি

দ্বিতীয় সংস্করণ
মুহাররম ১৪২৬ হিজরি
মার্চ ২০০৫ ইংরেজি

তৃতীয় সংস্করণ
জুমাদাল উলা ১৪২২ হিজরি
জানুয়ারি ২০২১ ইংরেজি

কপিরাইট সার্টিফিকেট নং : ৭৯২০

মূল্য : ২৪০ (দুইশত চল্লিশ টাকা)

ISLAMI MONOBIGGAN
(Islamic Psychology)
Written by Maolana MD. Hemayt Uddin
Published by Maktabatul Abrar
Islami Tower, 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র

বিস্তারিত সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

দাওয়াত মনোবিজ্ঞান

Da'wat Psychology

(দ্বীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান)

চতুর্থ অধ্যায়

ইবাদত মনোবিজ্ঞান

(Worship Psychology)

পঞ্চম অধ্যায়

আচরণ মনোবিজ্ঞান

(Behaviour psychology)

(সমাজ সামাজিকতা ও শিষ্টাচার বিষয়ক)

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিবার মনোবিজ্ঞান

(Family psychology)

পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার কারণ ও তার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকার

সপ্তম অধ্যায়
শিশু মনোবিজ্ঞান
(Child Psychology)

অষ্টম অধ্যায়
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান
(Clinical Psychology)

নবম অধ্যায়

সমাজ মনোবিজ্ঞান

(Social psychology)

দশম অধ্যায়

চরিত্র মনোবিজ্ঞান

(Character Psychology)

মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৯৬৬১৯০০-১৮/৪৫৯০

Department of Psychology
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Tel: 9661900-18/4590
Fax : 880-2-865583

অভিমত

আমি মাওলানা হেদায়েতউদ্দীন সাহেবের লেখা ইসলামী মনোবিজ্ঞান বইটি গভীর আগ্রহের সাথে পড়েছি। বইটিতে তিনি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের জীবন ও আচরণের সার্বিক পরিচালন ও সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে ইসলামী জীবনবিধানসমূহের মনোবৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ও যথার্থতা কুরআন ও হাদীসের সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিসহ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। ঐশী জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ ইসলামী বিধি-বিধান ও নির্দেশনাসমূহ যে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ও মানবপ্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ, সুসামঞ্জস্যশীল ও সার্বিক কল্যাণকর বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ে এ সত্যটিই বিধৃত হয়েছে। বইটি পড়ে পাঠক দ্বীনি বিধান সমূহের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ও তাৎপর্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ হবে যা উক্ত বিধানসমূহ পালন করার ক্ষেত্রে পাঠকের মনে ইনশাআল্লাহ সঠিক অর্থপূর্ণতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা সৃষ্টি করবে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সাথে সম্যক পরিচিত পাঠকগণও সবিস্ময়ে লক্ষ করবেন যে মানব জীবন বিকাশের ইসলামী ব্যাখ্যা ও প্রক্রিয়া সমূহ মনোবিজ্ঞানের শেষ প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার সাথে শুধু সঙ্গতিপূর্ণতাই নয় বরং এগুলি মানব-প্রকৃতির বৈচিত্র্য ব্যাপকতা ও গভীরতার সাথে নিখুঁত ও আশ্চর্যজনকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই প্রেক্ষিতে, মাওলানা হেদায়েত উদ্দীন সাহেবের আলোচ্য পুস্তকটি ইসলামী সাহিত্যে একটি অনন্য ও অত্যন্ত যুগোপযোগী সংযোজন বলেই প্রতীয়মান হয়।

সাধারণ ভাবে সকল পাঠক এবং বিশেষভাবে মনোবিজ্ঞানে আগ্রহী পাঠক ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীগণ বইটি পাঠের দ্বারা প্রভূত ভাবে উপকৃত হবেন বলে মনে করি। বইটিকে মাদ্রাসা সমূহের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ইসলামের মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তাৎপর্যের সাথে নিবিড় পরিচিতির সুযোগ সৃষ্টি হবে। আল্লাহতায়ালা লেখকের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন ও তাঁহাকে আরো বড় করুন।

আজিজুল হক

(আজিজুল হক)
অধ্যাপক
মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডক্টর আনিসুজ্জামান
বি.এ. (অনার্স), এম. এ., এম. ফিল, (ঢাকা)
পিএইচডি, (ওয়েলস, ইউকে):
পরিচালক, গোবিন্দ দেব দর্শন
গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডক্টরেট-পরবর্তী গবেষণা (এ্যান্ডরুজ, ইউ এস এ;
কিংস কলেজ, লন্ডন, ইংল্যান্ড)
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান (প্রাক্তন)
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪৩৮০, ৪৩৮৯
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬৫৫৮৩
ই-মেইল : duregstr@bangla.net
phil@bangla.net

DR. ANISUZZAMAN
B.A. (Hons.), M.A. M.Phil. (Dhaka);
Ph.D. (Wales, UK)
Post. doctoral Research (Andrews, USA;
King's College, London, England)
Director, Dev Centre for Philosophical
Studies Dhaka University
PROFESSOR & CHAIRMAN (EX)
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA 1000, BANGLADESH
Tel: 9661900-59/4380, 4389
Fax : 880-2-865583
Email : duregstr@bangla.net
phil@bangla.net

অভিমত

মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন সাহেব লিখিত ইসলামী মনোবিজ্ঞান বইটি ইসলামী সাহিত্যে একটি নতুন সংযোজন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখা ও সমস্যাবলীর উপর নজর রেখে তিনি বিষয় ভিত্তিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজিত করেছেন। তিনি প্রধানতঃ বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিকোণ ও উপলব্ধির গভীর ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ এ বইয়ে উপস্থিত হয়েছে যে ইসলামী চিন্তাধারা মানব-ঊর্ধ্ব উৎস থেকে উৎসারিত এবং সে কারণে অবিকৃত মানব প্রকৃতি ও যথার্থ মানসিক প্রয়োজনের সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জ্ঞান চর্চার শিক্ষার্থীদের এ অমূল্য সম্পদ, আমার যখন বিভিন্ন পাণ্ডিত্যের কর্মকৌশলী ও

অভিমত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِه مُبَلِّغِ الْاَمَانَاتِ وَهَادِى الْكَائِنَاتِ، وَعَلٰى اٰلِه وَاَصْحَابِه وَعُلَمَاءِ اُمَّتِهِ الْمَسْئُوْلِيِّيْنَ بِاِبْلَاغِ تِلْكَ الْاَمَانَاتِ وَالْهِدَايَاتِ، اَمَّا بَعْدُ!

কুরআন-হাদীছের জ্ঞান আল্লাহ পাকের অসীম সত্তার অসীম উৎস থেকে উৎসারিত। এই জ্ঞানের গভীরতা ও বিস্তৃতি সীমাবদ্ধতা মুক্ত। কুরআন-হাদীছের জ্ঞান নিয়ে তাই যতই চর্চা ও গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে ততই এর গভীরতা ও বিস্তৃতি, ততই এর ব্যাপ্তি ও বিকাশ পরিস্ফুটিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। এই জ্ঞানের বিস্ময় শেষ হবে না কোন দিন! অতীতে কুরআন-হাদীছের ইল্‌ম (জ্ঞান) থেকে গবেষণা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখা-প্রশাখা উদ্ভাবন করা হয়েছে। চরিত্র বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ভূগোল বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি তার স্বাক্ষ্য।

বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ, গবেষক আলেম হাফেজ মাওলানা মুহা. হেমায়েত উদ্দীন সাহেব আমার অত্যন্ত সুহৃদ ও আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব। তিনি কুরআন হাদীছ থেকে গবেষণা করে ইসলামী মনোবিজ্ঞান-কে শাস্ত্র আকারে রূপ দেয়ার যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন তাতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা সমূহের তালিকায় আর একটি অনন্য সংযোজন হয়েছে বলে মনে করি। আমি তার রচিত "ইসলামী মনোবিজ্ঞান" শীর্ষক গবেষণালব্ধ পাণ্ডুলিপিখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। তিনি কুরআন-হাদীছের আলোকে আকাবির আসলাফ ও পূর্বসূরী উলামা ও ছুফিয়ায়ে কেরামের উপস্থাপিত বিভিন্ন কিতাব-পত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মনস্তাত্বিক তত্ত্ব, তথ্য ও ব্যাখ্যা সমূহকে সুসংবদ্ধ করে সে গুলোকেই মূলতঃ উপাত্ত ও উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে ইসলামী মনোবিজ্ঞানকে শাস্ত্র আকারে বিন্যস্ত করেছেন এবং অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে প্রত্যেকটা উদ্ভবন এবং উপস্থাপিত উপাত্ত ও উপাদান সমূহকে কুরআন-হাদীছের বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণ দ্বারা সু-প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করেন এবং তার উদ্ভাবনী শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করে দেন। পূর্বে তিনি "আহকামে যিন্দেগী" নামক যে গ্রন্থখানা রচনা করেছিলেন তার ন্যায় "ইসলামী মনোবিজ্ঞান" গ্রন্থখানিও ব্যাপক মকবূলিয়্যাত (গ্রহণযোগ্যতা) অর্জন করুক- এই কামনা করি। আমীন!

বিনীত

(মাওলানা) মাহমূদুল হাছান

মুহতামিম-জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

আমীর-মজলিসে দা'ওয়াতুল হক, বাংলাদেশ

তাং ২৯/৭/২০০১ ইং

অভিমত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

তরুণ লেখক ও গবেষক মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন একজন প্রতিভাধর আলেম। তিনি পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানের বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত গবেষণা চালিয়ে একে কুরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতে ইসলামী করণ করে 'ইসলামী মনোবিজ্ঞানে' রূপান্তরিত করেছেন। বস্তু ত মনোবিজ্ঞান পাশ্চাত্যের আবিষ্কৃত নতুন কোন বিজ্ঞান নয়। এটা ইসলামের আধ্যাত্মিক জ্ঞানেরই একটি অংশ। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা তাদের চিন্তা-চেতনার আলোকে গবেষণা করে এর বিস্তৃতি ঘটিয়েছে মাত্র। মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি হল মন। ইসলাম ঈমানের যে দাওয়াত দিয়েছে- তা মুখের স্বীকারোক্তি ও মন দিয়ে একীন করার নাম। ঈমান আবর্তিত হচ্ছে মনের মাধ্যমে। তারপর ইসলাম চরিত্র গঠনের কথা বলেছে। উহার মূল সম্পর্কও মনের সঙ্গে। মনের বিভিন্ন অবস্থার ও মানসিকতার উন্নয়নের নিমিত্ত ইসলাম যিকর-এর ব্যবস্থা দিয়েছে। এমনকি মন মানসিকতার বিভিন্ন অবস্থার প্রচুর বিবরণ হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়গুলোকে মনোবিজ্ঞান নাম দিয়ে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে আধুনিক জগতের রুচিসম্মত ও যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছে। ইসলামী জগত জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ায় পাশ্চাত্য জগত এ কৃতিত্বের দাবীদার হয়েছে। এটা এমন কিছু নয়। কেননা এক সময়ে দূর অতীতের মৃতপ্রায় ও সমাধিস্থ জ্ঞান বিজ্ঞান সমূহ কুরআন ও সুন্নাহের জ্ঞানের ভিত্তিতে ইসলামী মনীষীরা ইসলামী করণ করে জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। যেমন- দর্শন, তর্কশাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি। মৃতপ্রায় এ বিজ্ঞানগুলোকে কুরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতে ইসলামী মনীষীরা ইসলামী করণ করে পুনর্জীবিত করে রেখে গেছেন। শুধু তা-ই নয়, বরং আরো মজবূত, শক্তিশালী ও গতিশীল করে রেখে গেছেন। দীর্ঘকাল যাবত ইসলামী করণের কাজটি যেন স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার এ যুগে পাশ্চাত্যের নব নব আবিষ্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান সমূহকে কুরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতে ইসলামী করণ করে পুনর্গঠিত করা হলে বিশ্ববাসী একটি নতুন চেতনা শক্তি লাভ করতে সক্ষম হত সন্দেহ নেই।

এ সময়ের জন্য এটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী দাবী। অথচ এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি আগ্রহ ও সাধনা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগন্য। এহেন অবস্থায় তরুন লেখক ও গবেষক মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন এক দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করে কুরআন সুন্নাহের ভিত্তিতে পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানকে ইসলামী করণ করার কাজে মনোযোগী হন এবং 'ইসলামী মনোবিজ্ঞানে'র একটি সফল রূপরেখা দাঁড় করাতে সক্ষম হন। আমার ধারণা মতে বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানকে ইসলামী করণ করার কাজে এটাই সর্বপ্রথম উদ্যোগ। একজন তরুণ আলেম ও গবেষক এ বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে বাংলাভাষী জাতির মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। জাতির পক্ষ হতে তাকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

এ তরুণ আলেম ও গবেষকের নিকট জাতি আরো অনেক কিছু আশা করে।

আমি এ বইটি মাদরাসা শিক্ষার উপরের কোন জামাআতের সিলেবাসভুক্ত করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। আশা করি বইটি মাদরাসা শিক্ষার ও শিক্ষকদের মান উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি নগণ্য, দু'আ করি- আল্লাহ পাক যেন এ তরুণ আলেম ও গবেষককে কবূল করেন এবং তার মাধ্যমে আমাদের ও ইসলামের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধির আরো তাওফীক দান করেন। আমীন!

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল জাব্বার
মহাসচিব
তারিখ : ১৬/০৭/২০০১ ঈঃ বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ!

দেহ আর মন এই দুইয়ের সমষ্টি হল মানুষ। মন হল পরিচালক আর দেহ হল মন কর্তৃক পরিচালিত। দেহের আচার আচরণ, গতি-প্রকৃতি সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এই মনের দ্বারা। অতএব বলা যায়-কেউ মনকে ঠিক করতে পারলেই তার সমস্ত কথাবার্তা, আচার-আচরণ সঠিক পথে চালিত হবে। হাদীছ এই পরিচালিকা শক্তি-মন সম্পর্কে বলেছে,

اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ.

অর্থাৎ, জেনে রাখ-দেহের অভ্যন্তরে একটা মাংস খণ্ড রয়েছে, যদি সেটা ঠিক হয়ে যায়, তাহলে পুরো দেহ ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি সেটা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পুরো দেহে ফ্যাসাদ ঘটবে। জেনে রাখ– সেটি হল মন বা আত্মা। (বোখারী ও মুসলিম)

এ হাদীছে যে মন বা আত্মা সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেই মন বা আত্মা সম্পর্কিত বিজ্ঞানকেই বলা হয় মনোবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান পাঠ করলে জানা যায় মনের কোন ধরনের আবেগ অনুভূতি থেকে কোন ধরনের আচরণ সৃষ্টি হয়। আবার কোন ধরনের কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও পরিবেশ প্রকৃতি মনের উপর কোন ধরনের প্রভাব ফেলে থাকে। এটা জানলে সঠিক আচরণ সৃষ্টির জন্য নিজের মনকে সঠিক পথে পরিচালিত করা যায়। আবার অন্যের মনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে- এমন আচরণ থেকে বিরত থাকা যায় এবং অন্যের মানসিক গতিকে অনুকূলে আনা সম্ভব হয়।

ইসলামের শিক্ষানীতি, দাওয়াতের পদ্ধতি, ইবাদত এবং মু'আমালা, মু'আশারা সর্বক্ষেত্রেই মনস্তাত্ত্বিক আনুকূল্য সৃষ্টি ও তা ধরে রাখার বিষয়ে স্বযত্ন দৃষ্টি রাখা হয়েছে। মনকে গঠন করার জন্য যেমন সর্ব প্রথম ঈমানের দিকটাকে অগ্রগণ্য বিবেচনা করা হয়েছে, তেমনিভাবে ইবাদত, মু'আমালা,

মু'আশারা সব কিছুর শিক্ষা ও দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে এমন সব নীতিমালা ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যা মনের গঠন ও গ্রহণ প্রক্রিয়াকে অনুকূল করতে পারে।

'ইসলামী মনোবিজ্ঞান' শীর্ষক এ গ্রন্থ পাঠ করলে কেউ মুখ দেখে মনের কথা বলে দিতে পারবে না, এ গ্রন্থ পাঠ করলে বশীকরণ বিদ্যাও আয়ত্ত্ব করা যাবে না এবং মূলত এগুলো মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু র অন্তর্ভুক্তও নয়। বরং ইসলামের দেয়া বিধি-বিধান ও নীতিমালার মধ্যে কতখানি মনস্তত্ব রয়েছে, মনের উপর ইসলামী বিধি-বিধান ও নীতিমালার কতটুকু প্রভাব রয়েছে এবং এ দিকটার প্রতি কতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে এ সব সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে ইসলামী বিধি-বিধান ও নীতিমালার মনোবৈজ্ঞানিক কার্যকারিতা এবং ইসলামে মনোবিজ্ঞানের অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা ও বর্ণনাই এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইসলামের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধ আছে বলে আজ পর্যন্ত আমার গোচরীভূত হয়নি। তাফসীর গ্রন্থে বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় এবং হাদীছের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও মনীষীদের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত খণ্ডিত তথ্যসমূহের উপর ভিত্তি করে এবং সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত হাদীছের উপর গবেষণা করে আলোচ্য গ্রন্থের রূপ দেয়া হয়েছে। সুতরাং কারও বিজ্ঞ দৃষ্টিতে কোথাও কোন সংশোধন বা সংযোজনের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ার পর এই অধমকে অবগত করলে কৃতজ্ঞতার সাথে পরবর্তীতে তা সন্নিবেশিত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

সর্বশেষে সাধারণ মনোবিজ্ঞানের ধারাসমূহ এবং বক্ষমান গ্রন্থে বর্ণিত মনোবিজ্ঞান সম্বলিত ইসলামী নীতিমালার মধ্যকার একটি মৌলিক পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করতে চাই। সাধারণ মনোবিজ্ঞানে প্রধানতঃ তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে গবেষণা করে প্রাণীর আচরণ সম্পর্কে একটি জ্ঞান সিদ্ধান্তে পৌঁছা হয়- (১) পরীক্ষণ পদ্ধতি (Experimental Method) (২) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observation Method) (৩) চিকিৎসামূলক পদ্ধতি (Clinical Method)।

পক্ষান্তরে একই বস্তু বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুরআন হাদীছ এবং মনীষীদের গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে যে সব খণ্ডিত তথ্য বর্ণিত হয়েছে, সে গুলোকে সমন্বিত করার পর যে সব সাধারণ সূত্র ও নিয়ম আবিস্কৃত হয়েছে সেগুলোকেই আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন শিরোনাম ও উপ-শিরোনামের অধীনে উপস্থাপন করা হয়েছে। সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য নিছক কৃত্রিম পরিবেশে পরিচালিত পরীক্ষণ বা ইন্দ্রিয়-নির্ভর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি।

কুরআন হাদীছের বিস্ময় শেষ হবে না কোন দিন। কুরআন হাদীছ ও ইসলামকে নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনার ধারা তাই অব্যাহত থাকবে প্রতিনিয়ত। মনোবিজ্ঞানের আলোকে ইসলামকে পর্যালোচনার আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যদি সেই অব্যাহত ধারার সাথে সংযুক্ত হয় এবং পাঠকমহল এর থেকে এতটুকুও উপকৃত হন তবেই আমার শ্রম সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বেশ কয়েকজন উলামাকে দিয়ে যাচাই-বাছাই করানো হয়েছে। তন্মধ্যে প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও শাইখুল হাদীছ হযরত মাওঃ মাহমূদুল হাসান (দা. বা.) মুহতামিম ও শায়খুল হাদীছ, যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অধ্যাপক মঞ্জুরুল হক সাহেব ও ড. আনিসুজ্জামান সাহেব পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত গভীরভাবে যাচাই-বাছাই ও কিছু সংশোধন পূর্বক স্বহস্তে অভিমত লিখে দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে উত্তম জাযা দান করুন।

বিনীত

তাং ২১/৮/৯১ **মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন**

প্রথম অধ্যায়

মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও কতিপয় মৌল ধারণা
(Nature of Psychology and some basic concepts)

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

'মনোবিজ্ঞান'-কে ইংরেজীতে বলা হয় Psychology শব্দটি গ্রীক শব্দ, Psyche (মন বা আত্মা) এবং Logos (বিজ্ঞান) থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আরবীতে মনোবিজ্ঞানকে বলা হয় عِـلْمُ النَّفْسُ (ইল্‌মুন্নাফ্‌স) এখানে عِلْم শব্দটি বিজ্ঞান অর্থে এবং نَفْس শব্দটি মন বা আত্মা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে মনোবিজ্ঞানকে মন বা আত্মা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলা যায়। পূর্বে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা এভাবেই বলা হত। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে মনোবিজ্ঞান হল আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের বিজ্ঞান সম্মত পর্যালোচনা।

মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়

আত্মা বা মন, চেতনা ও প্রাণীর আচরণ হল মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। মনোবিজ্ঞানে প্রাণীর চিন্তা-চেতনা, আবেগ, অনুভূতি, বিশ্বাস ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়া এবং তার ফলে কি আচরণ প্রকাশ পেয়ে থাকে, আবার কোন ধরনের আচার-আচরণে কি মানসিক প্রক্রিয়া ঘটে থাকে তা নিয়ে বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে।

মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য

যে কোন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনা বিশ্লেষণ করে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা। তদ্রূপ মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল প্রাণীর আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ করে কতগুলি সাধারণ সর্ববাদী সম্মত নিয়ম আবিষ্কার করা এবং ঐসব নিয়মাবলী দ্বারা মানুষের আচরণকে ব্যাখ্যা করা এবং এ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধিশালী করা।

মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা

মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান থেকে মানুষ নিজের আবেগ অনুভূতি ও আচরণ সম্বন্ধে জানতে পারে এবং নিজের কোন্ আচরণ অন্যের মধ্যে কি মানসিক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করবে সে সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে। এর ফলে নিজের আবেগ অনুভূতিকে সঠিক ভাবে পরিচালিত করে মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন রাখতে পারে এবং অন্যের সঙ্গেও উপযুক্ত আচরণ করতে পারে। এভাবে মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে প্রজ্ঞার সাথে চলতে সাহায্য করে। মনোবিজ্ঞান দ্বারা আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য পাওয়া যায়।

মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস

অতীতে 'মনোবিজ্ঞান' নামে বিজ্ঞানের কোন স্বতন্ত্র শাখা ছিল না। প্রথমে মনোবিজ্ঞান দর্শনেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণই তখন মনোবিজ্ঞান বিষয়ক কিছু কিছু আলোচনা করতেন। সেই প্রাচীন যুগের মনোবিজ্ঞানে যাদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তারা হলেন এরিস্টটল (Aristotle/ ৩৮৪-৩২২ اَرَسْطُوْ খৃ. পৃ.) প্লেটো (Plato/اَفْلَاطُوْن ৪২৭-৩৪৭ খৃ. পৃ.) হিপোক্রেটিস (Hipocrates) ও সক্রেটিস (سُقْرَاط খৃ. পৃ. ৪৭০-৩৯৯)। এরিস্টটল তার রচিত De Anima (আত্মা সম্বন্ধে) নামক পুস্তকে আত্মা সম্বন্ধে তৎকালীন প্রচলিত ধারণা সমূহকে সুসংবদ্ধ করেন। হিপোক্রেটিস খৃষ্টপূর্ব ৪০০ সালে সর্ব প্রথম মানুষের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। প্লেটো এবং সক্রেটিসের লেখায়ও মানুষের মন বা আত্মা সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ফরাসী দার্শনিক ডেকার্ড (১৫৬৯-১৬৫০) দার্শনিক লক্ (১৬৩২-১৭০৪) জীব বিজ্ঞানী ডারউইন

(১৮০৯-১৮৮২) প্রমুখ অনেকে মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, যার অনেকটা পরবর্তীকালের মনোবিজ্ঞানীরা প্রত্যাখ্যানও করেছেন।

মনোবিজ্ঞানের সত্যিকার পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয় ১৮৭৯ সাল থেকে। এই সময় জার্মানীর দার্শনিক ও চিকিৎসক উন্ড্ (Wund ১৮৩২-১৯২০) সাহেব লিপ্‌জিগে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এক গবেষণাগার স্থাপন করেন। এখান থেকেই মনোবিজ্ঞানের আধুনিক যুগ ধরা হয়। এর পূর্বে গ্রীক দর্শনের যুগ থেকে উনবিংশ শতাব্দির শেষার্ধ পর্যন্ত সময়কে মনোবিজ্ঞানের প্রাচীন যুগ বা প্রাক বৈজ্ঞানিক যুগ বলা যায়। খৃষ্টীয় ১৮৭৯ সাল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত সময়কে মনোবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক যুগ বা আধুনিক যুগ বলা হয়, যার সূচনা হয় জার্মানিতে উন্ড্ কর্তৃক মনোবিজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপনের মধ্য দিয়ে। উন্ডের গবেষণাগার স্থাপনের পর পরই আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য আরও কিছু গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সব গবেষণাগারে কার্যরত মনোবিজ্ঞানীরা নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত করেন। এভাবে মনোবৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বগুলো গবেষণা ও আলোচনা পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হতে হতে বর্তমান স্তরে এসে উন্নীত হয়েছে। এ হল সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ইসলাম তথা কুরআন সুন্নায় মনোবৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের পর্যাপ্ত সমাহার রয়েছে এবং বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও মাসআলা-মাসায়েল এগুলোর উপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত হয়েছে; যা মানব জীবনের কথাবার্তা, চলা-ফেরা, আচার-আচরণ আকীদা-বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি সার্বিক ক্ষেত্রে কার্যকর রয়েছে। তবে এসব মনস্তাত্ত্বিক নিয়ম-নীতি ও মনোবৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোকে স্বতন্তভাবে শাস্ত্র আকারে রূপায়ণ ও সংকলনের কাজে কেউ এগিয়ে আসেননি বা এগুলোর উপর গবেষণার জন্য কোন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার কথাও শোনা যায় না। বিভিন্ন তাফসীরের কিতাব, হাদীছের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, পূর্বসূরী উলামা ও মাশায়েখদের রচনাবলী এবং মনীষীদের বই পত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ জাতীয় তথ্য ও তত্ত্বগুলোকে একত্রিত করে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে সেগুলোকে শাস্ত্র আকারে রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে অত্র গ্রন্থে। আল্লাহ তা'আলাই ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করনেওয়ালা।

মনোবিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা

আধুনিককালে মনোবিজ্ঞানের বহু শাখার উদ্ভব হয়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা মানব আচরণের একেক দিক নিয়ে গবেষণা করে এক এক শাখার উদ্ভব ঘটাচ্ছেন। সাধারণ মনোবিজ্ঞানে এ পর্যন্ত যে সব শাখার উদ্ভব হয়েছে তন্মধ্যে প্রসিদ্ধগুলো হল,

(১) শিক্ষা মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology)
(২) চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান (Clinical Psychology)
(৩) শিল্পীয় মনোবিজ্ঞান (Industrial Psychology)
(৪) প্রকৌশল মনোবিজ্ঞান (Engineering Psychology)
(৫) সমাজ মনোবিজ্ঞান (Social Psychology)
(৬) পরিবার মনোবিজ্ঞান (Family Psychology)
(৭) শিশু মনোবিজ্ঞান (Child Psychology)
(৮) বিকাশ সম্বন্ধীয় মনোবিজ্ঞান (Developmental Psychology)
(৯) মানস পরিমাপন (Psychometrics)
(১০) নির্দেশনা মনোবিজ্ঞান (Counselling Psychology) ইত্যাদি।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান এক জটিল ও বিস্তৃত ক্ষেত্র। আধুনিক মনোজ্ঞিানীরা আজ শুধু মানুষের কাজকর্ম, চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা, অনুরাগই নয় প্রাণীর আচরণকেও তারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করছেন। এছাড়াও আজকাল তারা নানা গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন। কেউ গবেষণা করছেন সামরিক বাহিনী ও বিমানবাহিনীর লোকদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কিভাবে মনোবিজ্ঞানকে কাজে লাগানো যায়। কেউ গবেষণা করছেন প্রচারের মাধ্যমে দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কিভাবে মনোবিজ্ঞানকে প্রয়োগ করা যায়। কেউ কেউ আবিষ্কার করতে চাচ্ছেন কলকারখানার শ্রমিক বিদ্রোহ দমন ও অধিক উৎপাদনের জন্য শ্রমিকদের উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে কি কি মনস্তাত্ত্বিক কৌশল উদ্ভাবন করা যায়। আবার কেউ কেউ গবেষণা করছেন ওজনহীন ও প্রচণ্ড গতিশীল অবস্থায় মহাশুন্যচারীর দৈহিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া কেমন হয় এবং কেন হয় তা নিয়ে। ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনার মাধ্যমে আজকের মনোবিজ্ঞান এক বিরাট পরিধিতে বিস্তৃত হয়েছে। এভাবে আজকের মনোবিজ্ঞানের রয়েছে বহুধা বিস্তৃত শাখা।

ইসলামী বিষয়বস্তু এবং নীতিমালার গুরুত্ব ও মেজায অনুসারে আলোচ্য গ্রন্থে (ইসলামী মনোবিজ্ঞানে) শিল্পীয় মনোবিজ্ঞান[১] প্রকৌশল মনোবিজ্ঞান[২] বিকাশ সম্বন্ধীয় মনোবিজ্ঞান[৩] মানস পরিমাপন[৪] ও নির্দেশনা মনোবিজ্ঞান[৫] সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি, বরং এসবের স্থলে ইবাদত মনোবিজ্ঞান, দাওয়াত মনোবিজ্ঞান, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধীয় মনোবিজ্ঞান, চরিত্র মনোবিজ্ঞান,প্রভৃতি কয়েকটি শাখা তৈরী করে এগুলো সম্বন্ধে মনোবৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

ইসলামী মনোবিজ্ঞানকে শাস্ত্র আকারে রূপ দেয়ার এই প্রাথমিক প্রচেষ্টায় আমি নয়টি অধ্যায়ে নয়টি শাখা সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আর একটি অধ্যায় (প্রথম অধ্যায়) রেখেছি মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রাথমিক ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী জানার জন্য। ভবিষ্যতে ইসলামী মনোবিজ্ঞান নিয়ে আরও অধিকতর গবেষণা করা হলে হয়ত আরও নতুন শাখা বিস্তৃত করা যাবে এবং এগুলোকেও আরও পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত করা সম্ভব হবে।

---

১. 'শিল্পীয় মনোবিজ্ঞান'- মনোবিজ্ঞানের এ শাখায় কি কি কারণে শিল্পোৎপাদন কমে, কিভাবে শ্রমিকদের কর্মকুশলতা বাড়ানো যায়, শিল্পশ্রম কিভাবে লাঘব করা যায় ইত্যাদি শিল্প সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

২. 'প্রকৌশল মনোবিজ্ঞান-এ শাখায় যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কিভাবে উন্নত করা যায়। যন্ত্রের গতি নির্দেশক, বিপদ সংকেত যন্ত্রাবলী কি ধরনের হলে চালকের নিয়ন্ত্রণে সুবিধা হয়, ভুল কম হয় এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৩. 'বিকাশ সম্বন্ধীয় মনোবিজ্ঞান'-এ শাখায় মানুষের দেহ আচরণ ও মননশীলতার ক্রম বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

৪. মানস পরিমাপন'-এ শাখায় মানুষের বুদ্ধি, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি পরিমাপ করার জন্য নতুন নতুন অভীক্ষা উদ্ভাবন ও পরীক্ষণের জন্য সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়।

৫. 'নির্দেশনা মনোবিজ্ঞান'-মনোবিজ্ঞানের এ শাখায় মানসিক বিশৃঙ্খলা, শিল্প সংকট, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও বিরোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ের বিবরণ ও সুপরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। এর কিছুটা অত্র গ্রন্থের 'পরিবার মনোবিজ্ঞান', চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান' ও 'চরিত্র মনোবিজ্ঞান'-অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান
(Educational Psychology)

শিক্ষণ ও মনোবিজ্ঞান

ইসলামে ঈমান, ইবাদত, মু'আমালাত, মু'আশারাত ও আখলাকিয়্যাত ইত্যাদি সম্পর্কিত নীতিমালা যেরূপ মনস্তত্ত্ব সমৃদ্ধ, ইসলামের শিক্ষা নীতিগুলোও তদ্রূপ মনস্তাত্ত্বিক সৌন্দর্য মণ্ডিত। ইসলামী শিক্ষানীতির শিক্ষণের শর্ত, শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও শ্রেণী বিভাগ, শিক্ষা দান পদ্ধতি তথা উপস্থাপন নীতি, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও স্মৃতি-বিস্মৃতি সম্পর্কিত নীতিমালা পর্যালোচনা করলে তার সৌন্দর্যে অভিভূত হতে হয়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে আমরা সেগুলো আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

শিক্ষণের শর্ত

১. প্রেষণা

শিক্ষণ একটি জটিল ও শ্রম সাপেক্ষ প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে নিরবচ্ছিন্ন স্নায়ুবিক কষ্ট স্বীকার করতে হয়, বলবুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়। আর মনস্তাত্ত্বিকভাবেই কোন বিষয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ বা তাগিদ সৃষ্টি না হলে সে বিষয়ের জন্য সে কষ্ট স্বীকার করতে প্রবৃত্ত হয় না। এই তাগিদ বা প্রেষণা[১] তাই শিক্ষণের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় শর্ত। এটাকে শিক্ষণের পূর্বশর্তও বলা যেতে পারে। শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি শিক্ষণের তাগিদ সৃষ্টি না হয় তাহলে তার পক্ষে কোন কিছু শেখা সম্ভব নয়। এই তাগিদ বা প্রেষণা শিক্ষণে তাকে সাহায্য করবে, শিক্ষণ প্রক্রিয়ার কষ্টগুলো সইতে উদ্বুদ্ধ করবে। যেমন ধরা যাক একটি শিশুর ক্ষুধা পেয়েছে ও দুধ পান করার জন্য তার মধ্যে তাগিদ সৃষ্টি হয়েছে, এই তাগিদ তাকে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অনেক কিছুই করাবে; যেমন সে কাঁদবে, জিনিস পত্র তছনছ করবে, দুধের বোতলটি ধরতে চাইবে ইত্যাদি। কিন্তু যদি এমন করা হয় যে, দুধ কথাটি না বলা পর্যন্ত তাকে দুধ দেয়া হবে না-যখনই সে

---

১. 'প্রেষণা' বা Motive বলতে বোঝায় মানুষ ও প্রাণীর এমন একটি অবস্থা যা তাদেরকে কাজে প্রবৃত্ত করায়। কামনা-বাসনা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ইচ্ছা, অভিলাস, প্রয়োজন সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

দুধ কথাটি উচ্চারণ করবে তখনই তাকে এক চুমুক দুধ দেয়া হবে, তাহলে দেখা যাবে অল্প দিনের মধ্যেই সে দুধ বলতে শিখেছে। কিন্তু এই শিশুটির মধ্যে যদি ক্ষুধা বা দুধ পানের প্রতি প্রেষণা সৃষ্টি না হত তাহলে সে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া মোটেই করত না, ফলে দুধ কথাটি শেখার সম্ভাবনাও খুব কমে যেত। এমনিভাবে কোন আচরণ যখন প্রাণীর কোন প্রেষণাকে নিবৃত্ত করতে সাহায্য করে, তখন প্রাণী সেই আচরণটি শিক্ষা করে। সুতরাং দেখা গেল প্রেষণা বা তাগিদ ও আগ্রহ সৃষ্টি শিক্ষণের একটি অতি প্রয়োজনীয় শর্ত। শিক্ষার্থীর যদি শিক্ষণের প্রেষণা ও আগ্রহ থাকে তবেই তার শিক্ষণ ত্বরান্বিত হবে, শিক্ষণের আগ্রহ তার শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করবে। সহজ কথায় শেখবার ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই শেখা যায় না। শেখার জন্য ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকতে হয়।

এই প্রেষণা বা তাগিদ ও আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ইসলামী শিক্ষানীতিতে যে কোন বিদ্যাশাস্ত্র আরম্ভ করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের ফযীলত, উপকারিতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়ে থাকে, যাতে শিক্ষার্থী সেই বিদ্যাশাস্ত্র শেখার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পারে।

২. বয়স

ইসলাম প্রত্যেকটা নর ও নারীর উপর জ্ঞান-শিক্ষাকে ফরয করেছে, তা সে যে কোন বয়সেই হোক না কেন। এ ক্ষেত্রে বয়সের কোন শর্ত-বন্ধন নেই। যে কোন শ্রেণীর যে কোন বয়সেরই লোক হোক না কেন তার জন্য শিক্ষার্থী হওয়ার দুয়ার অবারিত। দোলনা থেকে কবর পর্যন্তই শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের বয়স। প্রত্যেককে মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে ছাত্র মনে করার জন্য ইসলাম উৎসাহিত করেছে। বলা বাহুল্য-মানুষের জানার শেষ নেই, তাই আমৃত্যুই তাকে শিক্ষার্থী থাকতে হবে। অবশ্য ভাষাগত শিক্ষণের ক্ষেত্রে বয়সেরও একটা প্রভাব রয়েছে সত্য। শিশুদের ভাষা শিক্ষণের ক্ষমতা যেমন ক্রমশ বাড়তে থাকে, তেমনিভাবে বৃদ্ধদের তা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে, এটা অনস্বীকার্য। এজন্য প্রাথমিক বয়সের অবস্থাটাই শিক্ষা গ্রহণের বিশেষত ভাষাগত শিক্ষা গ্রহণের অধিকতর অনুকূল বয়স। সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করেই হযরত উমর (রা.) বলেছেন,

تَفَقَّهُوْا قَبْلَ اَنْ تُسَوَّدُوْا.

অর্থাৎ, তোমরা নেতা হওয়ার পূর্বেই শিক্ষা গ্রহণ কর। (বোখারী : প্রথম খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা)

প্রাথমিক বয়সে মনের পর্দা স্বচ্ছ থাকার কারণে সেখানে যে কোন দাগ অধিকতর বদ্ধমূল ও স্থায়ী হয় এবং সে বয়সে মনের কল্পনা ও ভাবনার পরিসর বিস্তৃত না হওয়ার কারণে সেখানে তথ্যের প্রক্রিয়াজাত করণ ও তথ্যসমূহ সংগঠিত করা নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে থাকে। স্মৃতি ভাণ্ডার খালী থাকায় অল্প প্রচেষ্টাতেই তখন স্মৃতি ভাণ্ডারে তথ্যের স্থানায়ন সহজ হয় এবং পূর্ব শিক্ষণ প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় না। ইমাম বায়হাকী কর্তৃক “মাদ্‌খাল” গ্রন্থে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে–

اَلْعِلْمُ فِى الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِى الْحَجَرِ.

অর্থাৎ, ছোট বয়সে জ্ঞানার্জন পাথরে অঙ্কনের সমতুল্য। (আল-মাকাসিদুল হাছানা : ২৯৩ পৃষ্ঠা)

উক্ত গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত অপর এক হাদীছে রাসূল (সা.) বলেন,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِيْ شَبِيْبَتِهٖ اِخْتَلَطَ الْقُرْاٰنُ بِلَحْمِهٖ وَ دَمِهٖ.

অর্থাৎ, যৌবনে যে কুরআন শিক্ষা করে, কুরআন তার রক্ত মাংসে মিশে যায়। (আল-মাকাসিদুল হাছানা : ২৯৪ পৃষ্ঠা)

শিক্ষক ও মনোবিজ্ঞান

শিক্ষা নীতির ক্ষেত্রে শিক্ষকের বিষয়টি অতিব গুরুত্বপূর্ণ। মূলত শিক্ষকের ছাঁচেই শিক্ষার্থী গড়ে ওঠে। শিক্ষকের যোগ্যতা, তার সততা, তার চিন্তাধারা ও মন-মানসিকতা এবং তার অন্তর্নিহিত ভাব সুষমা সব কিছুরই একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়ে থাকে শিক্ষার্থীর উপর। ইবনে সিরীন বলেন,

اِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَاْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ.

অর্থাৎ, নিশ্চয় এই ইল্‌ম হল দ্বীন। কাজেই কার কাছ থেকে তোমরা দ্বীন (ইল্‌ম) গ্রহণ করছো তা যাচাই করে নাও। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম)

ইসলামী শিক্ষানীতিতে তাই শিক্ষকের মধ্যে বহুবিধ গুণাবলীর সমাবেশ থাকতে হয়। বিশেষত শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের যে সব গুণাবলীর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব রয়েছে সেগুলো সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

শিক্ষকের গুণাবলী

১. শিক্ষককে নৈতিক গুণ সম্পন্ন ও সুষ্ঠু মন-মানসিকতার অধিকারী হতে হবে

ইসলাম শুধু জানার জন্যই জানা-এই নীতিকে সমর্থন করে না বরং জানা বা ইল্‌ম অর্জন করার সাথে সাথে সেটাকে আমলে রূপায়িত করাই মূল কাম্য। আর বলা বাহুল্য-আমলের অন্তর্নিহিত শক্তিই হল চরিত্র বা নৈতিক গুণ। এই চরিত্র বা নৈতিক গুণের ভারসাম্যতা বিধানকে বলা হয় তারবিয়াত বা তায্‌কিয়া। তা'লীম বা শিক্ষাদানের সাথে শিক্ষকের নৈতিক চরিত্র এবং তারবিয়াত বা তায্‌কিয়ার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষকের মধ্যেই যদি এর অভাব থাকে সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর উপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়াটা অনিবার্য। রাসূল (সা.)-এর দায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে তাই আল্লাহ তা'আলা তা'লীম ও তারবিয়াত বিষয় দু'টোকে পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ.

অর্থাৎ, তিনি (রাসূল) তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের তায্‌কিয়া করবেন। (সূরা বাকারা : ১২৯)

আমল ও নৈতিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ হল ইল্‌ম বা শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের প্রায়োগিক দিক। আর মনস্তাত্ত্বিক ভাবেই শিক্ষার্থী শিক্ষালব্ধ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার ব্যবহারিক উপযোগিতা দেখতে চায়। এ বিষয়টিও তার প্রেষণার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আর তার প্রথম ক্ষেত্র হল শিক্ষকের বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবন। তাই শিক্ষকের ব্যবহারিক জীবনে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রয়োগ না দেখলে শিক্ষার্থীর প্রেষণা বলবতি হয় না। অধিকন্তু ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষণীয় বিষয়ের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে বিরূপ প্রতিচ্ছায়া পড়তে পারে। দাওয়াত-অধ্যায়ে এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

২. শিক্ষককে কমনীয় গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে

শিক্ষককে বিভিন্ন প্রকৃতির ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হয়। এর মধ্যে মার্জিত ও নম্র-ভদ্র স্বভাবের যেমন থাকে, তেমনি থাকে অবাধ্য, অভদ্র ও রূঢ় স্বভাবেরও। তাই শিক্ষকের মধ্যে কমনীয় গুণাবলী তথা উদারতা, নম্রতা, কল্যাণকামিতা, ক্ষমা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা প্রভৃতির সমাবেশ থাকা

বাঞ্ছনীয়। অবাধ্যকে বাধ্য, অভদ্রকে ভদ্র এবং রূঢ় প্রকৃতিকে নম্র বানানোর ক্ষেত্রে কঠোরতা বা রুদ্র শাসনেরও প্রভাব রয়েছে সত্য এবং ক্ষেত্র বিশেষে তার অল্প বিস্তর প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য, তবে কমনীয় গুণাবলীর প্রভাব ও কার্যকারিতা অনেক বেশি। বরং অনেক সময়ই কঠোরতায় হিতে বিপরীত হয়ে যায়। শাস্তি অনেক সময় শিক্ষার্থীর মনে অবাঞ্ছিত আবেগের সৃষ্টি করে, তদুপরি শাস্তির ভয়ে কোন কিছু শিক্ষা করলে তার ফলও সব সময় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অতএব শাস্তির তুলনায় পুরস্কার এবং কঠোরতার তুলনায় কমনীয়তার ভূমিকা শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী।

রাসূল (সা.)-কে শিক্ষক হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছিল, আর শিক্ষক হিসেবে তাঁর মধ্যে এসব কমনীয় গুণাবলীরও সমাবেশ ছিল। এর অন্যথা হলে হিতে বিপরীত হত। কুরআনে কারীমে তাই ইরশাদ হয়েছে,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি কঠোর চিত্ত হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। (সূরা আলে-ইমরান : ১৫৯)

হাদীছে আছে-একদা জনৈক বেদুঈন মসজিদে নববীতে এসে পেশাব করতে আরম্ভ করল। সাহাবায়ে কেরাম এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে বাধা দিতে উদ্যত হলেন। নবী (সা.) বাধা দিতে নিষেধ করলেন। অতপর লোকটি পেশাব থেকে ফারেগ হওয়ার পর রাসূল (সা.) তাকে নরম করে বুঝিয়ে দিলেন যে, এটা মসজিদ, আল্লাহ্‌র ঘর। এটা নামায, ইবাদত, যিকির ইত্যাদির জন্য। এই কমনীয় ব্যবহারে লোকটি অভিভূত হল। পরে সে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বর্ণনা করেছিল যে, আল্লাহ্‌র কছম! এমন উত্তম শিক্ষক আর কখনও দেখিনি, আল্লাহ্‌র কছম! তিনি আমাকে ধমক দিলেন না! আমাকে প্রহার করলেন না! আমাকে রূঢ় কথা বললেন না! আমাকে গালি দিলেন না! (অথচ কি সুন্দরভাবে কথাটা বুঝিয়ে দিলেন।)

৩.শিক্ষককে মনোবিজ্ঞানী হতে হবে

উপরোক্ত আলোচনা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষককে হতে হবে মনোবিজ্ঞানী, মনস্তাত্ত্বিক বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। বিভিন্ন স্বভাব, বিভিন্ন প্রকৃতি

ও বিভিন্ন মন-মেজাযের শিক্ষার্থীকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে গেলে শিক্ষককে তাদের আবেগ অনুভূতি ও মানসিক গতি প্রকৃতি উপলব্ধি করতে হবে। কোন্ স্বভাব বা কোন্ প্রকৃতির শিক্ষার্থীকে শাসন দ্বারা সংশোধন করা যাবে আর কোন্ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে উদারতা ও কোমলতা যথার্থ হবে, তা শিক্ষককেই নির্ধারণ করে নিতে হবে। এজন্য শিক্ষকের মনস্তত্ত্ব বিশারদ হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিবে তীব্রভাবে। অন্যথায় হিতে বিপরীত হবে। যার ক্ষেত্রে শাসন ও কঠোরতা প্রয়োজন, উদারতা ও ক্ষমা তাকে আরো লাগামহীন করে ফেলবে। পক্ষান্তরে কমনীয়তার স্থলে কঠোরতা প্রায়শঃই জেদ বা হটকারিতাই বৃদ্ধি করে থাকে। রাসূল (সা.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদেই তিনি শিক্ষা দান করতেন। নও মুসলিম, পল্লীবাসী ও বেদুঈনদের বেলায় দেখা যায় তিনি মোটেই কঠোরতা প্রদর্শন করতেন না। কারণ সে ক্ষেত্রে তাদের বিগড়ে যাওয়া বা হটকারী হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। পক্ষান্তরে অন্যদের বেলায় ক্ষেত্র বিশেষে তিনি কঠোরতাও প্রদর্শন করেছেন।

৪. শিক্ষকের ক্রোধ-গোস্বা ও বিরক্তি প্রসঙ্গ

উপরের আলোচনা থেকেই প্রমাণিত হল যে, শিক্ষার্থীর সাথে যেমন কোমল ও সহজ আচরণ করা উচিত, তেমনিভাবে প্রয়োজনে ক্রোধ বা গোস্বাও প্রকাশ করতে হবে। শিক্ষার্থী বা শাগরিদের পক্ষ থেকে কোন অনুচিত আচরণ প্রকাশ পেলে কিংবা অশোভনীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হলে শিক্ষক যদি মনে করেন গোস্বা কিংবা বিরক্তি প্রকাশ করলে তার পরবর্তী বক্তব্য অধিকতর প্রভাব সৃষ্টি করবে সে ক্ষেত্রে তিনি তা করতে পারেন। বোখারী শরীফে হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক ব্যক্তি নামায দীর্ঘ করার কারণে আমার নামায ছেড়ে দেয়ার উপক্রম হয়। একথা শুনে নবী (সা.) এমন চরম গোস্বা হলেন যে, উপদেশ দানকালে এরকম চরম গোস্বা হতে আমি তাকে কখনো দেখিনি। অতঃপর তিনি বললেন, হে লোকেরা, তোমরা লোকদেরকে (জামাআত থেকে) দূরে ভাগাচ্ছো। কোন ব্যক্তি নামাযের ইমামতি করলে তার উচিত (নামায) হালকা করা। কেননা, তাদের (অর্থাৎ, মুক্তাদীদের) মধ্যে রুগ্ন, দূর্বল ও ব্যস্ত লোকও থাকে। (বোখারী : ১ম খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম বোখারী ইল্‌ম-অধ্যায়ে এ হাদীছটি দ্বারা উপরোক্ত বিষয়টিই প্রমাণ করেছেন তিনি অতঃপর এ বিষয়টি প্রমাণে আরও তিনটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন; যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের সময় রাসূল (সা.)-এর গোস্বা হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। (বোখারী : ১ম খণ্ড, ১৯-২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অতএব গোস্বা বা বিরক্তি প্রকাশ কিম্বা তা হজম করার বিষয়টি শিক্ষকের হিত জ্ঞানের উপর ন্যস্ত থাকবে। হিতাহিত বিবেচনা পূর্বক দুইটির যে কোন একটি পন্থা তিনি গ্রহণ করবেন। তবে কোন ব্যাপারে গোস্বা হলে অন্য ব্যাপারে কিম্বা অন্যের প্রতি সে গোস্বার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা উচিত নয়। বোখারী শরীফে হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছে আছে হারিয়ে যাওয়া উট ধরে আনা সম্পর্কে প্রশ্ন করায় নবী (সা.) গোস্বা হন। (কারণ এ প্রশ্নটি ছিল নিষ্প্রয়োজনীয়। উট নিজে চরে খেতে সক্ষম, দীর্ঘদিন পিপাসা নিবারণ করার জন্য পানি না হলেও তার চলে। অতএব তা মালিকের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত ধ্বংস না হওয়ার বিষয়টি এক রকম নিশ্চিত। সুতরাং এহেন উট ধরে আনার প্রশ্ন অবান্তর।) অতঃপর (প্রশ্ন কর্তা) জিজ্ঞেস করল হারানো বকরীর হুকুম কি? তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (পূর্বেকার গোস্বার কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করেই) বললেন, সে বকরী তোমার জন্য অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য অথবা চিতা বাঘের জন্য। (বোখারী : ১ম খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা)

এ হাদীছের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। তবে এ থেকে অন্তত এতটুকু জানা যায় যে, কোন শিক্ষার্থীর অশোভনীয় প্রশ্নের কারণে শিক্ষক যদি গোস্বা হন অতঃপর সে শিক্ষার্থীই কোন যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন করে, তাহলে তার উত্তরে পূর্বেকার গোস্বার প্রতিক্রিয়া না থাকা উচিত। এমতাবস্থায় অন্য ছাত্রের উপর সে গোস্বার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ বা ক্লাসের শেষ পর্যন্ত সকলের উপর সে গোস্বা ঝাড়তে থাকা কোন ক্রমেই উচিত হওয়ার কথা নয়।

শিক্ষার্থী ও মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের করণীয়

ইসলাম শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নর-নারী, ধনী-গরীব, ছোট-বড়র কোন তারতম্য বিধান করেনি। প্রত্যেকের জন্যই বিদ্যা শিক্ষা করা ফরয। ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে যতটুকু বিদ্যার্জন অত্যাবশ্যক, ততটুকু ইল্‌ম অর্জন করা প্রত্যেকের জন্যেই ফরযে আইন। এটাকে ইসলামের সাধারণ শিক্ষা বলা যেতে পারে। এরপর জীবন ও জগতের যে কোন সমস্যার ইসলামী সমাধান প্রদানের মত জ্ঞানার্জন-যেটাকে উচ্চ শিক্ষা বলা যেতে পারে-সেটা ফরযে কেফায়া অর্থাৎ, কিছু লোক এ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করলেই চলবে, সকলে না কারলেও হবে। এই উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় লক্ষণীয়। যে পর্যায়েরই শিক্ষার্থী হোক না কেন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষকের বেশ কিছু মনস্তাত্ত্বিক দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। যার বিবরণ প্রদান করা হল–

১. শিক্ষার্থীর ধারণ ক্ষমতা লক্ষণীয়

জন্মগত এবং স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে মেধা, স্মরণ শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণ ক্ষমতার তারতম্য হয়ে থাকে। অতএব উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর ধারণ ক্ষমতা বিচার্য। এমনকি সর্বস্তরের শিক্ষার্থীর শিক্ষা দান ও উপস্থাপন নীতির ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষণীয়। কোন শ্রেণী বা কোন শাস্ত্রের জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন বা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর ধারণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য না রাখলে সেটা তার পক্ষে আয়ত্ত্ব করা সম্ভব হবে না। এতে অযথা সময়ের অপচয় তো হবেই, অধিকন্তু তার প্রতি লক্ষ্য না রাখলে বিদ্যা বিভ্রাট ঘটতে পারে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন,

مَا اَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيْثًا لَاتَبْلُغُهُ عُقُوْلُهُمْ اِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةٌ.

অর্থাৎ, যখন তুমি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন কোন কথা বর্ণনা করবে, যা তাদের বুদ্ধি ও ধারণ ক্ষমতার অগম্য, তখন তা তাদের কারো কারো পক্ষে ফিতনা হয়ে দাঁড়াবে। (মুকাদ্দাম-ায়ে মুসলিম)

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা‘আলা নিজের গুণাবলীর পরিচয় দিতে গিয়েও মানুষের ধারণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। প্রকৃত পক্ষে

আল্লাহ্‌র সত্তা ও তাঁর গুণাবলীর কোন নজীর বা তুলনা হয় না, তাই তার তত্ত্ব বোঝা ও বোঝানো উভয়ই অসম্ভব। অথচ এ সম্পর্কে কোন ধারণা দেয়া না হলে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করাও সম্ভবপর নয়, তাই মানুষের ধারণ ক্ষমতার মধ্যে রেখেই এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা প্রদান করেছেন। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহ.) বলেছেন, খোদার গুণাবলীর প্রশ্নটি চিন্তা-ভাবনা ও সাধনা ব্যতিরেকে সহজে বুঝে ফেলার নয়। সত্য বলতে কি-তার তত্ত্ব বোঝা ও বোঝানো উভয়ই অসম্ভব। কিন্তু সব চেয়ে মুশকিলের ব্যাপার হল এই, যদি খোদার গুণাবলী সম্পর্কে কোনই ধারণা না নেয়া যায়, তাহলে তার পরিচয় লাভও সম্ভবপর নয়। অথচ সভ্যতা ও আত্মিক মার্জনা সৃষ্টির জন্যে সেই পরিচয়ই একমাত্র পথ। তাই খোদার অপার লীলা সেই কঠিন পথটির এভাবে সমাধান ঘটিয়েছে যে, মানুষের গুণাবলীর ভেতরে এমন কতকগুলো গুণ বেছে নিয়েছে যেগুলো সব মানুষেরই জানা আছে। সে সব গুণের অধিকারী হওয়াকে তারা গৌরবের ব্যাপার বলে ভাবত। সেই গুণগুলোকে খোদার সুক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য গুণাবলীর স্থলে এমনভাবে পেশ করা হয়েছে, যাতে করে অক্ষম মানুষ সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা নিতে পারে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয়া হয়েছে "এ সবের কোন তুলনা নেই।" কারণ সীমাবদ্ধ গুণের মানুষ যেন খোদার গুণকে অনুরূপ ভাবতে গিয়ে ভুল ধারণা ও মূর্খতার শিকারে পরিণত না হয়। (আল-ফাওযুল কবীরঃ অনুবাদ গ্রন্থ-কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি)

এমনিভাবে জান্নাত জাহান্নাম সম্পর্কিত তথ্যাদি বর্ণনার ক্ষেত্রেও এই নীতি অবলম্বিত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী জান্নাতের নেয়ামতরাজি ও জাহান্নামের শাস্তিসমূহ এমন, যা মানব কল্পনার অতীত, তবে আল্লাহ্‌র পক্ষে তা বর্ণনা ক্ষমতার অতীত নয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার যথার্থ বর্ণনা প্রদানে সক্ষম, কিন্তু তা মানুষের ধারণ ক্ষমতা ও বোধের আওতা বহির্ভূত হতো বিধায় তার যথার্থ বর্ণনা পরিত্যাগ করে মোটামুটি একটা ধারণা দেয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য-মানুষের ধারণ ক্ষমতার প্রতি রেয়ায়েত করেই এরূপ করা হয়েছে। রাসূল (সা.)ও একই বিষয়কে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি শ্রোতার ধারণ ক্ষমতা ও তার মন-মেজায প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। হাদীছের বিশাল ভাণ্ডারে এ সম্পর্কিত বহু প্রমাণ রয়েছে।

২। শিক্ষার্থীর মন- মেজায লক্ষণীয়

প্রাকৃতিক নিয়মেই শিক্ষার্থীদের মন-মেজায, রুচি ও প্রকৃতির বিভিন্নতা থাকবে। এরই প্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষাদান ও বক্তা বক্তব্য প্রদান কালে লক্ষ্য রাখবেন যে, কোন্ বিষয়টি শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী এবং তার প্রকৃতি ও চাহিদার অনুকূল, সেমতে সে বিষয়টিকেই তিনি নির্বাচন করবেন। শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের মন-মেজায, রুচি ও প্রকৃতির কাছে চলে যেতে হবে, তখনই তার বক্তব্য তাদের জন্য অধিক ফলপ্রসূ হবে এবং তখনই তাদের মন তার বক্তব্য ও শিক্ষাকে অধিকতর গ্রহণ করবে। রাসূল (সা.) শিক্ষার্থীর অবস্থা ভিন্নে একই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন রকমে প্রদান করেছেন। যেমন মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ডে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর খিদমতে আরয করল যে, ইসলামের সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসূল (সা.) বললেন, তুমি লোকদের পানাহার করাবে এবং সালাম করবে তোমার পরিচিত কিংবা অপরিচিত যেই হোক না কেন। (মুসলিম : ১ম খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

অপর এক হাদীছে হযরত আবূ মূসা (রা.) বলেন, আমি আরয করলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল, ইসলামের কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, ইসলামে সর্বোত্তম আমল হল তার, যার মুখ ও হাত থেকে সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে। (মুসলিম : ১ম খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

এখানে আল্লামা নববী বলেন, প্রশ্নকারী ও উপস্থিত লোকদের অবস্থার বিভিন্নতা বিবেচনা করেই নবী (সা.) এরূপে একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর প্রদান করেছেন। এক ক্ষেত্রে প্রশ্নকারী বা উপস্থিতদের মধ্যে সালাম প্রদান ও মেহমানদারীর ত্রুটি লক্ষ্য করে এ বিষয় দুটিকেই ইসলামের সর্বোত্তম আমল বলে আখ্যায়িত করেছেন, অন্য ক্ষেত্রে প্রশ্নকারী বা উপস্থিত লোকদের অবস্থার আলোকে মুসলমানদেরকে কষ্ট না দেয়ার বিষয়টিকে সর্বোত্তম আখ্যায়িত করেছেন।

একদা আব্দুল কায়ছ গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রাসূল (সা.)-এর কাছে হাজির হলে তিনি তাদেরকে চারটি বিষয় পালনের নির্দেশ দেন এবং চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করেন। নিষিদ্ধ চারটি বিষয় ছিল দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্‌ফাত ও নাকীর ব্যবহার করা। এ ছিল তদানিন্তন আরবদের মধ্যে প্রচলিত চারটি সুরা-পাত্র। 'দুব্বা' হল কদুর খোল বা লাউয়ের খোলস থেকে তৈরী পাত্র, 'হানতাম' হল সবুজ রংয়ের কলস;

'মুযাফ্ফাত' হল আলকাতরা জাতীয় পদার্থের প্রলেপ দেয়া পাত্র এবং 'নাকীর' হল খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডমূল থেকে তৈরী পাত্র। এখানে উল্লেখ্য যে, আব্দুল কায়ছ গোত্রের এই আগমন হয়েছিল অষ্টম হিজরীতে বা মতান্তরে ষষ্ঠ হিজরীতে; আর শরাব বা মদ্য হারাম ঘোষিত হয়েছিল চতুর্থ হিজরীতে। এতদসত্ত্বেও তাদেরকে এই চারটি পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করার কারণ গুলোর মধ্যে একটা কারণ এই ছিল যে, তারা এই পাত্রগুলো ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল, এমতাবস্থায় এ পাত্রগুলো ব্যবহারের অনুমতি থাকলে এই পাত্রগুলো দেখলে কিংবা ব্যবহার করতে গেলে তাদের মনে শরাবের প্রতি সেই পূর্বের নেশা আবার উদ্বেলিত হয়ে উঠতে পারে। তাই মনস্তাত্ত্বিক নীতি অনুসারে এই পাত্রগুলো ব্যবহার করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়। পরবর্তীতে শরাবের নেশা তাদের মন থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য কাল অতিক্রান্ত হলে এই পাত্রগুলো ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞাও রহিত হয়ে যায়।

অনেক বুযুর্গদের ইতিহাসেও পাওয়া যায় তারা মুরীদদের মন-মেজায বুঝে তাদেরকে তালকীন দিতেন। সকলের ক্ষেত্রেই একই নীতি পদ্ধতি গ্রহণ করতেন না। উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহ.) হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণের সময় বললেন যে, হযরত! যিকর, শুগল, সাধনা, মুজাহাদা আমার দ্বারা মোটেই হবে না, রাত্র জাগরণও আমার পক্ষে হয়ে উঠবে না। হযরত হাজী সাহেব জওয়াবে মুচকি হেসে বললেন, বেশতো কি ক্ষতি! কিন্তু পরবর্তিতে বাস্তবে ঘটল কি? হযরত হাজী সাহেব যখন রাত্রে তাহাজ্জুদ ও যিকরের জন্য উঠলেন তখন হযরত গাঙ্গোহীও উঠে গেলেন। (তারীখে মাশায়েখে চিশ্ত : ২৭৪ পৃষ্ঠা)

এমনিভাবে শিক্ষক তার শিক্ষার আসরে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ওপর যেসব নিয়ম নীতি বা কড়াকড়ি আরোপ করবেন সে ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীদের অবস্থা ভেদে কিছু তারতম্য রাখতে হবে। সকল শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেই একই নিয়ম নীতি বা একইরূপ কড়াকড়ি আরোপিত হলে অনেকেই তার শিক্ষার আসরে বাধাগ্রস্ত বা বিতাড়িত হবে। নবী (সা.)-এর দরবারে সাধারণ সাহাবীদের ক্ষেত্রে বিশেষ জরূরী প্রশ্ন ব্যতীত কোন প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু পল্লিবাসী বেদুঈনদের ক্ষেত্রে এ নীতি শিথিল ছিল; নবী (সা.) এরূপ লোকদের সব জাতীয় প্রশ্নই বরদাশত করতেন। এমনকি নববী দরবারের শান বিরোধী আচরণও নবী (সা.) তাদের ক্ষেত্রে নিরবে

সয়ে যেতেন। তাদের ব্যাপারেও অন্যদের ন্যায় কড়াকড়ি আরোপিত হলে বেদুঈন সুলভ হটকারিতা বশতঃ হয়ত তারা রাসূলের দরবার থেকে এমনকি হয়ত দ্বীন ইসলাম থেকেই সরে পড়ত। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। উক্ত হাদীছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করার ব্যাপারে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। তাই আমরা চাইতাম যে, পল্লিবাসীদের কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসে তাঁকে প্রশ্ন করুক আর আমরা শুনি। তারপর একদিন গ্রাম থেকে এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললেন, হে মুহাম্মাদ, ... (সে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করল আর রাসূল (সা.) তার উত্তর দিলেন এবং আমরা শুনলাম।) [মুসলিম : ১ম খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা]

রাসূল (সা.)-এর এরূপ নীতির মধ্যে কতখানি মনস্তত্ত্ব নিহিত ছিল তা খুব সহজেই অনুমেয়।

৩। শিক্ষার্থীর পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখাঃ

শিক্ষার্থীর মন-মেজায, মানসিকতা ইত্যাদি বুঝে সে আলোকে তার সামনে বক্তব্য রাখতে হলে শিক্ষার্থী কোন্ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতায় বসবাস করে এবং শিক্ষার্থী বর্তমান কোন্ পরিস্থিতিতে রয়েছে তা বুঝতে হবে। যারা পল্লি পরিবেশে বসবাস করে তাদের মন-মেজায ও মানসিক ঝোঁক প্রবণতা শহুরে লোকদের চেয়ে ভিন্নতর হবে, উভয়ের জানার প্রয়োজনীয়তার ধরনও হবে ভিন্ন। সে মতে উভয়ের সামনে বক্তব্যও সে আলোকেই রাখতে হবে। যার মধ্যে যে বিয়ষ জানার আগ্রহ বা প্রয়োজনীয়তা নেই তার সম্মুখে সে বিষয়ের বক্তব্য মনস্তাত্ত্বিক ভাবেই অনীহার জন্ম দেবে। আব্দুল কায়েছ গোত্রের প্রতিনিধি দলকে রাসূল (সা.) যে বিষয়গুলোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে ছিল ঈমান, নামায, যাকাত, রোযা ও গনীমতের এক পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে প্রদান প্রসঙ্গ। কোন কোন সুক্ষ্মদর্শী হাদীছ বিশারদ বলেন, রাসূল (সা.) এ প্রতিনিধি দলকে হজ্জের বিষয়ে নির্দেশ দেননি অথচ নামায, যাকাত ও রোযার ন্যায় হজ্জও একটি ফরয কর্ম। এর কারণ-এ গোত্রটি এমন এক স্থানে বসবাস করত, যেখান থেকে হজ্জের মওসূমে আগমন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না-পথিমধ্যে মুযার গোত্রের কাফেররা তাদের জন্য প্রতিবন্ধক ছিল, যে দিকে হাদীছেও ইঙ্গিত রয়েছে। অন্যদিকে এ গোত্রটি যোদ্ধা ছিল বিধায় গনীমতের মাল সম্পর্কিত একটি বিশেষ বিধান তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল। এমনিভাবে

নবী (সা.) তাদেরকে চারটি পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেন (পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) অথচ নিষিদ্ধ আরও বহু বিষয় ছিল যা তিনি তাদেরকে বলেননি, এর কারণও এই যে, তাদের পরিবেশে এই পাত্রগুলোর ব্যবহার ব্যাপকভাবে হত। অতএব এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা তাদের জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয় ছিল।

শিক্ষাদান কালে শিক্ষার্থীর বর্তমান মানসিক পরিস্থিতিও বিবেচনা করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে শিক্ষণীয় বিষয়টি তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে কি-না তা বিবেচনা করতে হবে। এ জন্যেই বলা হয়েছে-মুমূর্ষ ব্যক্তিকে কালিমা শিক্ষা দেয়ার কথা হাদীছে এসেছে কিন্তু তা খুব সতর্ক পদ্ধতিতে হতে হবে। মুমূর্ষ ব্যক্তির হুশ থাকা অবস্থায় একবার আছানীর সাথে কালিমা ও ইস্তেগফার পাঠ করানোর পর বারবার কালিমা পাঠের জন্য তাগিদ করতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত থানভী (রহ.) লিখেছেন- সে তখন রোগ যন্ত্রণা ও রূহ কবজের মধ্যে নিপতিত থাকে, এ অবস্থায় বারবার কালিমা পাঠের জন্য তাগিদ করলে তার মনে সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়ে কালিমা ও ইস্তেগফারের প্রতি অনিহা সৃষ্টি হতে পারে। অথবা খোদানাখাস্তা যদি সে কালিমা পাঠ করতে অস্বীকার করে ফেলে তাহলে কত বড় খারাপ কথা চিন্তা করুন। তিনি আরও লিখেছেন-যদি মুমূর্ষ ব্যক্তির কোন হুশ চেতনা না থাকে, তবে তাকে কোন কিছু পড়তে বলবে না বরং তার নিকট বসে উচ্চস্বরে সূরা ইয়াসীন, কালিমা ও অন্যান্য কালাম পাঠ করবে। যদি কিছুটা অনুভূতি এসে যায়, তখন সে কলব দ্বারা এসবের প্রতি মনোযোগ দিবে এবং সেই মনোযোগের মধ্যেই হবে তার খাতিমা বিলখায়র বা জীবনের সুন্দর পরিসমাপ্তি। (এসলাহে ইনকিলাবে উম্মত)

সময়, পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা পূর্বক শিক্ষা প্রদানের নীতির আলোকেই কুরআনে কারীমে মক্কী সূরা বা আয়াতগুলোতে বেশীর ভাগ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিষয়ক এবং পূর্ববর্তী জাতি সমূহের উত্থান পতন বিষয়ক কথা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোতে আহকাম ও আইন-কানুন অপেক্ষাকৃত কম বিবৃত হয়েছে। আর মদনী সূরা বা আয়াতগুলোতে বেশীর ভাগ আইন-কানুন ও বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এমনিভাবে উভয় প্রকার সূরা বা আয়াতগুলোর মধ্যে আরও বহু রকম বর্ণনা ও তথ্যগত ব্যবধান রয়েছে। বলা বাহুল্য-হিজরতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিবেশ, পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার পার্থক্যের কারণেই উভয় প্রকার আয়াত ও সূরাগুলোর মধ্যে এই ব্যবধান সূচিত হয়েছে।

৪। শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা অনুসারে তার জন্য বিদ্যা-শাস্ত্র নির্বাচন

জন্মগত এবং স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের মন-মেজায ও রুচি প্রকৃতির বিভিন্নতা থাকবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন্ বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর ঝোঁক ও মনোযোগ বেশী এবং কোন্ বিষয়টি তার রুচীর বেশী অনুকূল সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষার্থীর ঝোঁক ও মনোযোগের আধিক্য থেকেই উপলব্ধি করা যাবে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা ও সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে। সে মতে উক্ত বিষয়টি তার উচ্চ শিক্ষার জন্য নির্বাচিত করলে তার জন্য তা অধিক সম্ভাবনাময়ী হবে। কারও ঝোঁক থাকবে হাদীছের প্রতি, কারও থাকবে তাফসীরের প্রতি, কারও ফেকহ-র প্রতি, কারও সাহিত্য-সাংবাদিকতার প্রতি, কারও বা থাকবে বিজ্ঞান ও গবেষণার প্রতি। এক্ষেত্রে ঝোঁক সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রটি তার জন্য নির্বাচিত করলেই সে ক্ষেত্রে সে অধিক সফলতা বয়ে আনতে পারবে। বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকূল। বাস্তব ইতিহাসের অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায়-ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে যিনি দক্ষতা অর্জন করেছেন বাল্যকাল থেকেই সে বিষয়টির প্রতি তার অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়েছে। অতএব শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা উপলব্ধি করতে হবে এবং তারই আলোকে শিক্ষার্থীকে গড়ে তুলতে হবে।

৫। শিক্ষার্থীর সামর্থ ও দক্ষতার মূল্যায়ন

যতগুলো বিষয় শিক্ষার্থীর প্রেষণার ওপর সুপ্রভাব ফেলে, তার মধ্যে একটি অন্যতম হল তার সামর্থ ও দক্ষতার মূল্যায়ন। নিজের সামর্থের বা দক্ষতার মূল্যায়ন হলে মনস্তাত্ত্বিক ভাবেই মানুষের আকাঙ্খার স্তর (Level of Aspiration) উন্নীত হতে থাকে। আর এই আকাঙ্খা যতই উঁচু হয়, তার প্রেষণাও তত বলবতী হয়; শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির নিজের সামর্থ সম্পর্কে সচেতনতা ও সাফল্যবোধ তার মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করে ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে। এই আস্থা ও উৎসাহ তার মধ্যে প্রতিযোগিতা (Competition)-এর মনোভাব যোগায়, শিক্ষায় অগ্রগতির ক্ষেত্রে যার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পক্ষান্তরে সামর্থের অবমূল্যায়ন ও দক্ষতার অস্বীকৃতি ব্যক্তির মধ্যে হীনতাবোধ (Inferiority Complex) জাগাতে পারে, যা তার শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করবে। এরই প্রেক্ষিতে মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও সামর্থের স্বীকৃতি, সাফল্যের জন্য প্রশংসা ও পুরস্কারের গুরুত্ব অনেক। তবে

দক্ষতার মূল্যায়ন, প্রশংসা, পুরস্কার ও প্রতিযোগিতার ব্যাপারগুলো একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকতে হবে, অন্যথায় শিক্ষার্থীর মনে অবাঞ্ছিত ও অসুস্থ প্রভাব পড়তে পারে। নবী কারীম (সা.)ও সীমিত পরিসরে শিক্ষার্থীর সামনে উৎসাহমূলক স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। বোখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি প্রশ্ন করেছিলেন– হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন কোন্ মানুষ আপনার সুপারিশ পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে? রাসূল (সা.) বললেন, আবূ হুরায়রা, আমি ভেবেছিলাম তোমার পূর্বে একথা সম্পর্কে আর কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করবে না (অর্থাৎ, তুমিই সর্বাগ্রে এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করবে)। কেননা হাদীছ জানার ব্যাপারে আমি তোমার তীব্র আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। (এখন শোন) কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভের সৌভাগ্য সেই মানুষের হবে, যে খালেছ অন্তরে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে। (বোখারী : ১ম খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা)

এ হাদীছের ব্যাখ্যার এক পর্যায়ে আল্লামা আইনী বলেছেন, এ হাদীছ দ্বারা শিক্ষার্থীর আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষতা সম্পর্কে তাকে অবহিত করার বিষয়টিও প্রমাণিত হয়। উদ্দেশ্য-যেন তার মধ্যে উক্ত বিষয়ে জ্ঞানার্জনের উৎসাহ- উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। (উমদাতুলকারী : ২য় খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা)

শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর করণীয়

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক হক ও একের প্রতি অন্যের করণীয় বিষয় অনেক রয়েছে, যা কুরআনের একাধিক আয়াত ও বহু হাদীছে বিবৃত হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষার্থীর ব্যাপারে শিক্ষকের করণীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষকের যেমন করণীয় রয়েছে, তেমনিভাবে শিক্ষার্থীরও বেশ কিছু করণীয় রয়েছে। মনে রাখতে হবে, যে শিক্ষার্থী তার প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ ধরে রাখতে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে, তার শিক্ষাও তত অগ্রগতি ও উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করতে থাকবে। তাই আচার-আচরণ, উক্তি ও বক্তব্য কোন কিছু দ্বারাই যেন তার প্রতি শিক্ষকের মনে অনীহা বা অমনোযোগিতা সৃষ্টি না হয় সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে সজাগ থাকতে হবে। বরং সর্বদা শিক্ষককে সন্তুষ্ট রাখতে হবে এবং কোন কারণে শিক্ষক অসন্তুষ্ট হলে তার প্রতিবিধান করতে হবে। এজন্য শরীআত নিম্নোক্ত নীতিমালা প্রদান করেছে।

১। অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষকের বক্তব্য শ্রবণ

শিক্ষাদানকালে শিক্ষার্থীকে নীরবতার সাথে সম্পূর্ণ একান্ত মনে শিক্ষকের বক্তব্য শ্রবণ করতে হবে। হযরত জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছে আছে– নবী কারীম (সা.) বিদায় হজ্জের (ভাষণের) সময় তাকে বললেন,

اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَاتَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

অর্থাৎ, তুমি লোকদেরকে নীরব করাও। অতঃপর বললেন, তোমরা আমার পরে কাফের হয়ে যেওনা যে, একে অপরের গর্দান মারবে। (বোখারী : ১ম খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা)

এ হাদীছ দ্বারা বোঝা যায় যে, শিক্ষকের শিক্ষাদান ও আলোচনাকালে নীরবতা অবলম্বন পূর্বক মনোনিবেশ সহকারে তার বক্তব্য শোনা উচিত-এদিক সেদিক তাকানো উচিৎ নয়, এতে শিক্ষকের বক্তব্যের ধারা থমকে যেতে পারে। এমনিভাবে কারও সাথে কথা বলা, শোরগোল করা বা অমনোযোগিতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। কেননা, শিক্ষার্থীর এরূপ উদাসীনতা পরিলক্ষিত হলে শিক্ষকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। একই কারণে শিক্ষকের সামনে শিক্ষার্থীর এমন কোন আচরণও শোভনীয় নয় যার দ্বারা শিক্ষার্থীর অমনোযোগিতা বা উদাসীনতা প্রকাশ পায়।

২। অবাঞ্ছিত ও বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন না করা

বক্ষমান পাঠের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোন প্রশ্ন শিক্ষকের বক্তব্যের সাবলিলতা ও ধারাবাহিকতা নষ্ট করে দেয়। এহেন প্রশ্নে শিক্ষক মানসিক বিভ্রান্তিতেও পড়তে পারেন। এরূপ কোন বিভ্রান্তিকর কিম্বা অবাঞ্ছিত প্রশ্ন অথবা অর্থহীন, অস্পষ্ট বা অযৌক্তিক প্রশ্ন করাও উচিৎ নয়। এরূপে উচিত নয় নিজের মেধার প্রখরতা প্রদর্শন কিম্বা শিক্ষককে পরীক্ষা করার জন্য কোন প্রশ্ন করা। হাদীছে আছে–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْاُغْلُوْطَاتِ.

অর্থাৎ, নবী কারীম (সা.) বিভ্রান্তিকর বক্তব্য থেকে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাঊদ)

অর্থের দিক থেকে হাদীছের অর্থ ব্যাপক, তবে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যকার বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন বা বক্তব্যও এর ব্যাপকতার আওতাভুক্ত।

বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী (সা.) বলেছিলেন,

لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَاِنَّ الشَّاهِدَ عَسٰى اَنْ يُّبَلِّغَ مَنْ هُوَ اَوْعٰى لَهٗ مِنْهُ.

অর্থাৎ, উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়। উপস্থিত লোকেরা হতে পারে এমন লোকদের নিকট পৌঁছে দিবে, যারা তা অধিক সংরক্ষণ করবে। (বোখারী : ১ম খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা)

এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষক থেকে শিক্ষার্থী অধিক স্মৃতি শক্তির অধিকারী বা অধিক মেধাবী হতে পারে। এটা সচরাচর ও সব যুগেই হতে পারে, তাই শিক্ষার্থীর মনে রাখা উচিত তার ছাত্রও তার চেয়ে অধিক মেধার অধিকারী হতে পারে। এখন সে মেধার বড়ায়ী প্রদর্শন করে শিক্ষককে হেয় করলে তাকেও এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া লাগতে পারে। সুতরাং শিক্ষকের সামনে তার মেধার অহমিকা প্রদর্শন সমীচীন নয়।

৩। শিক্ষকের সেবা ও তার সাহচর্য লাভঃ

মানুষের মন জয় করার ক্ষেত্রে সেবার ভূমিকা অপরিসীম, তাই শিক্ষকের মন জয় ও মনতুষ্টির জন্য শিক্ষকের সেবা অপরিহার্য। দৈহিক, আর্থিক সর্বতোভাবে শিক্ষকের সেবা দ্বারা তার মনের কাছে পৌঁছে যেতে হবে, তার আপন হয়ে যেতে হবে। তাহলেই শিক্ষকের নিবিড় অভিনিবেশটুকু নিবদ্ধ হবে সেই শিক্ষার্থীর প্রতি। কুরআন ও হাদীছে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর প্রতি একজন বড় অনুগ্রহশীল হিসেবে মূল্যায়ন এবং জ্ঞান শিক্ষাদানকেই সবচেয়ে বড় দান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতএব মনে রাখতে হবে-এত বড় অনুগ্রহ এবং দানের বিপরীতে শিক্ষকের যত সেবাই করা হোক তা নগন্য। বায়হাকী গ্রন্থে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের শেষে নবী (সা.) বলেছেন,

وَاَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِىْ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهٗ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمِيْرًا وَحْدَهٗ.

অর্থ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অধিক দানশীল হল সে ব্যক্তি, যে নিজে ইল্‌ম শিক্ষা করে এবং তা মানুষের মধ্যে বিতরণ করে। কিয়ামতের দিন সে নিজেই একজন আমীর রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। (বায়হাকী)

ওয়াজ, বক্তৃতা বা ভাষণ শুনে কিম্বা কিতাব অধ্যয়ন করে আক্ষরিক বিদ্যা লাভ করা যায় বটে, কিন্তু শিক্ষার মূল মেজাযের সাথে পরিচিতি ঘটে না, জীবনের প্রতিটা ছন্দ-পতনে যে শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা প্রত্যক্ষ করা যায় না, জ্ঞানের বাস্তব রূপ সম্পর্কে অস্পষ্টতা কাটে না। এগুলো হয় শিক্ষকের সাহচর্য দ্বারা। সাহচর্যে তাই জ্ঞানের বহু দিগন্ত উন্মোচিত হয়, জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ শিক্ষার্থীর কাছে উদ্ভাসিত হয় এবং সাহচর্যের ফলে শিক্ষকের মধ্যে শিক্ষার প্রায়োগিক দিক পর্যবেক্ষণ করার দরূণ শিক্ষার প্রতি তার প্রেষণা বলবতী হয় আর তার জ্ঞানের বহর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) তার নিজের সম্পর্কে বলেন,

اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِشِبْعِ بَطْنِهٖ وَيَحْضُرُ مَا لَايَحْضُرُوْنَ وَيَحْفَظُ مَا لَايَحْفَظُوْنَ.

অর্থাৎ, আবূ হুরায়রা তো সর্বদা নবী কারীম (সা.)-এর খেদমতে পড়ে থাকত, যা খাবার পেত তাতেই তৃপ্ত হয়ে পড়ে থাকত ব্যাস। সে এত বেশী পরিমাণে উপস্থিত থাকত যা অন্যেরা থাকত না, সে এতটা বেশী মুখস্থ রাখত অন্যরা যা রাখত না। (বোখারী : ১ম খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা)

এ হাদীছ দ্বারা জানা যায়-সর্বদা রাসূল (সা.)-এর সাহচর্যে থাকার কারণে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ইল্মের দিক থেকে কতটা উপকৃত হতে পেরেছেন। আর সর্বদা সাহচর্যের দ্বারা শিক্ষকের খেদমত ও সেবার সুযোগ লাভের বিষয়টিও সহজেই অনুমেয়।

শিক্ষাদান-পদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞান

বাচনিক শিক্ষাদান-পদ্ধতি তথা উপস্থাপনা-নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে কোন শিক্ষাই হোক না কেন, তার উপস্থাপন ও পরিবেশনের উপর নির্ভর করে তার কার্যকারিতা। এ ক্ষেত্রেও ইসলামী শিক্ষানীতিতে সুস্পষ্ট নির্দেশনামালা রয়েছে। যথা:

১. মনোযোগ আকর্ষণ

মানুষের মন সব সময়ই সব কথা শোনার জন্য প্রস্তুত থাকে না। কাজেই শিক্ষাদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি শোনার জন্য শিক্ষার্থীর মানসিক

প্রস্তুতি ও প্রত্যাশা (Set and expectancy) সৃষ্টি পূর্বক মনোযোগ আকর্ষণ প্রয়োজনীয়। মানসিকভাবে প্রস্তুত করার পূর্বে বক্তব্য প্রদান করলে সে বক্তব্য শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করবে না বরং তা শ্রোতার মনে বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে, যা অনেক সময় শিক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণ হতে পারে। আবার মনোযোগ আকৃষ্ট না হলে কোন কথাই তার স্মৃতি ভান্ডারে সংরক্ষিত হবে না। বিশেষত কোন অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলে তার জন্য বিশেষভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট করার প্রয়োজন রয়েছে।

নবী কারীম (সা.) বহু ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ভাবে বক্তব্যের পূর্বে সাহাবীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে নিতেন। একবার তিনি সমবেত সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন-তোমরা কি জান, দরিদ্র কে? সাহাবীগণ জওয়াব দিলেন আমরা দরিদ্র তাকেই বলি, যার নিকট টাকা-পয়সা, মাল-সামান না থাকে। (এভাবে প্রশ্ন করে তিনি সাহাবীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করার পর বললেন), আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত দরিদ্র সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার নিকট নামায, রোযা, যাকাত প্রভৃতি নেক আমলের ভান্ডার থাকবে কিন্তু এতদসঙ্গে তার আমল নামায় এ-ও থাকবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারও প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে, কারও সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করেছে, কারও রক্তপাত ঘটিয়েছে, কাউকে প্রহার করেছে। তখন তার কিছু নেকী এই মাজলূমকে দেয়া হবে, কিছু ঐই মাজলূমকে দেয়া হবে। আর হক আদায়ের পূর্বে তার নেকী নিঃশেষ হয়ে গেলে হকদারদের পাপ তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে। পরিশেষে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, তোমরা কি জান.....? নবী (সা.)-এর এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল মনোযোগ আকর্ষণ করা। প্রকৃত উত্তর সাহাবীদের নিকট থেকে বের করার উদ্দেশ্য ছিল না।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, একবার আমি নবী (সা.)-এর বাহনের পিছনে বসেছিলাম। আমার ও নবী (সা.)-এর মাঝখানে হাওদার কাষ্ঠখন্ড ছাড়া আর কোন ব্যবধান ছিল না। নবী (সা.) বললেন, হে মুআয ইবনে জাবাল! আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ, বান্দা হাজির; আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। তারপর তিনি কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আবার বললেন, হে মুআয ইবনে জাবাল, আমি আরয করলাম বান্দা হাজির; আপনার আনুগত্য শিরোধার্য হে আল্লাহর রাসূল! তারপর তিনি আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আবার বললেন, হে মুআয ইবনে জাবাল! আমি আরয করলাম হে আল্লাহর রাসূল! বান্দা আপনার খেদমতে হাজির; আপনার

আনুগত্য শিরোধার্য। তিনি বললেনঃ তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কি হক রয়েছে? আমি আরয করলাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই তা ভাল জানেন। নবী (সা.) বললেন, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক এই যে, তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। তারপর কিছুদূর চললেন। অতঃপর নবী (সা.) আবার বললেন হে মুআয ইবনে জাবাল! আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! বান্দা আপনার খেদমতে হাজির; আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। নবী (সা.) বললেন, তুমি কি জান এগুলো করলে আল্লাহর কাছে বান্দার কি হক আছে? আমি আরয করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। নবী (সা.) বললেন, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না। (মুসলিম : ১ম খণ্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা)

এ হাদীছে দেখা যায়-একই বাহনে আরোহন করার পরও মূল কথা বলার পূর্বে বার বার নবী (সা.) মুআয ইবনে জাবালকে আহ্বান করছেন। উদ্দেশ্য মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-এর মনোযোগ আকর্ষণ করা। কখনো মনোযোগ আকর্ষণ করার নিমিত্তে নবী (সা.) চড়া আওয়াজে চোখ লাল করে ভাষণ দিয়েছেন, কখনো সাফা পাহাড়ে চড়ে শত্রুর আক্রমণের সতর্কতা শুনিয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, তারপর আপন বক্তব্য পেশ করেছেন।

২. ধারণ ক্ষমতা লক্ষণীয়

জন্ম ও প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মেধা, বুদ্ধি ও ধারণ ক্ষমতার তারতম্য হয়ে থাকে। তাই উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে যেমন বিষয়টি লক্ষণীয়, তেমনি উপস্থাপনা বা শিক্ষাদান কালেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর ধারণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ভাষা বর্ণনাভঙ্গি ও উপস্থাপনা অবশ্যই এমন হতে হবে, যাতে শিক্ষার্থী অতি সহজেই তা আয়ত্ত করতে পারে। অন্যথায় শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত্ব করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভবপর না হওয়ায় শিক্ষার প্রতি তার অনীহা সৃষ্টি বা জ্ঞান বিভ্রাটের সম্ভাবনা দেখা দিবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন,

مَا اَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيْثًا لَاتَبْلُغُهُ عُقُوْلُهُمْ اِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةٌ.

অর্থাৎ, যখন তুমি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন কোন হাদীছ বর্ণনা করবে যা তাদের বুদ্ধির (ধারণ ক্ষমতার) অগম্য, তখন তা তাদের কারও কারও পক্ষে ফিৎনা (জ্ঞান বিভ্রাট বা ইসলামের প্রতি অনীহা) হয়ে দাঁড়াবে। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম)

হযরত আলী (রা.) বলেন,

حَـدِّثُوا الـنَّـاسَ بِـمَا يَعْـرِفُـوْنَ، اَتُـحِـبُّوْنَ اَنْ يُّـكَـذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُـوْلُـهٗ.

অর্থাৎ, মানুষের কাছে এমন কথা বর্ণনা কর যা তারা বুঝতে পারে। তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক। (বোখারী : ১ম খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা)

ইমাম বোখারী এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে, সব কথা সকলের সামনে বর্ণনা করা উচিত নয়। দাওয়াতের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত আলী (রা.) বলেছেন, মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিমাণ বিবেচনা করে তার সঙ্গে কথা বল। বস্তুত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এটি একটি মৌলিক নীতি মনে রাখতে হবে-শিক্ষককে তার নিজের লেভেল থেকে নয় বরং শিক্ষার্থীর লেভেলে নেমে কথা বলতে হবে।

৩. ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে শিক্ষাদান

যে কোন বিষয় বা শাস্ত্রের তথ্যসমূহ মস্তিষ্কে প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিকতা রক্ষা করতে হবে, ধীরে ধীরে নীচ থেকে উপর ও ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ-এই ক্রমানুসারে অগ্রসর হতে হবে। শিক্ষক যদি আবেগের আতিশয্যে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের স্তর থেকে অনেক উপরে উঠে কথা বলেন, তাহলে শিক্ষার্থীর জন্য তা জটিলতার সৃষ্টি করবে। হযরত ইমাম বোখারী (রহ.) আল্লাহ তা'আলার বাণী كُوْنُوا رَبَّانِيِّيْنَ(তোমরা রব্বানী হয়ে যাও)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, রব্বানী অর্থাৎ, যিনি ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ-এই ক্রমানুসারে মানুষকে জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেন। (বোখারী : ১ম খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা)

৪. বিরতি সহকারে শিক্ষাদান

শিক্ষাদানের মাঝে মাঝে বিরতি প্রদান করা উচিত। একটানা শিক্ষাদানে শিক্ষার্থীর মনে ক্লান্তি ও অবসাদ আসে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, অনেক ধরনের শিক্ষণে কিছু সময় অনুশীলনের পর কিছু সময় বিরতি প্রদান করলে শিক্ষা ভাল হয়। অন্যথায় শিক্ষার প্রতি মনে ত্যাক্ততা সৃষ্টি হতে পারে, এক ঘেঁয়েমির ফলে মেধা স্থবির হয়ে যেতে পারে। দাওয়াত, ওয়াজ-নসীহত ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ নীতিটি প্রযোজ্য। দাওয়াত অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আবূ ওয়ায়েল (রহ.) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদেরকে ওয়াজ শোনাতেন। কোন এক

লোক তাকে বলল, হে আবূ আব্দির রহমান! আমি চাই যে, প্রতিদিনই আপনি আমাদেরকে ওয়াজ শোনাবেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের ত্যাক্ত করতে আমার মন চায় না। আর এ বিষয়টাই আমাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখছে। আমি ওয়াজের মাঝে তোমাদের বিরতি দিয়ে থাকি, যেরূপ নবী করীম (সা.) ওয়াজের মাঝে মাঝে আমাদেরকে বিরতি প্রদান করতেন আমরা ত্যাক্ত হয়ে যাব-এই আশংকায়। (বোখারী : ১ম খণ্ড, ১৬ পৃষ্ঠা)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীছটি ওয়াজ প্রসঙ্গের, তবে ওয়াজ ও শিক্ষাদান প্রায় একই শ্রেণীভুক্ত, তাই উভয় ক্ষেত্রেই এই নীতিটি প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিকভাবে যে প্রায় প্রতিদিন ক্লাশ করানো হয় সে ক্ষেত্রে প্রতি ঘন্টা অন্তর বিষয় বস্তু বা শাস্ত্রের পরিবর্তনের ফলে নতুনত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে, ফলে মস্তিষ্কের সজিবতা বহাল থাকে। এটি মনস্তাত্ত্বিক নীতির আওতা বহির্ভুত নয়।

৫. সাধারণ শিক্ষায় দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা পরিহার করা

কুরআন ও হাদীছ শিক্ষিত, মূর্খ, শহুরে, গেঁয়ো, সর্বশ্রেণীর লোকদের জন্য হেদায়েত। এজন্য কুরআন ও হাদীছে সাধারণত দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা পরিহার করা হয়েছে। সর্বশ্রেণীর লোকই যেন তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এজন্য সাদামাটাভাবে সব কথা উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেন বুদ্ধিজীবি শ্রেণী সেই সূত্র ধরে গবেষণায় অগ্রসর হতে পারেন। এ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সাধারণ শিক্ষায় দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা পরিহার করতে হবে। তদুপরি সাধারণ শিক্ষায় এ ধরনের আলোচনা শিক্ষার্থীর ধারণ ক্ষমতা ও জ্ঞানের অগম্য হওয়ার আশংকায় তা পরিহার করা উচিত। পূর্বে ২নং ধারায় বিষয়টির প্রতি দিক নিদের্শনা পাওয়া যায়।

৬. শিক্ষাকে বাস্তবায়নের জন্য মন-মস্তিষ্ক প্রস্তুত করা

শুধু শিক্ষা অর্জন করলেই তা বাস্তবায়নের মনোভাব সৃষ্টি হয় না। তার জন্য মন-মস্তিষ্ক প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, শিক্ষাকে বাস্তবায়নের জন্য অনুপ্রেরণা যোগানোর প্রয়োজন রয়েছে। কুরআনে কারীমে বিধি-বিধানের বর্ণনা রীতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রতিটি বিধি-বিধান বর্ণনা করার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। 'আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর', 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত', 'তোমরা যা কর আল্লাহ

তা'আলা তা পর্যবেক্ষণ করছেন' ইত্যাদি বাক্য যোগ করে দেয়া হয়েছে, কিম্বা জান্নাতের নেয়ামতের কথা বা জাহান্নামের আযাবের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে, যাতে মানুষ সংশ্লিষ্ট বিধান বাস্তবায়নের অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে। এ ছাড়াও বিভিন্ন ভাবে বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন সহজ করার জন্য মানুষের মন-মস্তিষ্ক প্রস্তুত করা হয়েছে। কোথাও সংশ্লিষ্ট বিধানে মানুষের জন্য কি কল্যাণ বা উপকারিতা নিহিত আছে তা বলা হয়েছে, আবার কোথাও তা অমান্য করার ক্ষতির দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এমনিভাবে শিক্ষাদানকালে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাকে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার্থীর মন মস্তিষ্ক প্রস্তুত করার মনস্তাত্ত্বিক নীতি ইসলাম প্রবর্তন করেছে।

৭. উপস্থাপনাকে বাস্তবমুখী করে তোলা

একথা সত্য যে, বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যহীন তত্ত্ব কিম্বা অবাস্তব দর্শন আলোচনার দ্বারা কল্পনা বিলাসই হয় মাত্র। এরূপ শিক্ষা একদিকে যেমন মনের গভীরে রেখাপাত করে না, তেমনি তা বাস্তবতা শূন্য হওয়ায় বাস্তব জীবনে প্রয়োগের চেতনাও জোগায় না। ইসলাম একদিকে শিক্ষা দ্বারা এহেন জ্ঞান-সুখ ও কল্পনা-বিলাসকে সমর্থন করে না, আবার কোন তত্ত্ব বা তথ্য বাস্তব করে বুঝতে অসামর্থতা থাকায় তা মনের গভীরে রেখাপাত না করুক তা-ও চায় না। তাই প্রত্যেকটা বিষয়কেই উপস্থাপন করার সময় ইসলাম সেটাকে বাস্তবমুখী করে তোলার চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে কুরআন হাদীছে প্রত্যেকটা তত্ত্ব ও তথ্যকে বাস্তবমুখী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি এবং নক্শা ও চিত্রাংকনের মাধ্যমেও রাসূল (সা.) অনেক তথ্য ও তত্ত্বকে বাস্তবমুখী করে তোলার চেষ্টা করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের উপমা (সূরাঃ বাকারা, ১৭-১৯ দ্র.), হক ও বাতিলের উপমা (সূরাঃ রা'দ, ১৭ দ্র.), মানব মনে ওহীর প্রতিক্রিয়া হওয়া না হওয়ার উপমা (সূরাঃ আ'রাফ, ৫৮ দ্র.), একটা নেক কাজের ছওয়াব বহুগুণে বর্ধিত হওয়ার উপমা (সূরাঃ ইব্রাহীম, ২৪ দ্র.) নির্জীব মূর্তি পূজারী-র উপমা (সূরাঃ হজ্জ, ৭৩ দ্র.), পার্থিব জীবনের উপমা (সূরাঃ কাহ্ফ, ৪৫ দ্র.) ইত্যাদি অসংখ্য উপমা বর্ণনা করেছেন, যাতে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য বাস্তব করে বোধগম্য করা সহজতর হয়।

নকশা ও চিত্রাংকনের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পর্যায়ে উল্লেখ করা যায় ইবনে মাজা শরীফে উল্লেখিত একটি হাদীছ। একদিন রাসূল (সা.) একটা লম্বা রেখা টানলেন এবং সে রেখার পাশে আরও দুটো রেখা টানলেন তারপর লম্বা রেখাটির প্রতি হাত রেখে বললেন, এটাই হল আল্লাহর পথ

(এবং পার্শ্বের রেখাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন), আর এগুলো হল শয়তানদের পথ। (সংক্ষেপিত)

৮. মাঝে মাঝে পরীক্ষা গ্রহণ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত–

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَاِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُوْنِىْ مَا هِىَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِيْ شَجَرِ الْبَوَادِيْ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوْا حَدِّثْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا هِىَ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ.

অর্থাৎ, (কোন এক সময়) রাসূল (সা.) বললেন, এমন একটি গাছ আছে, যার পাতা ঝরে পড়ে না, সেটা মুসলমানের ন্যায়। তোমরা বলত সেটা কি গাছ? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের গাছ পালা নিয়ে ভাবতে লাগল যে সেটা কী গাছ। তিনি বলেন, আমার মনে উদয় হল যে, সেটা খেজুর গাছ, কিন্তু আমি তা বলতে লজ্জা বোধ করলাম (কারণ মজলিসে তার পিতা উমর, আবূ বকর প্রমুখ মুরব্বীজন উপস্থিত ছিলেন) অতঃপর লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনিই আমাদের জানান সেটা কী গাছ? তখন নবী (সা.) বললেন, সেটা হচ্ছে খেজুর গাছ। (বোখারী : ১ম খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা)

ইমাম বোখারী (রহ.) এ হাদীছ দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাণ অনুধাবন করার নিমিত্তে মাঝে মাঝে তাদের পরীক্ষা গ্রহণের নীতি প্রমাণ করেছেন। পরীক্ষার চিন্তা থাকলে শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিয়ষ ভালভাবে বুঝতে ও মনে রাখতে এবং এর জন্য অধিক পরিশ্রম করতে উদ্বুদ্ধ হয়। পরীক্ষায় সাফল্য তার মনে আস্থা ও অধিকতর অনুপ্রেরণা যোগায়। আবার ব্যর্থতাও তার নিজের অলসতা ও অধ্যাবসায়ে অমনোযোগিতার বিরুদ্ধে তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার ফলাফল বা পরিণতির কথা জানানো হলে সে তাড়াতাড়ি ভুল শোধরাতে ও শুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। বস্তুত পরীক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ফায়দা ও উপকারিতা সর্বজন বিদিত।

৯. সময় ও শ্রেণী বণ্টন

শিক্ষাদানের জন্য সময় বণ্টন ও শিক্ষার সময় নির্ধারিত থাকলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পূর্বে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ পূর্বক যথা সময়ে শিক্ষার

আসর বা ক্লাসে উপস্থিত হতে পারে। এমনিভাবে শ্রেণী বন্টন থাকলে প্রতি শ্রেণীর ধারণ ক্ষমতা ও ধরন অনুযায়ী তাদের উপযোগী আলোচনা রাখতে শিক্ষককে বিড়ম্বনায় পড়তে হয় না, শ্রেণী বিশেষের জন্য বিশেষ ও স্বতন্ত আলোচনা করতে তার পক্ষে সুবিধা হয়। এই অধ্যায়ের ৪র্থ ধারায় উল্লেখিত হাদীছ থেকে জানা গিয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) ওয়াজের জন্য প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতকে অর্থাৎ, একটা নির্দিষ্ট সময়কে নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। বোখারী শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীছে সময় ও শ্রেণী বণ্টন সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

قَالَ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيْهِ فَوَعَظَهُنَّ.

অর্থাৎ, মহিলারা নবী কারীম (সা.)-কে বলল, পুরুষগণ আপনার কাছে আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে (ফলে আমরা আপনার ওয়াজ শোনার সুযোগই পাইনা)। তাই (আমাদেরকে নসীহত করার জন্য) আপনার নিজের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটা দিন নির্ধারিত করে দিন। তখন নবী কারীম (সা.) তাদের জন্য একটা দিন নির্ধারিত করে দিলেন। সেদিন তাদের নিকট তিনি গেলেন এবং তাদেরকে ওয়াজ করলেন। (সংক্ষেপিত, বোখারী : ১ম খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা)

এছাড়া নবী কারীম (সা.)-এর দৈনন্দিনের রুটিনের মধ্যে প্রতিদিন মাগরিবের পর থেকে ইশা পর্যন্ত সময় ছিল মহিলাদের শিক্ষা ও তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য। যে স্ত্রীর ঘরে সেই রাতের পালা থাকত, বাদ মাগরিব নবী কারীম (সা.) সেই স্ত্রীর ঘরে গমন করতেন। তখন নবী কারীম (সা.)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য মহিলারাও সেখানে হাজির হতেন। এটা ছিল মহিলাদের জন্য প্রায় প্রতিদিনকার নিয়মিত শিক্ষার আসর।

শিক্ষণ-পদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞান

শিক্ষা লাভের প্রধানত দুটি প্রক্রিয়া: (১) শিক্ষকের মাধ্যমে (২) ব্যক্তিগত অনুশীলনের মাধ্যমে। শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে কি নীতিমালা সে ব্যাপারে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের নীতিমালা সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করবে। আর ব্যক্তিগত অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কি পদ্ধতিমালা অনুসরণীয় সে সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। মনে

রাখতে হবে শিক্ষণ কত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবে তা অনেকখানি নির্ভর করবে শিক্ষণের বিষয়বস্তু ও শিক্ষণ-পদ্ধতির উপর। তাছাড়াও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত গুণাবলী যেমন বয়স, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আগ্রহ বা অনীহা ইত্যাদির উপরেও শিক্ষণের গতি নির্ভর করে। পদ্ধতিগত যে সব উপায়ে শিক্ষণ দ্রুতগতি লাভ করে সেগুলো নিম্নে বর্ণিত হল–

১. অনুশীলনের মাঝে মাঝে বিরতি গ্রহণ

অনেক ধরনের শিক্ষণে কিছু সময় অনুশীলনের পর কিছু সময় বিরতি গ্রহণ বা বিশ্রাম নিলে শিক্ষণ অগ্রগতি লাভ করে থাকে, মস্তিষ্কে সজীবতা আসে। পক্ষান্তরে বিরতিহীন একটানা অনুশীলন শিক্ষণকে বিঘ্নিত করতে পারে, শিক্ষার্থীর মনে ক্লান্তি ও অবসাদ আনতে পারে, শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকূলতা দেখা দিতে পারে। একঘেঁয়েমি কাটিয়ে মনে নতুনত্ব বা সজীবতা সৃষ্টির জন্য একটি বিষয় অনুশীলনের পর সেটি রেখে অন্য একটি বিষয় গ্রহণ অথবা কঠিন বিষয় রেখে সহজ বিষয় গ্রহণও ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ৪র্থ ধারায় বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর হাদীছ থেকে অনুশীলনের মাঝে মাঝে বিরতি গ্রহণের দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

২. পর্যায়ক্রমে অনুশীলন

যে কোন বিষয় বা শাস্ত্রের প্রাথমিক স্তর থেকে পর্যায়ক্রমে উন্নত স্তরের দিকে অগ্রসর হতে হবে। অন্যথায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী নিম্নস্তর অতিক্রম করার পূর্বেই পরবর্তী স্তরের বিষয় অধ্যয়নে লিপ্ত হলে ভুল বুঝাবুঝি এবং জ্ঞান বিভ্রাট ঘটতে পারে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ৩নং ধারায় এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই মনস্তাত্ত্বিক নীতির আলোকেই সুফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন, আধ্যাত্মিক লাইনের প্রাথমিক স্তরের যাত্রীর পক্ষে এই শাস্ত্রের সর্বোচ্চ স্তরের কিতাবাদি অধ্যয়ন করা সমীচীন নয়।

৩. শিক্ষণীয় বিষয়কে কয়েক ভাগে ভাগ করে নেয়া

অনুশীলনের মাঝে মাঝে বিরতি গ্রহণ ও পর্যায়ক্রমে অনুশীলনের সুবিধার্থে শিক্ষণীয় বিষয়কে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। গ্রন্থের অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদের বিভক্তি এই নীতি অনুসারেই করা হয়ে থাকে। এছাড়াও শিক্ষার্থী তার শিক্ষার সুবিধা মত বিভিন্ন ভাবে শিক্ষণীয় বিষয়কে ভাগ, পর্যায় ও শ্রেণীভুক্ত করে নিতে পারে।

৪. আবৃত্তি ও শব্দ সহকারে পড়া

এরূপ পড়ার সুফল অনেক বেশী। কেননা এতে অন্য কোন শব্দের দিকে মনোযোগ (Attention) বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় না। আর মনোযোগ শিক্ষণের এক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। বাস্তব অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায় একই বিষয়বস্তু একজন শুধু মনে মনে পড়ে আর একজন আবৃত্তি ও শব্দ সহকারে পড়ে এই দু'জনের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তির শিক্ষণ দ্রুত হয়। কুরআনে কারীমে পাঠের ব্যাপারে যে বলা হয়েছে فَاقْرَءُوْا অর্থাৎ, তুমি কিরাত কর বা পাঠ কর; এই কিরাত বা পাঠের সংজ্ঞায় অনেকে বলেছেন-অন্ততঃ এতটুকু শব্দ সহ উচ্চারণ করতে হবে যা নিজের শ্রুতিগোচর হয়। অন্যথায় শুধু মনে মনে পড়া বা শব্দহীন উচ্চারণ 'পাঠ'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। নামাযে কুরআন পাঠের ব্যাপারেও তাদের এই অভিমত যে, সির্রী নামাযেও তিলাওয়াতের শব্দগুলো নিজের শ্রুতিগোচর হতে হবে। ফিকাহ ও ফতোয়ার কিতাবে এই অভিমতকেই অধিকতর সহীহ বলা হয়েছে।

একই কারণে একটা বিষয়কে একাধিকবার আবৃত্তি করে পড়ার ব্যাপারটা গুরুত্ববহ, কেননা একবার আবৃত্তির শব্দ মনের উপর রেখাপাত নাও করতে পারে। একটি উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তি (Repetition) অনেক সময় মনোযোগ আকর্ষণের কারণ হতে পারে। এ জন্যেই বন্দুকের একটি মাত্র আওয়াজ আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি না, পর পর অনেকগুলো আওয়াজ হলে আমরা লক্ষ্য না করে পারি না।

৫. অর্থ বুঝে পড়া

শিক্ষণকে কার্যকরী ও স্মৃতিতে ধারণযোগ্য করতে হলে প্রত্যেকটি বিষয়বস্তু সম্যক অর্থ বা তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে পড়তে হবে। ভাসাভাসা বা অস্পষ্ট শিক্ষণ বিস্মৃতির কারণ হয়ে থাকে। কারণ ঝাপসা তথ্য দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ভান্ডারে প্রক্রিয়াজাত হতে পারে না, ফলে খুব অল্প সময়েই তা স্মৃতি ভান্ডার থেকে মুছে যায়। বোখারী শরীফে ইবনে আবী মুলায়কা থেকে বর্ণিত আছে-তিনি বলেন,

اِنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَّاتَعْرِفُهٗ اِلَّا رَاجَعَتْ فِيْهِ حَتّٰى تَعْرِفَهٗ.

অর্থাৎ, নবী (সা.)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) কোন বিষয়বস্তু শোনার পর না বুঝলে জিজ্ঞেস করে তা বুঝে নিতেন। (সংক্ষেপিত) [বোখারী : ১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা]

ইমাম বোখারী (রহ.) এ হাদীছ থেকে প্রমাণ করেছেন যে, জ্ঞানার্জনের জন্য প্রত্যেকটা বিষয় ভালভাবে বুঝে নেয়া শর্ত, এমনকি প্রয়োজনে শিক্ষককে বার বার জিজ্ঞেস করে হলেও।

আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি যে, অর্থহীন এক গুচ্ছ শব্দ মুখস্থ করার চেয়ে অর্থপূর্ণ একটি বাক্য মুখস্থ করা অনেক সহজ।

স্মৃতি ও বিস্মৃতি
(Memory and Forgetfulness)

স্মৃতি ও বিস্মৃতির সংজ্ঞা সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানের বক্তব্য অত্যন্ত দুর্বোধ্য ও পরস্পর বিরোধী। তবে সাধারণভাবে আমরা স্মৃতি বলতে বুঝি তথ্য বা সংবাদকে সঞ্চয় করে রাখার ক্ষমতা বা সঞ্চিত তথ্য মনে থাকা ও স্মরণ করতে পারা। আর বিস্মৃতি বলতে বুঝি এর বিপরীত-স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়া, ভুলে যাওয়া বা স্মরণ করতে না পারা। এই স্মৃতি ও বিস্মৃতির কারণ বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন এটাই বাস্তব যে, আমরা যা কিছু শিক্ষা করি তার সবটুকুই মনে রাখতে পারি না-অনেকটা দীর্ঘদিন যাবত আমাদের মনে থাকে, আবার অনেকটা ক্ষণস্থায়ী হয়। কিছু আমরা স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারি আর কিছু পরি না– এটাই বাস্তব। এই স্মৃতি ও বিস্মৃতির কারণ বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্বলিত যে সব তথ্য এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়েছে তা সবই স্নায়ুতত্ত্ববিদ বা স্নায়ুশল্যবিশারদদের পরীক্ষা প্রসূত এবং যা এখনও চূড়ান্ত নয়। শিক্ষার্থীর জন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা জানার প্রয়োজনীয়তাও শূন্যের পর্যায়ে। বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় বিষয় স্মৃতিতে সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে অবগতি লাভের ব্যাপারটাই মুখ্য। এখন এ সম্পর্কেই আমরা আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

শিক্ষণীয় বিষয় স্মৃতিতে সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের উপায়

১। পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা (Repetition and Review)

শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু স্মৃতিতে সংরক্ষণের একটি উপায় হল পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা। একই বিষয়বস্তু বার বার পাঠ ও পরস্পর আলোচনা করলে স্মৃতি সক্রিয় হতে থাকে এবং তথ্যগুলো দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ভান্ডারে প্রক্রিয়াজাত হয়ে যায়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একাধিক স্থানে পুনরাবৃত্তি করেছেন। সাহাবী আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন,

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَالَ سِتِّيْنَ رَجُلًا فَيُحَدِّثُنَا الْحَدِيْثَ ثُمَّ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهٖ فَنُرَاجِعُهٗ بَيْنَنَا هٰذَا ثُمَّ هٰذَا، فَنَقُوْمُ كَاَنَّمَا زُرِعَ فِيْ قُلُوْبِنَا. (مجمع الزوائد ج : ١ ص : ١٦١)

অর্থাৎ, আমরা নবী (সা.)-এর নিকট বসতাম, তিনি আমাদের নিকট হাদীছ বয়ান করতেন। তিনি যখন তাঁর প্রয়োজনে (মজলিস থেকে উঠে যেতেন আমরা শ্রুত হাদীছগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। তারপর যখন আমরা বৈঠক থেকে উঠে যেতাম, তখন আমাদের অন্তরে সব কিছু গেথে যেত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই সম্ভবত তিনি বলেছিলেন, অন্তত ষাটজন লোক উপস্থিত থাকত। (মাজমাউয যাওয়াইদ : ১ম খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা)

অনেক সময় মনোযোগিতার স্বল্পতা, স্মৃতির গ্রহণ ক্ষমতার মন্থরগতি ইত্যাদি কারণে একবার শ্রবণ বা পঠনের ফলে বিষয়বস্তু অস্পষ্ট বা অবোধগম্য থেকে যেতে পারে, এরূপ অস্পষ্ট তথ্য স্মৃতি ভান্ডারে সংরক্ষিত হয় না। এক্ষেত্রে বার বার পুনরাবৃত্তি বা পর্যালোচনা কিম্বা বার বার শ্রবণই স্মৃতিতে সংরক্ষণের আনুকূল্য সৃষ্টি করে। রাসূল (সা.)ও তাই শিক্ষাদানকালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনবার বলতেন। সাহাবী আনাস (রা.) বলেন,

اَنَّهٗ (النبي) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ. (بخارى ج-١ ص : ٢٠)

অর্থাৎ, তিনি (নবী [সা.]) যখন কোন (গুরুত্বপূর্ণ) কথা বলতেন, তিনবার সেটার পুনরাবৃত্তি করতেন। (সংক্ষেপিত) যাতে তার কথা সবাই বুঝতে পারেন। (বোখারী: ১ম খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা)

শিক্ষণীয় বিষয় অন্যকে শিক্ষা দিলেও এ উপকারিতা লাভ হয়ে থাকে। এভাবে শিক্ষণীয় বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা হয় বিধায় এ পদ্ধতিটিও স্মৃতিতে শিক্ষণীয় বিষয় সংরক্ষিত ও সুদৃঢ় হওয়ার অনুকূল। বস্তুতঃ শিক্ষার্থী যতই শিক্ষা অর্জন করুক শিক্ষণীয় বিষয়টি তার স্মৃতিতে সংরক্ষিত ও সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত সেটি তার জ্ঞানের তালিকায় কোন

সংযোজন ও বৃদ্ধি বলে গণ্য হবে না। অতএব বলা যায়-শিক্ষণীয় বিষয় অন্যকে শিক্ষাদানে নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। হাদীছে আছে–

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَاذَا يَزِيْدُ فِى الْعِلْمِ؟ قَالَ التَّعْلِيْمُ.

অর্থাৎ, নবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে কিরূপে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, অন্যকে শিক্ষাদান করলে।

অন্যের সাথে পর্যালোচনা ও পুনরাবৃত্তি সম্ভব না হলেও অন্তত বিষয়বস্তু শিক্ষা শেষে মনে মনে পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করে নিতে হবে। মনে মনে বিষয়বস্তুকে আবার ঝালিয়ে নিতে হবে।

২। মুখস্থ করা (Memorization)

শুধু শ্রবণ, অধ্যয়ন ও স্মৃতিশক্তিই শিক্ষণীয় বিষয়কে দীর্ঘদিন স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। মানুষের স্মৃতি ভান্ডারে তিনটি স্তর রয়েছে। (ক) সংবেদী স্মৃতি ভান্ডার (Sensory memory), যেখানে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় পথ দিয়ে কোন তথ্য অনুপ্রবেশ করে। এখানে তথ্যসমূহের অবস্থান খুবই স্বল্পস্থায়ী এমনকি এক সেকেন্ডের এক ভগ্নাংশ সময় স্থায়ী হতে পারে। এজন্য এ স্তরে একই সাথে ৪/৫ টি তথ্যও উপস্থিত হতে পারে। (খ) স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি ভান্ডার (Short Term memory), এখানে সংবেদী স্তর থেকে বাছাইকৃত তথ্য এনে (গ) দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ভান্ডারে (Long Term memory) তা সংরক্ষণার্থে প্রেরণের জন্য প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এই প্রক্রিয়াজাত করণ কালে শিক্ষণীয় বিষয়টিতে বার বার পুনরাবৃত্তি, সামগ্রিকভাবে আয়ত্তকরণ ও গভীর মনোযোগ প্রদান করা হলে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ভান্ডারে তা সুদৃঢ়ভাবে প্রক্রিয়াজাতকৃত হয়ে যায়। এই গভীর মনোযোগ সহ বার বার পুনরাবৃত্তি ও সামগ্রিক আয়ত্তকরণের নামই হল মুখস্থ করা।

তদানিন্তন আরবদের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এতদসত্ত্বেও হাদীছকে স্মৃতিতে সংরক্ষণের জন্য সাহাবীগণ শুধু শ্রবণ ও স্মরণ শক্তিকে যথেষ্ট মনে করেননি বরং তারা হাদীছ মুখস্থ করে রাখতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الحَدِيْثَ وَالْحَدِيْثُ

অর্থাৎ, আমরা হাদীছ মুখস্থ করতাম, আর রাসূল (সা.) থেকে হাদীছ মুখস্থ

يُحْفَظُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

করারই বিষয়। অর্থাৎ, এ ভাবেই হাদীছ সংরক্ষণ করা হত। (মুকাদ্দাম-ায়ে মুসলিম)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীছ মুখস্থ করে রাখতেন এ বিষয়টি পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। আব্দুল কায়ছ গোত্রের প্রতিনিধি দলকে রাসূল (সা.) প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষাদানের পর নির্দেশ দেন যে, اِحْفَظُوْهُ وَاخْبِرُوْهُ مَنْ وَرَائَكُمْ- তোমরা এটা মুখস্থ কর। অতঃপর অন্যদের কাছে পৌঁছে দাও। (বোখারী : ১ম খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা)

বলা বাহুল্য-রাসূল (সা.) অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজনীয় কোন কথাই বলতেন না। সুতরাং তাদেরকে মুখস্থ করার নির্দেশটিও অর্থহীন নয়।

৩. সংগঠন পদ্ধতি গ্রহণ

সংগঠন পদ্ধতি (Organization Method) অর্থ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে বিভিন্নভাবে সংগঠিত করে নেয়া, যেমন সংকেতবদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ বা সংখ্যাবদ্ধ করা অথবা এলোমেলো তথ্যগুলোকে নির্দিষ্ট কতকগুলো ছত্রের অন্তর্গত করে সাজানো। এ ধরনের সংগঠন ও বিন্যাসের ফলে শিক্ষণ দ্রুততর হয়, মুখস্থ করা সহজ হয় এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু স্মৃতি ভান্ডারে সুসংবদ্ধভাবে সংরক্ষিত হয়। ফলে প্রয়োজনের সময় স্থায়ী স্মৃতি ভান্ডার থেকে তথ্যগুলো আহ্বান করলে পূর্ব বিন্যাস অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে একের পর এক তথ্যগুলো আসতে থাকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে একই বিষয়বস্তুকে একজন শিক্ষার্থী এলোমেলোভাবে স্মৃতিবদ্ধ করেছে আরেকজন সংগঠন পদ্ধতিতে তা করেছে, এই শেষোক্ত শিক্ষার্থীই সে বিষয়টি অধিকতর সংরক্ষণ করতে পেরেছে। উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলো খনিজ পদার্থের নাম এলোমেলোভাবে মুখস্থ করার চেয়ে এগুলোকে ধাতু ও পাথর এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, আবার ধাতুগুলোকে বিরল ও সাধারণ এবং পাথরগুলোকে মূল্যবান ও গৃহ সামগ্রী এই দুই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কিংবা কোন মনীষীর জীবনের অবদানগুলো এলোমেলো স্মরণ রাখার চেয়ে অবদানের ক্ষেত্রগুলোকে পৃথক পৃথক করে প্রতি ক্ষেত্রে কয়টা অবদান তা সংখ্যাবদ্ধ করে নেয়া যায়।

স্মৃতি সংরক্ষণের সুবিধার্থে হাদীছেও বহু বিষয়কে সংখ্যাবদ্ধ করে বলা হয়েছে। ঈমানের সাতাত্তর শাখা, ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদ, তিন শ্রেণীর লোকের আমলের প্রতিদান দ্বিগুণ হবে, তিন শ্রেণীর লোক কিয়ামতের দিন

আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বেশী ক্রোধভাজন হবে প্রভৃতি অসংখ্য সংখ্যাবদ্ধ তথ্য তার প্রমাণ।

সংকেতবদ্ধ করার পর্যায়ে যেমন UN, UNICEF, USA, KSA ইত্যাদি দীর্ঘ নামকে সংক্ষেপে সংকেতবদ্ধ করে মনে রাখা হয়। ফেকাহ শাস্ত্রের কুঁয়া সম্পর্কিত একটি মতভেদ পূর্ণ মাসআলাকে সংক্ষেপে مَسْئَلَةُ الْبِئْرِ جحط এবং হাত উঠানোর অনেকগুলো ক্ষেত্রকে সংক্ষেপে فقعس صمعج দ্বারা সংকেতবদ্ধ করা হয়েছে। আরবীতে যারা ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন তাদের কাছে বিষয়টি সুবিদিত। এরূপ আরও বহু উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। শিক্ষণীয় বিষয় অধ্যয়ন ও শ্রবণ শেষে সেগুলোর সারসংক্ষেপ ও নির্যাস বের করে নিলেও এক ধরনের সংগঠন হয়ে থাকে।

৪. সংযোজন-পদ্ধতি গ্রহণ

সংযোজন পদ্ধতি (Connecting Method) বলতে বোঝানো হচ্ছে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে অন্য কোন জ্ঞাত ও স্মৃতিবদ্ধ বিষয়ের সাথে সংযোগ বা সম্পর্ক স্থাপন করে সেগুলোর সাথে একে সংযোজিত ও শৃংখলিত করে রাখা। যেমন-অপরিচিত কোন লোকের নাম স্মরণ রাখার সুবিধার্থে ঐ নামে নিজের কোন একান্ত পরিচিত ও জ্ঞাত ব্যক্তি থাকলে তার নামের সাথে এই নামটি সংযোজিত করে রাখলে পরবর্তীতে স্মরণ করতে সুবিধা হয়ে থাকে। উপমা ও উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে কোন বিষয়কে স্মৃতিবদ্ধ করা হলেও এ উপকারিতা লাভ হয়ে থাকে। এটিও সংযোজন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে বহু কঠিন এবং দুর্বোধ্য বিষয়ও যেমন বুঝতে সুবিধে হয়, তেমনি স্মৃতিতে সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও তা খুবই ফলদায়ক।

তৃতীয় অধ্যায়

দাওয়াত মনোবিজ্ঞান
(Da'wat Psychology)

দ্বীনী দাওয়াতের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান

কুরআন ও হাদীছের বিভিন্ন স্থানে দাওয়াত সম্পর্কিত যে সকল নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করলে মৌলিকভাবে তিনটি মূলনীতি পাওয়া যায়। যথা :

(এক) ব্যক্তি নির্বাচন

ইসলাম ধর্ম কোন দেশ, কোন অঞ্চল বা কোন গোষ্ঠি বিশেষের জন্য প্রেরিত হয়নি। বরং ইসলাম সারা বিশ্বের সকল যুগের সকল মানুষের ধর্ম। এজন্য দাওয়াত ও তাবলীগকে ফরয করে দেয়া হয়েছে, যেন সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে যায়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ.

অর্থাৎ, হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর, অন্যথায় তুমি তোমার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলে না। (সূরা মায়িদা : ৬৭)

তবে এই প্রচার বা আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত নিছক যেনতেন ভাবে করাটাই আল্লাহর কাম্য নয় রবং ইস্‌লাহ ও হিদায়াতই দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য। আর এটা নির্ভর করছে দাওয়াতের সৌন্দর্যের উপর অর্থাৎ, দাওয়াতের বিষয়বস্তু ও তার উপস্থাপনা পদ্ধতি এমন হওয়া-যাতে শ্রোতা দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তার মনঃপুত হওয়ায় দাওয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয়াবলীকে সে মানতে উদ্বুদ্ধ হয়। অতএব দাওয়াত কার্য পরিচালনার জন্য প্রথমতঃ শ্রোতাদের শ্রেণী নির্ধারণ করে নিতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে সে প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

১. যোগ্যতা অনুসারে শ্রোতাদের শ্রেণী নির্ধারণ

বলা বাহুল্য-শ্রোতা বিভিন্ন যোগ্যতার বিভিন্ন মন মেজাযের এবং বিভিন্ন ধারণ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে। অতএব শ্রোতা ব্যক্তিটির ভিত্তিতেই দাওয়াতের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। শ্রোতা যদি তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী হন, যদি তিনি অন্তরালোক সম্পন্ন জ্ঞানী ও সুধী শ্রেণীর লোক হন, তাহলে তার মধ্যে জ্ঞানের সত্যিকার পিপাসা ও প্রতিটি কথার দলীল প্রমাণ অনুসন্ধানের মনোবৃত্তি থাকবে। এ ধরনের শ্রোতার সামনে আলোচনা গুঢ়তত্ত্ব ও দলীল প্রমাণ সহকারে হওয়ার প্রয়োজন হবে। আর যদি শ্রোতা সরল গোছের হন, নিরীহ এবং সুশীল শ্রেণীর শান্তি প্রিয় লোক হন, তাহলে তাদেরকে দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে সহজ সরল ভাষায় উপদেশমূলক কথাবার্তাই যথেষ্ট হবে। আর যদি শ্রোতা বক্র প্রকৃতির বা বিকৃত মানসিকতার কিংবা বিতর্ক ও কলহ প্রিয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন, তাহলে তাকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে তার সাথে তর্ক-বিতর্কের আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে থাকবে। কুরআনে কারীমে দাওয়াত সম্পর্কিত আয়াতে এই ত্রিবিধ পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ.

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক কর সদ্ভাবে। (সূরা নাহ্ল : ১২৫)

অত্র আয়াতে ত্রিবিধ পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা হিকমত[১], সদুপদেশ ও সদ্ভাবে তর্ক-বিতর্ক। এই পদ্ধতিত্রয় উল্লেখিত তিন শ্রেণীর লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রযোজ্য হবে। মনস্তাত্ত্বিকভাবে ব্যক্তি নির্বাচন পূর্বক সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে হবে। একজনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিটি বাঞ্ছনীয় অন্য পদ্ধতিটি তার ক্ষেত্রে শুধু অকার্যকরীই নয় বরং হিতে বিপরীতও ঘটাতে পারে। যেমন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোকদেরকে তৃপ্ত করতে কিম্বা দাওয়াতকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে চিন্তা গবেষণামূলক যুক্তি ও পাণ্ডিত্বমূলক আলোচনা

---

১. 'হিকমত' শব্দটি আরবী অভিধানে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যথাঃ সত্যে উপনীত হওয়া, ন্যায় ও সুবিচার, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, গুঢ়তত্ত্ব ইত্যাদি।

দ্বারাই সম্ভব হবে, এক্ষেত্রে সাদামাটা আলোচনা তাদের সামনে কোন আবেদন সৃষ্টি করবে না। আবার তর্ক-বিতর্কও তাদের নিকট বিড়ম্বনাকর ও অপাংক্তেয় অনুভূত হবে। তেমনিভাবে তর্ক-বিতর্ক ও কথা কাটাকাটির রোগ জীবাণুতে যারা ভরা, বাস্তব ও প্রাকৃতিক কোন যুক্তি বা দলীলকে তারা সহ্য করেন না। তাদেরকে একমাত্র তাদেরই স্বীকৃত কোন বিষয় থেকে একটা দমনমূলক উত্তর দ্বারা কোন বিষয় গ্রহণ করানো যেতে পারে। আর স্থূল বুদ্ধির ও শান্তি প্রিয় লোক যারা, তারা কোন কুটতর্ক পছন্দ করেন না। কিম্বা গুঢ়তত্ত্বমূলক আলোচনা বা যুক্তিও তাদের ধারণ ক্ষমতার বাইরে, এ শ্রেণীর লোকদের জন্য সহজ সরল ভাষায় ও সাদা মাটা গোছের উপদেশই সব থেকে বেশি কার্যকরী। মনস্তাত্ত্বিকভাবেই এই তিন শ্রেণীর লোকদের জন্য এই তিনটি পদ্ধতির কার্যকারিতা ও অপরিহ-ার্যতা স্বীকৃত।

২. বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনা পদ্ধতির বিভিন্নতা

দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের পদ্ধতি হোক বা উপদেশের পদ্ধতি হোক কিম্বা তর্ক-বিতর্কের পদ্ধতি হোক সর্বক্ষেত্রেই এমন উপস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে জড়তা, অসংলগ্নতা কিংবা শ্রোতার পরিভাষার সাথে বৈপরিত্য না থাকে, অন্যথায় সে বাক্য বা উপস্থাপনা বোধগম্য না হওয়ার ফলে দাওয়াতই ব্যর্থ হবে। এই কারণে হাদীছে এ জাতীয় বাক্য ব্যবহারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। বর্ণিত হয়েছে,

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الْاُغْلُوْطَاتِ. (مشكاة)

অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জটিল ও ভ্রমোদ্দীপক (ধাঁধাঁ জাতীয়) বাক্য ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (মেশকাত)

কুরআনে কারীমে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ.

অর্থাৎ, আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য। (১৬ : [নাহ্ল] ৪৪)

৩. ধারণ ক্ষমতা অনুসারে বিষয়বস্তু নির্বাচন ও উপস্থাপন

বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে শ্রোতার ধারণ ক্ষমতাও লক্ষণীয়, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জন্য যে দার্শনিক ও তত্ত্বমূলক আলোচনা চলবে, সাধারণ

লোকদের ক্ষেত্রে তা পরিহার করে চলতে হবে। অন্যথায় ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ায় তাদের পক্ষে দাওয়াতের বিষয়বস্তু আয়ত্ত্ব করা সম্ভব হবে না। অধিকন্তু বিভ্রাট দেখা দিতে পারে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, যখন তুমি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন কোন হাদীছ বর্ণনা করবে, যা তাদের জ্ঞানের অগম্য, তখন তা তাদের কারো কারো পক্ষে ফিৎনা হয়ে দাঁড়াবে। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম)

মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায় বক্তব্য যখন শ্রোতার ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, তখন শ্রোতা নিজের মধ্যে এক রকম অপূর্ণতা বা ত্রুটি অনুভব করে, কিম্বা বক্তব্য যখন শ্রোতার আবেগ অনুভূতি ও কামনার বিপরীত হয় তখন প্রেষণা[১] পরিতৃপ্তির পথে অন্তরায় হওয়ায় বক্তব্যের প্রতি আকর্ষণের পরিবর্তে সে বিকর্ষণ অনুভব করে এবং তার মধ্যে একটা দ্বন্দ্বমূলক অনুভূ-তির সৃষ্টি হয় আর এই সব অনুভূতি মানুষের জীবনে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা আনয়ন করে।

৪. বাগ্মিতা ও অলংকারের প্রয়োজনীয়তা

শ্রোতার কাছে বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করার আর একটি উপকরণ হল ভাষায় বাগ্মিতা ও অলংকার। বাকপটুতা ও অলংকারের সজ্জা বক্তব্যের মাঝে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে, আর এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে। মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায় উদ্দীপকের স্বাতন্ত্র বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য মনোযোগ আকর্ষণের একটি উল্লেখযোগ্য শর্ত। কোন উদ্দীপকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলে তা উদ্দীপকটিকে অন্যান্য উদ্দীপক থেকে আলাদা করে ফেলে, এর ফলে তা সহজে মনোযে-াগ কেড়ে নেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-সাধারণ বেশভূষায় সজ্জিত একদল ছাত্রের মধ্যে বিশেষ ধরনের পোষাক পরিহিত একজন ছাত্র সহজেই অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। ঠিক অনুরূপভাবে অলংকারও ভাষার একটি বহিঃরঙ্গ ও অন্তঃরঙ্গ ভূষণ যা ভাষাকে বিশেষভাবে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে শ্রোতার মনোযোগকে আকর্ষণ করে থাকে। তদুপরি স্থান-কাল-পাত্র বুঝে যথাযথ শব্দ প্রয়োগ (যা অলংকারের একটি অপরিহ-ার্য অংশ) ভাষার মধ্যে অসাধারণ ক্ষমতা সৃষ্টি করে থাকে।

---

১ .শব্দটি মনোবিজ্ঞানের একটি পরিভাষা। প্রেষণা (Motive) বলতে বোঝায় মানুষ ও প্রাণীর এমন একটি অবস্থা যা তাদেরকে কাজে প্রবৃত্ত করায়। কামনা-বাসনা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, ইচ্ছা, অভিলাস, প্রয়োজন সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

একটি শব্দ অস্বাভাবিক কিছুও ঘটিয়ে দিতে পারে। ধরা যাক একজন ডাক্তার ঠিকমত পরীক্ষা না করে, না ভেবে চিন্তে একজন রোগীকে বলে দিল 'তোমার যক্ষ্মা হয়েছে', এতে করে হতে পারে কিছুদিন বাদে রোগীর অবস্থা সত্যিই আশংকাজনক হয়ে দাঁড়াবে। আবার এর বিপরীত কোন মারাত্মক রোগীকেও শান্ত্বনামূলক কথা দ্বারা তার অবস্থার উন্নতি ঘটানো যেতে পারে এবং এসবই হয়ে থাকে মনস্তাত্ত্বিক কারণে। এতে করে বোঝা গেল-একটি শব্দ খুব ভাল প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করতে পারে আবার তার বিপরীতও করতে পারে। ভাষার এই অসাধারণ ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا অর্থাৎ, নিশ্চয় কতক বর্ণনা যাদু স্বরূপ। (মিশকাত)

অতএব ভাষার অলংকার ও বাগ্মিতার দ্বারা মনস্তাত্ত্বিক আনুকূল্য সৃষ্টির বিষয়টি সহজেই অনুমেয়। এ কারণেই হযরত মূসা (আ.) যখন দাওয়াত পরম্পরায় তাঁর ভ্রাতা হযরত হারূন (আ.) কে সাথে রাখার দরখাস্ত করেছিলেন, তখন তার কারণ স্বরূপ উল্লেখ করেছিলেন যে, সে আমার থেকে অধিক বাকপটু ও বাগ্মি। এ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতটি নিম্নরূপ-

وَ اَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِىْٓ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ.

অর্থাৎ, ভ্রাতা হারূন, সে আমার চেয়ে বাগ্মী; অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ কর-সে আমাকে সাহায্য করবে। আমি আশংকা করছি তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (সূরা কাসাস : ৩৪)

(দুই) মিজায নির্বাচন

দাওয়াতকে কার্যকরী এবং শ্রোতার মনে প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলতে হলে তার মন মেজাযের প্রতিও লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। দাওয়াত সম্পর্কে পূর্বোল্লেখিত মৌলিক আয়াতটিতেও মৌলিকভাবে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে-যেখানে তিন ধরনের শ্রোতার ক্ষেত্রে তিন ধরনের পদক্ষেপের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত কুরআন ও হাদীছের বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত তথ্যসমূহকে একত্রিত করলে নিম্নোক্ত নীতিমালা

প্রতীয়মান হয়।

১. দাওয়াতের সময় শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করা

দাওয়াতের বিষয়বস্তুর প্রতি যেন মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং কোন ভাবেই যেন দাওয়াতী বিষয়বস্তুর প্রতি তার মনোযোগ নষ্ট না হয় কিংবা বিকর্ষণ সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার যে সব শর্ত রয়েছে তা দুই প্রকার। (১) আভ্যন্তরীণ (২) বাহ্যিক।

আভ্যন্তরীণ শর্ত বলতে বোঝায়-ব্যক্তির ইচ্ছা, আগ্রহ, প্রেষণা ও অনুরাগ সৃষ্টি হওয়া। দাওয়াতী বিষয়বস্তুর ব্যাপারে যেন শ্রোতার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সে যেন সেটাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়-এমন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই ইচ্ছা, অনুরাগ ও প্রস্তুতি এমন এক বিষয় যা সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে। যে সমস্ত জিনিস আমরা দেখতে বা শুনতে আগ্রহী কিংবা যে সমস্ত জিনিস আমরা দেখতে বা শুনতে প্রস্তুত থাকি, সেগুলো আমরা খুব সহজে দেখতে বা শুনতে পাই। এ সম্বন্ধে একজন চিকিৎসক ও তার পত্নীর একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় রোগীর টেলিফোন এলে ডাক্তার তা খুব সহজেই শুনতে পান কিন্তু ডাক্তার পত্নীর তাতে নিদ্রার কোনই ব্যাঘাত হয় না। আবার ডাক্তার পত্নীর শিশু সন্তানটি কেঁদে উঠলে পত্নী সহজেই জেগে উঠেন অথচ এতে তার ডাক্তার স্বামীর নিদ্রার কোনই অসুবিধা হয় না। এর কারণ হল রোগীর ব্যাপারে ডাক্তারের যে আগ্রহ থাকে, শিশুর ব্যাপারে তার সে আগ্রহ থাকে না। আর তার পত্নীর অবস্থা এর বিপরীত।

কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ তখনই জন্মায় কিম্বা কোন বিষয়ের জন্য কোন ব্যক্তি প্রস্তুতি তখনই গ্রহণ করে যখন সে ক্ষেত্রে সে তার লাভ রয়েছে জানতে পারে। অতএব দাওয়াতী বিষয়বস্তুর প্রতি শ্রোতার আগ্রহ এবং তার জন্য মনের প্রস্তুতি তখনই হবে যখন তার মধ্যে সে তার লাভ অনুভব করবে। এই আগ্রহ এবং প্রস্তুতি সৃষ্টির জন্য এবং শ্রোতা যেন বুঝতে পারে যে, দাওয়াতী বিষয়বস্তুর মধ্যে তার লাভ রয়েছে-এজন্য নিম্নোক্ত নীতি গ্রহণ করতে হবে।

২. শ্রোতাবৃন্দের প্রতি কল্যাণকামিতা ও হিতৈষণা প্রকাশ

এজন্য দায়ীকে দাওয়াতের সময় দাওয়াতের বিষয়বস্তু দ্বারা শ্রোতার কল্যাণ হবে এমন ভাব প্রকাশ করতে হবে, কথার দ্বারা যেমন আচরণের

[illegible] সাধারণত দাওয়াতের সময় বলতেন,

يَـاَيُّـهَا النَّاسُ قُـوْلُوْا لَاۤاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُـفْلِحُوْنَ.

অর্থাৎ, হে লোকসকল! তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বল-তোমাদের কল্যাণ হবে, তোমরা কামিয়াব হবে।

সন্তানের প্রতি পিতার যেমন বাৎসল্য ও কল্যাণকামিতা, দাওয়াতের ক্ষেত্রে দায়ীকেও শ্রোতার প্রতি তেমন কল্যাণকামিতা প্রদর্শন করতে হবে। রাসূল (সা.) নিজের প্রসঙ্গে বলেছেন,

اُعَلِّـمُكُمْ كَمَا يُعَلِّـمُ اٰبَائُـكُمْ.

অর্থাৎ, তোমাদের পিতারা যেমন তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়, আমিও তোমাদেরকে অনুরূপভাবে শিক্ষা দেই।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) করুণার এমন মূর্ত প্রতীক ছিলেন যে, যারা তার দাওয়াত ও হিদায়াত গ্রহণ করত না তাদের জন্য চিন্তায়, দুঃখে তিনি ভেঙ্গে পড়তেন, ভীষণ ভাবে তিনি মর্মাহত হয়ে পড়তেন। বলা বাহুল্য-অস্বাভাবিক হিত কামনা থেকেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে,

لَعَلَّكَ بَـاخِعٌ نَّـفْسَكَ اَنْ لَّاَيَكُوْنُـوْا مُؤْمِـنِـيْنَ.

অর্থাৎ, তারা ঈমান আনে না বলে তুমি যেন মনোঃকষ্টে আত্মঘাতী হয়ে পড়বে। (সূরা শু'আরা : ৩)

দায়ীর এই করুণা মনস্তাত্ত্বিকভাবে শ্রোতার মনে নিদারুণ প্রভাব ফেলে থাকে। ফলে দাওয়াতী বিষয়বস্তুর মধ্যে তার কল্যাণ রয়েছে ভেবে সে তার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

মাদঊ বা শ্রোতার প্রতি হিতৈষণা, কল্যাণকামিতা, নম্রতা ও কমনীয়তার বহিঃপ্রকাশ এবং কঠোরতা ও রুক্ষতা পরিহার দায়ীর জন্য অন্যতম শর্ত। ফকীহ আবুল লায়ছ দায়ীর জন্য পাঁচটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে এগুলো অন্যতম। তাঁর উল্লেখিত পাঁচটি শর্ত এই- (১) দাওয়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জন। (২) আল্লাহর দ্বীন বুলন্দ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দাওয়াত প্রদান। (৩) মাদঊর প্রতি কল্যাণকামিতা ও নম্রতা থাকা-কঠোরতা বা রুক্ষতা নয়। (৪) ধৈর্য ও সহনশীলতা। (৫) দাওয়াতের বিষয়ে নিজে আমল করা। (তামবীহুল

গাফিলীন : ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা)

৩. শ্রোতার প্রতি নম্রতা ও কমনীয়তা

নম্রতা ও কমনীয়তা দায়ীর এমন একটি গুণ যা শ্রোতার হৃদয়কে তার প্রতি সহজে আকর্ষণ করতে পারে। পক্ষান্তরে কর্কশ আওয়াজ, ধারালো ভাষা ও রুক্ষ স্বভাব শ্রোতার মনকে আহত করে। ফলে শ্রোতা শুধু এরূপ দাওয়াতদানকারী থেকে দূরেই সরে যায় না, তার প্রতি রীতিমত বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। এজন্যই রাসূল (সা.)-এর প্রতি কোমল হৃদয় হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছ। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। (সূরা আলে-ইমরান : ১৫৯)

দায়ীর নম্রতা ও কমনীয়তা একজন উদ্ধত অহংকারীর শীরকেও তার দাওয়াতের সম্মুখে নত করাতে পারে। অবশ্য যদি হিদায়াত শ্রোতার তকদীরে না থাকে তবে স্বতন্ত্র কথা। তাই ফিরাউনের ন্যায় উদ্ধত অহংকারীকে দাওয়াত দেয়ার সময় হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)-কে নম্র কথা বলার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। এ সম্পর্কিত কুরআনে কারীমের বর্ণনা নিম্নরূপ:

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى.

অর্থাৎ, তোমরা দুজনে ফিরাউনের নিকট যাও, সে সীমালংঘন করেছে। তারপর তার সাথে নম্র কথা বল, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় করবে। (সূরা ত্বাহা : ৪৩-৪৪)

এ আয়াতের তাফসীরে মুফতী মুহা. শফী সাহেব (রহ.) "নবী সুলভ দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি" শিরোনামে বলেছেন, এতে বলা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তা ধারার বাহক হোক না কেন তার সাথে সংস্কার ও পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব পালনকারীদের হিতৈষণার ভঙ্গিতে এবং নম্রভাবে কথা-বার্তা বলতে

হবে। হয়ত এরই ফলশ্রুতিতে সে কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হবে এবং তার অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হবে। পরে তিনি লিখেছেন-আজকাল বহু জ্ঞানীজন নিজেদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে একে অপরের বিরুদ্ধে কটুবাক্য প্রয়োগ ও দোষারোপ করাকে ইসলামের সেবা মনে করে বসেছেন; তাদের এ বিষয়ে বিশদ চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। (মাআরিফুল কুরআন : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০৯-১১০ পৃষ্ঠা)

৪. কঠোরতা ও রুক্ষতা পরিহার

নম্রতা ও কমনীয়তার প্রয়োজনীয়তা থেকে নেতিবাচকভাবে কঠোরতা ও রুক্ষতা পরিহারের অপরিহার্যতাও প্রমাণিত হয়। দায়ীকে ব্যবহারে, ভাষায় বা বিষয়বস্তুতে যে কোনরূপে কঠোরতা ও রুক্ষতা অবশ্য পরিহার করে চলতে হবে। কোন ব্যক্তি বা দলের প্রতি আক্রমণাত্মক বা বিদ্রূপাত্মক যে কোন ভাষা তাকে পরিত্যাগ করতে হবে, অন্যথায় তার দাওয়াতকে গোঁড়ামী, পক্ষপাতদুষ্ট, অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা হবে কিম্বা কঠিন মনে করে তা থেকে মানুষ পালিয়ে যাবে। এ কারণে রাসূল (সা.) হযরত আবূ মূসা আশআরী ও মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-কে দাওয়াতের কাজে ইয়ামানে প্রেরণ করার সময় এই নীতির ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন,

يَسِّرَا وَلَاتُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَاتُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا ... الخ

অর্থাৎ, তোমরা সহজ করবে, কঠিন করবে না। সুসংবাদ শুনাবে, পালিয়ে যেতে বাধ্য করবে না এবং পরস্পরে ঐক্যমত্য (ও সহানুভূতি) বজায় রাখবে। (বোখারী : ২য় খণ্ড, ৯০৪ পৃষ্ঠা)

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা একদা রাসূল (সা.)-এর সাথে বসেছিলাম। ইত্যবসরে এক বেদুঈন এল এবং মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে শুরু করল। তখন রাসূল (সা.)-এর সাহাবীগণ তাকে বললেন থাম থাম! রাসূল (সা.) বললেন, তাকে বাঁধা দিওনা, তাকে ছেড়ে দাও। সাহাবাগণ তাকে ছেড়ে দিলেন। সে পেশাব সম্পন্ন করল। তারপর রাসূল (সা.) তাকে ডাকলেন এবং বললেন, এই সমস্ত মসজিদ এই পেশাব পায়খানার জন্য নয়, এগুলো শুধু আল্লাহর যিক্র, সালাত ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য.......। (মুসলিম : ১ম খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

আল্লামা নববী এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এই হাদীছ দ্বারা

প্রমাণিত হয় যে, অজ্ঞ লোকদেরকে নম্রতার সাথে শিক্ষা প্রদান করতে হবে। অবশ্য কেউ যদি গোয়ার্তুমী কিংবা তাচ্ছিল্য ভরে এ জাতীয় কাজ করে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা।

এ হাদীছে উল্লেখিত রাসূল (সা.)-এর নম্র ব্যবহারে মনস্তাত্ত্বিক সুফল লাভের বিষয়টি সুস্পষ্ট। অজ্ঞ এই বেদুঈন লোকটির সাথে কঠোর ব্যবহার পূর্বক তাকে মসজিদ থেকে বের করে দিলে হয়তোবা সে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে যেত এবং পরিণামে দ্বীন থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। পক্ষান্তরে রাসূল (সা.)- এর এই কমনীয় ব্যবহারে বেদুঈন লোকটি এতখানি মুগ্ধ হয়েছিল যে, পরবর্তীতে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে সে বলেছিল, আল্লাহর কছম তাঁর থেকে উত্তম শিক্ষক আমি আর দেখিনি। আল্লাহর কছম তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন না, আমাকে ধমক দিলেন না, আমাকে প্রহার করলেন না, আমাকে বকা দিলেন না; অথচ কত সুন্দরভাবে আমাকে শিক্ষা প্রদান করলেন।

রাসূল (সা.) অজ্ঞ লোকদের অসদাচরণ ও অশোভন কথা-বার্তার জবাবে যে মার্জিত ব্যবহার ও কোমল কথা-বার্তা বলেছেন তার নমূনা হাদীছে ভরপুর। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, হুনায়নের যুদ্ধে গনীমত বন্টনের ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) কতক আরব-নেতৃস্থানীয় লোককে অগ্রাধিকার দিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কছম, এই বন্টনে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। আমি বললাম, আল্লাহর কছম, অবশ্যই আমি রাসূল (সা.)-কে জানিয়ে দিব। অতঃপর আমি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে লোকটির বক্তব্য সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে লাল বর্ণ ধারণ করল। এরপর বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ইনসাফ না করলে কে ইনসাফ করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ মূসা-র প্রতি রহম করেন; তাঁকে এর চেয়ে অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছিল আর তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।

মূর্খদের সাথে অহেতুক তর্কে কিংবা অসার আলোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়া এবং তাদের থেকে নিবৃত্ত থাকা ও তাদেরকে ক্ষমা করার কথা কুরআনের বহু আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তম্মধ্যে কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হল।

خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ.

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমা পরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর। (সূরা আ'রাফ : ১৯৯)

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا.

অর্থাৎ, অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ, তাকে উপেক্ষা করে চল, সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। (সূরা নাজম : ২৯)

وَ اِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَ قَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ.

অর্থাৎ, তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে, তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না। (সূরা কাসাস : ৫৫)

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ.

অর্থাৎ, তুমি পরম সৌজন্যের সাথে ক্ষমা কর। (সূরা হিজ্‌র : ৮৫)

এসব আয়াতে দাওয়াতের ক্ষেত্রে রুক্ষতা পরিহার ও ক্ষমা প্রদর্শনের আদর্শ শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

৫. মাঝে মাঝে বিরতি প্রদান

দাওয়াত এবং ওয়াজ নসীহতের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বিরতি প্রদান করা শ্রোতার মন-মেজাযকে অনুকূল রাখার অধিকতর উপযোগী। লাগাতার ও নিরবচ্ছিন্নভাবে দাওয়াত ও ওয়াজ-নসীহত শ্রোতার মনে বিরক্তি বা ত্যক্ততা সৃষ্টি করতে পারে। ইসলামের শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রেও এ নীতিটি প্রযোজ্য। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, "অনেক ধরনের শিক্ষণে কিছু সময় অনুশীলনের পর আবার কিছু সময় বিরতি প্রদান করলে শিক্ষণ ভাল হয়। একটানা অনুশীলনের চেয়ে মাঝে মাঝে বিরতি ও বিশ্রাম গ্রহণ মনস্তাত্ত্বিক নীতি অনুসারে অধিকতর উপযোগী।" এতে করে শ্রোতাদের মধ্যে একঘেয়েমি সৃষ্টি হবে না বরং সে নতুনত্ব অনুভব করতে থাকবে। আর এই নতুনত্বকে মনোবিজ্ঞারীরা মনোযোগ আকর্ষণের একটি শর্ত হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন।

হযরত শাকীক বালাখী (রহ.) বলেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সপ্তাহে একদিন (প্রতি বৃহস্পতিবার) ওয়াজ নসীহত করতেন। জনৈক ব্যক্তি আরয করল হে আব্দুর রহমান[১] যদি প্রতিদিন আপনি আমাদেরকে ওয়াজ নসীহত করতেন তাহলে কত সুন্দর হত। তখন ইব্‌নে মাসঊদ

(রা.) বললেন,

আবদুর রহমান ইবনে ... (রা.)-এর কুনিয়াত বা উপনাম।

অর্থাৎ, শুনো! প্রতিদিন ওয়াজ নসীহত করায় আমার বাঁধা আছে। আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করতে চাই না। ওয়াজের মাঝে মাঝে আমি বিরতি দিয়ে থাকি যেমন রাসূল (সা.) আমাদের বিরক্তির আশংকায় মাঝে মাঝে বিরতি প্রদান করতেন। (বোখারী ও মুসলিম)

اَمَا اَنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذٰلِكَ اَنِّي اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ وَاِنِّي اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

কারী মুহা. তাইয়্যিব সাহেব তার ‘দ্বীনী দাওয়াত-কে কুরআনী উসূল’ শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, এখানে লক্ষণীয় বিয়ষ যে, ভক্ত এবং নিবেদিত প্রাণ মানুষের মধ্যেও যখন প্রতিদিন ওয়াজ করার ফলে বিরক্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল; যার ফলে সপ্তাহে একদিন ওয়াজের ব্যবস্থা করা হত, তখন অপরিচিত বা অমুসলিমদের ক্ষেত্রে এই আশংকা আরো প্রবল হওয়াটাই স্বাভাবিক। অতএব তাবলীগ এবং দাওয়াতও মাঝে মধ্যে এবং সময়ে সময়ে হতে হবে। যেন ধীরে ধীরে মানব বৃত্তি জাগরিত হতে থাকে এবং আগ্রহ অক্ষুণ্ন থাকে।

এমনিভাবে ওয়াজ নসীহত এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে বক্তব্য অতি দীর্ঘ হওয়া সমীচীন নয়। এতে করে শ্রোতাদের মধ্যে ত্যক্ততা সৃষ্টির সাথে সাথে বক্তার প্রতি শ্রোতাদের শ্রোদ্ধাবোধ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং তার বক্তব্যের প্রতি অনীহা ও তা গ্রহণের ব্যাপারে অনাগ্রহ সৃষ্টির আশংকা দেখা দিতে পারে। এমনটি হলে তা হবে বক্তা ও দায়ীর নির্বুদ্ধিতার অবাঞ্ছিত পরিণতি। অনেকেই জযবার আতিশয্যে বক্তব্য এত দীর্ঘ করে ফেলেন যে, শ্রোতা মনে মনে তার থেকে নিস্কৃতি কামনা আরম্ভ করে, এটা ইসলামের মনস্তাত্ত্বিক নীতির পরিপন্থী। সহীহ মুসলিম গ্রন্থে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা.) থেকে বর্ণিত একটি রিওয়ায়েতে তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি,

اِنَّ طُوْلَ صَلٰوةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهٖ مَئِنَّةٌ فِقْهِهٖ. فَاَطِيْلُوا الصَّلٰوةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ.

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি কর্তৃক নামায দীর্ঘায়িত ও আলোচনা সংক্ষিপ্ত করণ তার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

অতএব বক্তব্য আলোচনা এবং ওয়াজ হতে হবে নাতিদীর্ঘ ও

আগ্রহের সীমানার মধ্যে সমাপ্ত।

৬. পর্যায়ক্রমে এবং অল্প অল্প করে দাওয়াত প্রদান

দাওয়াতের ক্ষেত্রে অল্প অল্প করে পর্যায়ক্রমে দাওয়াতের বিষয়বস্তুকে পেশ করতে হবে। একটি বিষয় উপস্থাপনের পর আরেকটি বিষয় উপস্থাপন করতে হবে। একই সাথে অনেকগুলো বিষয় পেশ করলে শ্রোতার কাছে তখন কঠিন মনে হবে। ফলে সে দাওয়াতের বিষয়কে পরিত্যাগ করে বসতে পারে। হযরত আবূ মূসা আশআরী ও মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় রাসূল (সা.) উপদেশ স্বরূপ তাদেরকে যে কথাগুলো বলেছিলেন তার মধ্যে এ কথাটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, "তোমরা সহজ করবে, কঠিন করবে না।" হাদীছটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সহজকরণের মধ্যে অল্প অল্প করে পেশ করাও অন্তর্ভুক্ত। অন্য একটি হাদীছে আরও স্পষ্টভাবে একটি বিষয় গ্রহণ করার পর অন্য একটি বিষয়ের দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন,

اِنَّ مُعَاذًا قَال بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِيْ قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِىْ فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ

অর্থাৎ, রাসূল (সা.) আমাকে ইয়ামানবাসীদের নিকট (প্রশাসক নিযুক্ত করে) পাঠালেন। তিনি বললেন, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে এ কথার আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, ধনীদের থেকে তা আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে তা বন্টন করা হবে। তারা একথাটি মেনে নিলে সাবধান! যাকাত হিসেবে তোমরা তাদের থেকে বাছাই

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهٗ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ.
(مسلم ج : ١ صـ : ٣٦)

করে উত্তমগুলো নিবে না। মাজলূমের বদ দু'আ থেকে সাবধান! কেননা আল্লাহর ও মাজলূমের দু'আর মাঝখানে কোন অন্তরায় নেই। (মুসলিম : ১ম খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা)

এ হাদীছে স্পষ্টভাবেই একটি বিষয় মেনে নেয়ার পর অন্য একটি বিষয় পেশ করার কথা বলা হয়েছে। আল্লামা শাব্বির আহমদ উছমানী (রহ.) এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, এতে করে দাওয়াতের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিকতা ও অল্প অল্প করে দাওয়াত পেশ করার নীতি প্রমাণিত হয়। (ফাতহুল মুলহিম : ১ম খণ্ড)

৭. দাওয়াতের পূর্বে নিজের মধ্যে আমল সৃষ্টি করা

দাওয়াতের ক্ষেত্রে আরও এক ধরনের পর্যায়ক্রমিকতা বা বিন্যাস রয়েছে। তা হল-দাওয়াত সর্বপ্রথম দায়ীর ব্যক্তি থেকে শুরু হবে, তারপর তার পরিবারবর্গ, তারপর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন, তারপর দেশবাসী, তারপর বহির্বিশ্ব। দাওয়াত প্রদানকারী প্রথমে তার নিজেকে দাওয়াত তথা আমলের বাস্তব প্রতীক বানাবে, অতঃপর তার পরিবার-পরিজনকে বন্ধু-বান্ধবদেরকে নমূনা হিসেবে দেশবাসীর সম্মুখে পেশ করবে। এমনিভাবে পূর্বের স্তর তার পরবর্তী স্তরের জন্য নমূনা হয়ে দাঁড়াবে। তাতে করে পরবর্তী স্তরের মধ্যে দাওয়াতী বিষয়বস্তুর প্রতি মানসিক প্রশ্নের জন্ম নিবে না কিংবা ক্লেশকর কাজ হলে বক্তাকে তার সাথে জড়িত দেখে সেটাকে অনেকটা স্বাভাবিক ও সাধারণ বলে মনে হবে। আল্লামা মাহমূদ আলুসী বলেন, কেননা সাধারণতঃ দেখা যায় কোন একটা ক্লেশকর কাজে অনেক লোক এক সাথে জড়িত হয়ে পড়লে তা অনেকটা স্বাভাবিক ও সাধারণ বলে মনে হয়। এ জন্যই কুরআনে কারীমে রোযা রাখার নির্দেশের সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে যে, রোযা শুধুমাত্র তোমাদের প্রতিই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল। (রূহুল মা'আনী)

ইরশাদ হয়েছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

অর্থ: হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। (সূরা বাকারা] : ১৮3)

দাওয়াত প্রদানকারীর মধ্যে যদি আমল না থাকে, সে ক্ষেত্রে তার দাওয়াতের পশ্চাতে কোন অসদুদ্দেশ্য (যেমন-উপদেশকারী হিসেবে সম্মান লাভের আশা, অন্যকে হেয় পতিপন্ন করা ইত্যাদি) রয়েছে বলে সন্দেহ হতে পারে। মানসিকভাবে তাই লোকেরা সাধারণতঃ ঐ সব উপদেশকারীর কথাই মানতে উদ্বুদ্ধ হয়, যাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আমল বিদ্যমান থাকে। এ জন্যই কুরআনে কারীমে উপদেশকারীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আমলকারী হওয়ার ব্যাপারে তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং যারা এর বিপরীত তাদেরকে মৃদু ভর্ৎসনা স্বরূপ বলা হয়েছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ.

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর কাছে অতিশয় অসন্তোষজনক। (সূরা সাফ্‌ফ : ২-৩)

অন্যত্র আমলহীন উপদেশকারী ইয়াহুদীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

اَتَـاْمُـرُوْنَ الـنَّاسَ بِالْـبِـرِّ وَ تَـنْـسَـوْنَ اَنْـفُـسَـكُمْ.

অর্থ: তোমরা মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও অথচ নিজেদেরকে ভুলে বস! (সূরা বাকারা : ৪৪)

এখানে উল্লেখ্য যে, কারও মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আমল না থাকলে তার পক্ষে অন্যকে সে বিষয়ের দাওয়াত বা নির্দেশ দেয়া নিষেধ তা নয়, তবে অন্যান্য ফায়দা সহ মনস্তাত্ত্বিক আনুকূল্য সৃষ্টির লক্ষ্যে তৎ সংশ্লিষ্ট আমল থাকা বাঞ্ছনীয়। মুফতী শফী সাহেব (রহ.) তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে বলেন, একথা যেন বোঝা না হয় যে, কোন আমলহীন বিরুদ্ধাচারীর পক্ষে অপরকে উপদেশ দান করা জায়েয নয় এবং কোন ব্যক্তি যদি কোন পাপে লিপ্ত থাকে, তবে সে অপরকে উক্ত পাপ হতে বিরত থাকার উপদেশ দিতে পারবে না। এরূপ বোঝা ঠিক নয়। কারণ, সৎ কাজের জন্য ভিন্ন নেকী এবং সৎ কাজের প্রচার প্রসারের জন্য পৃথক ও স্ব স্ব নেকী। আর এটা সুস্পষ্ট যে, এক নেকী পরিহারের ফলে অপর নেকীও পরিহার করতে হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন– কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে অপরকেও নামায পড়তে বলতে পারবে না এমন কোন কথা নয়, অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে

রোযাও রাখতে পারবে না এমন কোন কথা নেই। তেমনিভাবে কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়া ভিন্ন পাপ এবং নিজের অধীনস্ত লোকদেরকে এই অবৈধ কাজ থেকে বারণ না করা পৃথক পাপ। একটি পাপ কাজ করছে বলে অপর পাপও করতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।

যদি প্রত্যেক মানুষ নিজে পাপী বলে সৎ কাজের নির্দেশ দান ও অসৎ কাজ হতে বাঁধা দান করা ছেড়ে দেয় এবং বলে যে, যখন সে নিজে নিষ্পাপ হতে পারবে, তখনই অপরকে উপদেশ দিবে, তাহলে ফল দাঁড়াবে এই যে, কোন তাবলীগকারী আর অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা, এমন কে আছে যে পরিপূর্ণ নিষ্পাপ? হযরত হাসান (রা.) এরশাদ করেছেন-শয়তান তো তাই চায় যে, মানুষ এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাবলীগের দায়িত্ব পালন না করে বসে থাক। (মাআরিফুল কুরআন : ১ম খণ্ড)

ফকীহ আবুল লায়ছ আল্লামা নছর ইবনে মুহাম্মাদ সমরকন্দী (রহ.) "তামবীহুল গাফিলীন" কিতাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধকারীর তথা দাওয়াত প্রদান কারীর জন্য পাঁচটি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হল, দাওয়াতদানকারী দাওয়াতের পূর্বেই নিজের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আমল সৃষ্টি করবে। এ বিষয়টি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তবে পূর্ব শর্ত নয়। কেননা, তাহলে শয়তান দাওয়াত দানকারীকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে এই বলে দাওয়াত থেকে বিরত রাখতে পারে যে, তোমার নিজের মধ্যেই তো যথাযথ আমল নেই, অন্যকে দাওয়াত করবে কিভাবে? অতএব নিজের মধ্যে আমল সৃষ্টি করার পূর্বেও দাওয়াত প্রদান করা যাবে বরং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীছ থেকে জানা যায় যে, এরূপ ব্যক্তির পক্ষেও দাওয়াত প্রদান করা জরুরী।

উক্ত হাদীছে নবী (সা.) ইরশাদ করেন,

مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَاِنْ لَمْ تَعْمَلُوْا بِهٖ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا عَنْهُ.

অর্থাৎ, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও যদিও তোমরা তা আমল না কর এবং মন্দ কাজে বাঁধা দাও যদিও তা থেকে তোমরা বিরত নও। (তামবীহুল গাফিলীন : ৫৫ পৃষ্ঠা)

তদুপরি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমল সৃষ্টি না হলেও দাওয়াত প্রদান ও তা অব্যাহত রাখার পশ্চাতে অন্য একটি মনস্তাত্ত্বিক আনুকূল্য নিহিত আছে-

দাওয়াত প্রসঙ্গে অন্যকে বার বার সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কর্মে বাঁধা দিতে দিতে দায়ীর নিজের মনেও তার একটি অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। কেননা কেউ যখন কোন আদর্শের প্রতি বার বার অন্যকে আহ্বান জানাতে থাকে, তখন নিজে সেই আদর্শের বিপরীত লিপ্ত হতে গেলে নিজের বিবেকের কাছে সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, নিজের বিবেকের প্রশ্নবাণে সে নিজেই জর্জরিত হয়, এতে করে মনস্তাত্ত্বিকভাবেই তার প্রেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমলের প্রতি অনুকূলে প্রবাহিত হয়। অন্যকে ন্যায় ও সততার প্রতি আহ্বান জানিয়ে নিজে অন্যায় ও অসৎ কর্মের প্রতি ধাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে তার মন থেকেই সে বাঁধা অনুভব করবে, নিজেই সে বিব্রতবোধ করবে। এই মানসিক বাঁধা বিব্রতবোধই তাকে আদর্শের অনুসারী ও তাতে অবিচল করে তুলবে।

৮. দায়ীর নিজের অবস্থানকে পরিস্কার রাখা

দায়ীকে লক্ষ্য রাখতে হবে তার কোন উক্তি, আচরণ বা কর্ম যেন তার প্রতি অন্যের মনে অহেতুক সন্দেহের সৃষ্টি না করে। সমাজের সামনে তার অবস্থানকে পরিস্কার রাখতে হবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। একবার রমযানের শেষ দশকে রাসূল (সা.) মসজিদে এ'তেকাফে রত ছিলেন। তখন রাসূল (সা.)-এর স্ত্রী সাফিয়্যা বিনতে হুইয়াই রাতের বেলায় রাসূল (সা.)-এর কাছে এলেন এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। রাসূল (সা.)ও তাকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে সঙ্গে চললেন। তারা উভয়ে উম্মে সালমার ঘরের দ্বার সন্নিকটস্থ মসজিদের দুয়ার পর্যন্ত উপনীত হয়েছেন, ইত্যবসরে দুজন আনসারী সাহাবী সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সাহাবীদ্বয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সালাম দিলেন এবং সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। তখন রাসূল (সা.) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন থামো। এ হল হুইয়াই তনয় সাফিয়্যা (অর্থাৎ, আমার স্ত্রী)। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ, (রাসূলের কথায় তারা বুঝতে পেলেন যে, রাসূল (সা.) হয়ত মনে করেছেন আমরা তাঁর প্রতি এই মর্মে সন্দিহান হব যে, তিনি কোন বেগানা নারীর সাথে কথাবার্তা বলছেন) রাসূল (সা.) বললেন,

اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنْ اِبْنِ اٰدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ وَاِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ يَّقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا.

অর্থাৎ, শয়তান মানুষের শিরা উপশিরা দিয়ে চলাচল করতে পারে। আমার আশংকা হল যে, সে তোমাদের মনে প্রক্ষেপণ করবে। (বোখারী : ১ম খন্ড, ২৭২ পৃষ্ঠা ও ২য় খণ্ড, ৯১৮ পৃষ্ঠা)

এ হাদীছে সাহাবীদ্বয়কে ডেকে “এ আমার স্ত্রী সাফিয়্যা” কথাটি বলা ছিল একান্তভাবেই মনস্তাত্ত্বিক কারণে। কেননা শয়তানের প্ররোচনায় নবী (সা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে তাদের মনে অহেতুক সন্দেহ সৃষ্টির সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। এমনটি হলে তাদের কাফের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তদুপরি এতে করে রাসূলের চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়ায় তাঁর দাওয়াতও প্রভাবহীন হয়ে পড়ত। তাই নিজের অবস্থানকে পরিস্কার রাখার উদ্দেশ্যেই রাসূল (সা.) তাদেরকে ডেকে তাদের সম্ভাব্য সন্দেহের অপনোদন করলেন। এমনিভাবে হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, মানুষের অহেতুক বিরূপ ধারণাকে প্রতিহত করা এবং নিজের অবস্থানকে নির্মল রাখার ব্যাপারে রাসূল (সা.) যত্নবান ছিলেন।

এক হাদীছে বর্ণিত আছে– হযরত উমার (রা.) জনৈক মুনাফিককে হত্যা করতে চাইলে রাসূল (সা.) বলেছিলেন,

دَعْهُ لَايَتَحَدَّثِ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ.

অর্থাৎ, তাকে হত্যা কর না, লোকেরা যেন না বলে যে, মুহাম্মাদ তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করে। (বোখারী : ১ম খন্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড, ৭২৮ পৃষ্ঠা)

বলা বাহুল্য-নিজের অবস্থান পরিষ্কার ও নির্মল রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন। দায়ী ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের অবস্থান পরিষ্কার না থাকলে তাদের বক্তব্য অন্যদের মনে প্রভাব ফেলার ক্ষমতা হারিয়ে বসে। এ পর্যায়ে ইমাম বোখারীর একটি ঘটনা উল্লেখ করছি– ইমাম বোখারী ছাত্র জীবনে একবার সমুদ্র সফরে ছিলেন, তার কাছে তখন এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ছিল। জাহাজে জনৈক আরোহী তার সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিকতা প্রদর্শন করল এবং তার ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। ইমাম বোখারী এক পর্যায়ে তাকে নিজের কাছে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা থাকার বিষয়টি প্রকাশ করে ফেললেন। তারপর একদিন প্রত্যুষে ঐ ভদ্র লোকটি হৈ চৈ জুড়ে দিয়ে বলল, আমার এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা হারিয়ে গেছে। তার কথামত জাহাজে তল্লাশী আরম্ভ হল। ইমাম বোখারী সকলের অগোচরে তার থলেটি স্বর্ণ মুদ্রা সহ সমুদ্রে ফেলে দিলেন। এক পর্যায়ে ইমাম বোখারীর কাছেও তল্লাশী চালানো হল। জাহাজের কারও নিকট যখন হৈ চৈ কারী লোকটির কথিত স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গেল না, তখন লোকেরা তাকে অপমান করল।

অবশেষে সফর শেষে যখন সকলে জাহাজ থেকে অবতরণ করল তখন লোকটি নির্জনে ইমাম বোখারীকে জিজ্ঞেস করল আপনার স্বর্ণ মুদ্রাগুলো কোথায়? ইমাম সাহেব জানালেন, সমুদ্রে ফেলে দিয়েছি। এতগুলো স্বর্ণ মুদ্রা সমুদ্রে ফেলে দেয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সারাটি জীবনের মূল্যবান সময় রাসূল (সা.)-এর হাদীছ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করণের কাজে ব্যয় করে আমার জীবনের প্রতি মানুষের যে আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতা সংগ্রহ করেছি অহেতুক চুরির সন্দেহ দ্বারা সেই মূল্যবান সংগ্রহকে আমি বিসর্জন দিতে চাই না। (ফাতহুল বারী)

বলা বাহুল্য-দ্বীনী কাজের স্বার্থে নিজের জীবন ও অবস্থানকে নির্মল রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি এত বড় ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এ পদক্ষেপটি ছিল তাঁর একটি বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক সতর্কতা।

অনেকে বলে থাকেন-আমি অন্যায় কাজ করিনি অতএব কেউ আমার প্রতি বিরূপ ধারণা করলে আমার কিছু করণীয় নেই, তাদের এই বক্তব্য ইসলামের মনস্তাত্ত্বিক নীতির পরিপন্থী। আল্লামা নববী বলেন, আলিম, মুআল্লিম, বিচারক, মুফতী, শায়খ, মুরব্বী প্রমুখ অনুস্মরণীয় ব্যক্তির জন্য এমন সব উক্ত, কর্ম ও আচরণ পরিহার করা শ্রেয়, বাহ্যিক দৃষ্টে যা গর্হিত মনে হয়, যদিও প্রকৃত বিচারে তা সঠিক হয়ে থাকে। কেননা, এরূপ করলে সামগ্রিকভাবে বহুবিধ অনাসৃষ্টি দেখা দিবে। বহু দর্শক বাহ্যিক রূপকেই বৈধ মনে করে বসবে, ফলে তা শরীআত সম্মত ও প্রত্যেকের জন্য আমল যোগ্য বিবেচিত হতে থাকবে। আবার অনেকেই তার সমালোচনায় লিপ্ত হবে এবং তার ব্যাপারে তাদের মুখ খুলে যাবে। এতে করে মানুষ তার প্রতি কু-ধারণা বশতঃ তার থেকে দূরে সরে পড়বে, তার থেকে জ্ঞান আহরণ ত্যাগ করবে এবং তার বর্ণনা, তার সাক্ষ্য প্রভাব হারিয়ে ফেলবে, তার ফতোয়ায় কেউ আমল দিবে না, তার জ্ঞানমূলক আলোচনার প্রতি জনমনের আকর্ষণ নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য-এসবই সাক্ষাৎ অকল্যাণ। সুতরাং এগুলোর উৎসকে পরিহার করা উচিত। যদি একান্তভাবেই তা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাহলে তা গোপনে করবে প্রকাশ্যে নয়। যদি কেউ প্রকাশ্যে করেন কিংবা প্রকাশ হয়ে পড়ে অথবা তার বৈধতা ও তৎ সম্পর্কিত শরীআতের প্রকৃত বিধান জনসমক্ষে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে তা করা শ্রেয় মনে করেন, তাহলে তার উচিত হবে সে কাজ করার বা সে কথা বলার পর একথা বলে দেয়া যে,

আমার এই উক্তি বা কর্ম অবৈধ নয় কিম্বা এর পশ্চাতে আমার উদ্দেশ্য হল যাতে তোমরা জানতে পার যে, আমি যেভাবে এটা করলাম তা অবৈধ নয় বরং প্রকৃত পক্ষে এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা এই যে, ... এবং তার দলীল এই যে, ...। (কিতাবুল আযকার)

বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্দেহের উদ্রেক হয় এমন কাজ করার পর বক্তব্য দ্বারা সন্দেহ অপনোদনের প্রমাণ রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের জীবনে বহু সংখ্যক পাওয়া যায়। যেমন "এ আমার স্ত্রী সাফিয়া" সম্পর্কিত হাদীছ পূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত সাহ্ল ইবনে সাআদ সাইদী (রা.)-এর বাচনিক বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেন, "আমি দেখেছি রাসূল (সা.) মিম্বরের উপর নামাযে দাঁড়ালেন অতঃপর তাকবীর বললেন, পশ্চাতের লোকেরাও তাকবীর বলল। তিনি কিরাত পাঠ করলেন ও রুকু করলেন, লোকেরাও পশ্চাতে রুকু করল। অতঃপর তিনি রুকু থেকে উঠলেন এরপর পেছনে সরলেন, অতঃপর মাটিতে সাজদা করলেন। তারপর মিম্বরের উপর ফিরে গেলেন। এভাবে নামায থেকে ফারেগ হলেন। পরে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, হে লোক সকল! আমি এটা শুধু এজন্য করলাম, যাতে তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার নামায সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পার।" (বোখারী : ১ম খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা; মুসলিম : ১ম খণ্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা)

এখানে নামাযের মধ্যে আগ পিছ হওয়া এবং মুসল্লিদের থেকে উঁচুতে দাঁড়ানোর ফলে রাসূলের নামায নষ্ট হওয়া সম্পর্কে যে সন্দেহ হতে পারত তিনি সে সন্দেহ পরে নিরসন করেছেন এবং কার্যত দেখিয়েছেন যে, নামাযের মধ্যে এক দু'কদম নড়াচড়া করা এবং ইমামের পক্ষে মুসল্লিদের চেয়ে কিছুটা উঁচুতে দণ্ডায়মান হওয়া জায়েয। অবশ্য এটা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।

বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে– হযরত আলী (রা.) একবার দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন, পরে তিনি (রাসূলের সুন্নাতের বরখেলাফ করেছেন বলে মানুষের যে কু-ধারণা হতে পারত তা নিরসন কল্পে) বললেন, লোকেরা দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে খারাপ মনে করে, অথচ তোমরা আমাকে যেমন করতে দেখলে আমি রাসুল (সা.)-কে অনুরূপ করতে দেখেছি। (বোখারী : ২য় খণ্ড, ৮৪০ পৃষ্ঠা)

তবে উল্লেখ্য যে, অন্যান্য হাদীছের আলোকে দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে মুস্তাহাবের খেলাফ বলা হয়েছে। এ হাদীছে শুধু দাঁড়িয়ে পান করা

জায়েয এতটুকুই বোঝানো হয়েছে।

৯. দোষ ত্রুটির নেছবত নিজের দিকে করে কথা বলা
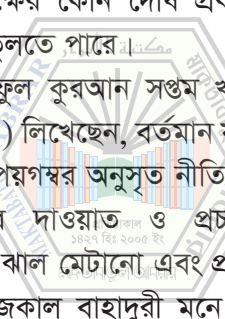
মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রতিটি মানুষই অন্যের কাছে ভাল প্রতিপন্ন হতে চায়, এজন্যেই নিজের যোগ্যতার স্বীকৃতি পেলে সে আনন্দিত হয়, নিজের প্রশংসা শুনলে মুগ্ধ হয় আর যারা তার যোগ্যতার মূল্যায়ন করে ও স্বীকৃতি দেয় তাদের প্রতি সে প্রীত হয়ে পড়ে এবং তাদেরকে আপনার অনুকূল মনে করে থাকে। ফলে তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ও তা মানার জন্য তার মধ্যে মানসিক আনুকূল্য সৃষ্টি হয়, তার স্নায়ুগুলো তাদের কথা শোনার জন্য উৎসাহিত হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে নিজের দোষ-ত্রুটি ও নিন্দা-মন্দ শুনলে তার আবেগ-অনুভুতি আঘাত প্রাপ্ত হয়, তার সংবেদন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, তার স্নায়ুগুলো বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই যাদের থেকে এই নিন্দা-মন্দ ও দোষ-ত্রুটি শুনতে পায়, তাদের প্রতি সে মনক্ষুণ্ন হয় এবং তাদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা ও তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনা এবং তা মানার জন্য প্রস্তুত হতে পারে না। রাসূল (সা.) নির্দিষ্ট ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি জেনেও তার প্রতি সে দোষ সম্পৃক্ত করে কথা বলেননি বরং বলেছেন, মানুষের কী হল যে, তারা এরূপ কর্ম করে। রাসূল (সা.)-এর ভাষণ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এটা জানা যায়। দাওয়াতের ক্ষেত্রে মাদঊ বা শ্রোতার প্রতি দোষ সম্পৃক্ত না করে নিজেদের প্রতি দোষ সম্পৃক্ত করার একটি স্পষ্ট বর্ণনা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বিধৃত হয়েছে,

وَمَا لَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ.

অর্থাৎ, আমাদের কী হল যে, আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব না?

অন্য এক আয়াতে আছে,

وَ مَا لِىَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّ لَا يُنْقِذُوْنِ اِنِّىٓ اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থাৎ, আমার কী যুক্তি আছে যে, আমি তার ইবাদত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করব, দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে যাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না? এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব। (সূরা ইয়াসীন : ২৩-২৪)

এখানে লক্ষণীয় যে, আয়াতে এরূপ ভঙ্গিতে বলা হয়নি যে, তুমি কেন তার ইবাদত কর না যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন (এটা যে নিতান্তই কৃতঘ্নতা) তার পরিবর্তে এমন ইলাহ কেন গ্রহণ কর (যে এতই গুরুত্বহীন) যে, তার সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। (এবং এতই অপদার্থ) যে তোমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না? এরূপ করলে তুমি অবশ্যই বিভ্রান্ত। মোটকথা– দোষগুলো দোষী ব্যক্তির প্রতি সম্পৃক্ত করে কথা বলা হয়নি। কেননা, এতে তার মনে আঘাত লাগতে পারে, ফলে দাওয়াতের উদ্দেশ্য বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিবে। তাই দোষ-ত্রুটির নেছবত নিজের দিকে করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে আমি কেন করব না? আমি তাহলে বিভ্রান্ত হব ইত্যাদি। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। তাহল প্রতিপক্ষের কোন দোষ প্রকাশ মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাকে জেদী ও হটকারী করে তুলতে পারে।

তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন সপ্তম খন্ডে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফতী শফী সাহেব (রহ.) লিখেছেন, বর্তমান যুগের দাওয়াত ও প্রচারকর্মী এবং সংস্কারকগণ এই পয়গম্বর অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করেছেন। ফলে মানুষের মধ্যে তাদের দাওয়াত ও প্রচার নিস্ফল হয়ে পড়ে। বক্তৃতা-বিবৃতিতে মনের ঝাল মেটানো এবং প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্রূপাত্মক বাক্য বর্ষণ করাকে আজকাল বাহাদুরী মনে করা হয়, যা প্রতিপক্ষকে আরও বেশি জেদী ও হটকারী করে তোলে।

প্রতিপক্ষের মধ্যে এরূপ জেদ ও হটকারিতা সৃষ্টির উদাহরণ স্বরূপ একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.

অর্থাৎ, আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে, তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তাহলে তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞতা বশত আল্লাহকেও গালি দিবে। (সূরা আন্‌আম : ১০৮)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনে সমালোচনার নীতি ইসলামে স্বীকৃত, তবে সেক্ষেত্রেও শালীনতা বর্জন বা অতিরঞ্জন ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত। আলোচ্য আয়াতে প্রয়োজন ও শালীনতার সীমা লংঘনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। বিশেষত দাওয়াতের ক্ষেত্রে সমালোচানর

নীতি পরিহার ও ইতিবাচক বক্তব্যই অধিকতর কার্যকরী হয়ে থাকে। বাতিলের প্রচার প্রসারের জবাব ও ভ্রান্তির ধুম্রজাল থেকে অজ্ঞ মানুষদের সতর্ক করার উদ্দেশ্য ব্যতীত সমালোচনার নীতি পরিহার করা শ্রেয়।

যেখানে সমালোচনার তথা অন্যের দোষ ব্যক্ত করার প্রয়োজন পড়বে সেক্ষেত্রেও শ্রোতার মনঃকষ্ট না হয় কিম্বা তার মধ্যে জেদ ও উত্তেজনা সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, অন্যথায় সমালোচনার কার্যকারিতা বিনষ্ট হবে। পৌত্তলিক ধর্মের অন্ধ অনুসারী মক্কার মুশরিকদের সমালোচনা প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমের বর্ণনা লক্ষণীয়।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ.

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আস, তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের যাতে পেয়েছি, তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কী! যদিও তাদের পূর্ব পুরুষগণ কিছুই জানত না এবং সৎ পথ প্রাপ্তও ছিল না, তথাপি? (সূরা মায়িদা : ১০৪)

اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ.

অর্থাৎ, অন্ধ অনুকরণ কি, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝতনা এবং তারা সৎ পথেও পরিচালিত ছিল না তথাপিও? (সূরা বাকারা : ১৭০)

এখানে লক্ষণীয় যে, পৌত্তলিক ধর্মানুসারীদের জবাবে একথা বলা হয়নি যে, তোমাদের পিতৃপুরুষ অজ্ঞ ও পথভ্রষ্ট ছিল, সুতরাং তাদের অন্ধ অনুকরণ করায় তোমরাও অজ্ঞ ও ভ্রান্ত বৈ কিছুই নও। বরং প্রশ্নমূলক শিরোনামে বলা হয়েছে যে, পিতৃপুরুষগণ যদি জ্ঞান ও সৎ পথের অধিকারী না হন এমতাবস্থায় তাদের অনুসরণ কি যুক্তিযুক্ত হতে পারে? সমালোচনার এই মার্জিত রূপ কোন মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে না। তবে কোন ক্ষেত্রে যদি মাদঊর ভ্রান্তি এতই সুস্পষ্ট হয় যে, তা অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করার উপায় না থাকে, সে ক্ষেত্রে ভ্রান্তির প্রতি দ্ব্যর্থহীন মনোভাব প্রকাশ করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে এবং শক্ত শব্দ প্রয়োগে তার সমালোচনা করা যেতে পারে। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ.) মূর্তি পূজা সম্পর্কে তার

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً اِنِّىْۤ اَرٰىكَ وَ قَوْمَكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থাৎ স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিল; আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি। (সূরা আন্‌আম : ৭৪)

স্বহস্তে নির্মিত মূর্তির উপাসনা যে অসার, তা সকলেই জানেন এবং এরূপ উপাসনাকারীর ভ্রান্তি সকলের কাছেই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান, তাই দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট ভাষায় ইব্‌রাহীম (আ.) তাদেরকে ভ্রান্ত বলেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সমালোচনা কোন মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে না। কারণ, ভ্রান্তিটা সুস্পষ্ট হওয়ায় সমালোচনার ক্ষেত্রে বক্তার বক্তব্যের নতুন কোন আবেদন থাকে না, শুধু বক্তার দ্ব্যর্থহীন মনোভাবই এতে ব্যক্ত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যেখানে ভ্রান্তি এরূপ সুস্পষ্ট নয় সেখানে এক বাক্যে এরূপ দ্ব্যর্থহীন সমালোচনা সমীচীন নয়। স্বয়ং ইব্‌রাহীম (আ.)ই যখন নক্ষত্র পূজার বিপরীতে তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে প্রমাণ পেশ করেছিলেন তখন এক বাক্যে তাদের নক্ষত্র পূজাকে ভ্রান্তি ও গোমরাহী বলে ব্যাখ্যা দেননি, বরং পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে তাদের নক্ষত্র পূজার অসারতা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। যেহেতু নক্ষত্র পূজার অসারতা স্বহস্তে নির্মিত মূর্তি পূজার অসারতার ন্যায় সুস্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান ছিল না, তাই নক্ষত্র পূজার সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি সেটাকে এক বাক্যে ভ্রান্তি না বলে এমন এক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন যাতে জ্ঞানী শ্রোতাদের মন-মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে গঠিত হয়ে সত্য অনুধাবনে প্রবৃত্ত হতে পারে। নক্ষত্র পূজার অসারতা ও অযৌক্তিকতা সাধারণ্যে সুস্পষ্ট না হওয়ার কারণে প্রথম বারেই সে ক্ষেত্রে কঠোর শব্দ প্রয়োগ করলে মনস্তাত্ত্বিক নীতি অনুসারে লোকদের মধ্যে জেদ ও হটকারিতা সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। নক্ষত্র পূজা সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে যে মুনাজারা (বিতর্ক) করেছিলেন, কুরআনে প্রদত্ত তার বিবরণ একবার লক্ষ্য করা যেতে পারে—

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَاۤ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ

অর্থাৎ, অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল, তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, এ-ই আমার প্রতিপালক(?)। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বলল, যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ

করি না। অতপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখল, তখন সে বলল, এ আমার প্রতিপালক(?)। যখন তা-ও অস্তমিত হল, তখন সে বলল, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎ পথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হতে দেখল, তখন সে বলল, এই আমার প্রতিপালক(?), এ সর্ববৃহৎ! যখন তা-ও অস্তমিত হল, তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহর সাথে শরীক কর তার সাথে আমার কোন সংশ্রব নেই। আমি একনিষ্ঠভাবে তার দিকে মুখ ফিরাচ্ছি, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশিরকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَـئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَآ اَكْبَرُ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ.

এখানে লক্ষণীয় যে, নক্ষত্র পূজার অসারতা সাধারণ্যে সুস্পষ্ট না হওয়ার কারণে স্পষ্টভাবে তাদের প্রতি দোষ সম্পৃক্ত করে তিনি বলেননি যে, তোমরা বিভ্রান্ত কিম্বা তোমরা মুশরিক ইত্যাদি। বরং ধীরে ধীরে তিনি সরল ভঙ্গিতে নক্ষত্রের অস্তমিত হওয়া থেকে তার অসহায়তা ফুটিয়ে তুলে প্রমাণ করেছেন যে, এরূপ অসহায় সত্তা উপাসনার যোগ্য হতে পারে না। সর্বশেষে মূল কথাটি ব্যক্ত করার ক্ষেত্রেই বলেছেন আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। যদিও মূল উদ্দেশ্য ছিল একথা বলা যে, তোমরা মুশরিক, অতএব এ থেকে বিরত হও। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক কারণেই তিনি তা বলেননি। দাওয়াতের ক্ষেত্রে পয়গম্বরদের এসব নীতি আমাদের জন্য শাশ্বত নির্দেশনা দান করে থাকে।

১০. মাদঊর যোগ্যতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি

নবী কারীম (সা.) বহু ক্ষেত্রেই অকুণ্ঠচিত্তে মাদঊর যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন আব্দুল কায়ছ গোত্রের প্রতিনিধি দল আগমন করলে

আব্দুল কায়েস দলের নেতা আশাজ্জকে লক্ষ্য করে রাসূল (সা.) বলেছিলেন,

إِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ، اَلْحِلْمَ وَالْاَنَاةَ.

অর্থাৎ তোমার মধ্যে দুটি বিশেষ্য গুণ রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন-ধৈর্য ও গাম্ভীর্য।

উপরোক্ত হাদীছের শুরুতে রয়েছে এই প্রতিনিধি দলটি আগমন করলে রাসূল (সা.) তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। (দ্র. মুসলিম : ১ম খণ্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা)

বলা বাহুল্য-এই অভ্যর্থনা, এই মোবারকবাদ ও এই যোগ্যতার স্বীকৃতি ছিল তাদেরকে প্রীত করার উদ্দেশ্যে এবং যেন তাদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক আনুকূল্য সৃষ্টি হয়।

তাবুকের যুদ্ধে থাকাকালীন ইয়ামানবাসী এক প্রতিনিধি দল রাসূল (সা.)-এর কাছে গমন করলে তাদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছিলেন,

جَاءَ اَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ اَرَقُّ اَفْئِدَةً، اَلْاِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ.

অর্থঃ ইয়ামানের অধিবাসীরা এসেছে। তাদের হৃদয় বড়ই কোমল। ঈমান রয়েছে ইয়ামানবাসীদের মধ্যে, ধর্মীয় প্রজ্ঞা রয়েছে ইয়ামানবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও রয়েছে ইয়ামানবাসীদের মধ্যে। (মুসলিম : ১ম খণ্ড)

রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মাদঊর যোগ্যতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক আনুকূল্য লাভের সুযোগ তিনি অনেক ক্ষেত্রেই গ্রহণ করেছেন। সপ্তম হিজরীর শুরুতে পূর্ব রোমক বা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অধিপতি হেরাক্লিয়াসের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যে পত্র লিখেছিলেন, তার শুরুর কথাগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى...

অর্থাৎ, পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল-মুহাম্মাদ এর পক্ষ থেকে রোমক প্রধান-হেরাক্লিয়াসের প্রতি। যে সরল পথ অবলম্বন করবে তার জন্য শান্তি.........।

এর ব্যাখ্যায় আল্লামা শাব্বির আহমদ উছমানী (রহ.) বলেন, রাসূল

(সা.) হেরাক্লিয়াসকে "রোমক প্রধান" বলে সম্বোধন করেছেন। হেরাক্লিয়াস যেহেতু রোম অধিবাসীদের দৃষ্টিতে এরূপ মর্যাদার উপাধীতে ভূষিত ছিলেন, তাই তাকে এরূপ শব্দে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে করে জানা গেল যে, কোন সম্মানী লোকের সাথে পত্রালাপ বা আলাপ আলোচনা কালে ভাল ও প্রকৃত সম্মান সূচক খেতাব প্রদান ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী নয়। এতে আরও একটি উপকারিতা এই রয়েছে যে, এরূপ করা হলে শত্রু বন্ধু না হলেও অন্ততঃ তার শত্রুতা হ্রাস পাবে। (ফযলুলবারী [শরহে বোখারী] : ১ম খণ্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা)

(তিন) সময় নির্বাচন

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যেনতেন ভাবে দাওয়াত প্রদান করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করা বা দায়সারা গোছের দাওয়াত প্রদান ইসলামের কাম্য নয়। দাওয়াতকে ফলপ্রসু করাই কাম্য। তাই দাওয়াত প্রদানের পূর্বে সময় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কতকগুলো নীতি অবলম্বন অপরিহার্য। সব সময়ই কথা গ্রহণ করার মনোভাব থাকে না, দাওয়াত দিতে গিয়েও তাই এমন সময় নির্বাচন করতে হবে যখন মাদউ বা শ্রোতার মধ্যে কথা বা দাওয়াত গ্রহণ করার মত মানসিক আনুকূল্য লাভ করা যাবে। এই সময় নির্বাচনের পর্যায়ে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

১. সময় ও পরিস্থিতির আনুকূল্য যাচাই করা

নবী কারীম (সা.) দাওয়াত ও শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সময় ও পরিস্থিতি ও শ্রোতার আগ্রহ অনাগ্রহের বিষয়টির প্রতিও অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। হযরত মুআয ইবনে জাবাল ও আবূ মূসা আশআরী (রা.)-কে যখন ইয়ামানে প্রেরণ করেন, তখন তাদেরকে নবী (সা.) যে উপদেশ দিয়েছিলেন-যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বীনকে সহজ বানিয়ে পেশ করবে কঠিন বানিয়ে নয়, লোকদেরকে দ্বীন-এর নিকটবর্তী করবে দূর করবে না– এই উপদেশের মধ্যে অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় খুব দীর্ঘ ও সুক্ষ্ম নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা.)-এর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সাহাবী হযরত আলী (রা.) তার ভাষায় নবী (সা.)-এর এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে বলেন, মানুষের মনের বিভিন্ন আগ্রহ ও ঝোঁক থাকে এবং কখনও সে কথা শোনার জন্য প্রস্তুত থাকে আবার কখনও প্রস্তুত থাকে না। অতএব মানুষের মনের এই আগ্রহ ও ঝোঁক বুঝতে হবে এবং তখনই কথা বলতে হবে, যখন সে শোনার জন্য প্রস্তুত থাকে। কারণ মনের স্বভাব হল যখন তার ইচ্ছার

বিরুদ্ধে কোন কথা তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, তখন সে বেঁকে বসে এবং সে কথা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ফেলে। অপর এক সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত ইকরামা (রা.)-কে উপদেশ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, কখনও যেন এমন না হয় যে, তুমি মানুষের কাছে গেলে এবং তাদেরকে কোন কথাবার্তায় লিপ্ত পেলে আর তুমি তাদের কথার মধ্যে ছেদ টেনে তাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করতে শুরু করলে। এরূপ করলে ওয়াজ-নসীহতের প্রতি তারা বিতৃষ্ণ হবে। বরং এরূপ ক্ষেত্রে তুমি অপেক্ষা করতে থাক, যখন তারা কথা শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করবে কিংবা তাদের হাব ভাবে অনুভব হবে যে, এখন তারা কথা শুনতে প্রস্তুত, তখন তোমার বক্তব্য পেশ কর। (মুহা. রেদওয়ান কাছিমী, তা'লীম ও তারবিয়াত প্রবন্ধ, মাহনামা দারুল উলূম, ১৯৭৪, সেপ্টেম্বর সংখ্যা।)

সময় ও পরিস্থিতির আনুকূল্য যাচাই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, অনেক সময় ও অনেক পরিস্থিতিতে শ্রোতার মধ্যে বিশেষ একটা বিষয় সম্বন্ধে বক্তব্য শ্রবণের আনুকূল্য সৃষ্টি হয়, সে ক্ষেত্রে কথা প্রসঙ্গে নিজের আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরার একটা সুযোগ গ্রহণ করা যায়। যেমন একটা ঘটনা– একদা নবী (সা.) জনৈক ব্যক্তিকে অত্যন্ত অস্থির ও পেরেশান অবস্থায় এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করতে দেখলেন। নবী (সা.) তার অবস্থা দেখে অনুভব করলেন যে, সম্ভবতঃ তার কোন মূল্যবান বস্তু হারিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় লোকটি নবী (সা.)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। মহানবী (সা.) তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তোমার কিছু হারিয়ে গেছে কি? সে বলল, জী, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উট হারিয়ে গেছে। মহানবী (সা.) বললেন, আমার এরূপ মনে হচ্ছিল যে, কুরআনের কোন আয়াত হবে যা তুমি ভুলে গেছ তাই এরূপ হয়রান পেরেশান হয়ে ফিরছ।

আর একটি ঘটনা: জনৈকা রমণীর শিশু হারিয়ে গেল। অস্থির হয়ে সে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করছিল। বিভিন্ন দিক থেকে আগত কাফেলার প্রতিটি সদস্যের কাছে তার শিশুটির সন্ধান জিজ্ঞেস করছিল, কিন্তু প্রত্যেকেই সে সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করছিল। সময় যতই অতিবাহিত হচ্ছিল, রমণীর অস্থিরতা, হতাশা ততই বেড়ে চলছিল। ইতিমধ্যে তার শিশুটিকে সে দেখতে পেল। তার মুখমন্ডলে খুশীর ঝলক খেলে গেল। দৌড়ে গিয়ে সে তার শিশুটিকে বুকে তুলে নিল, একবার বুক থেকে পৃথক করে শিশুটির মুখ

দেখতে থাকল আবার বুকের সাথে চেপে ধরতে লাগল। উপস্থিত সাহাবীগণ ঘটনার অন্তরঙ্গতায় প্রভাবিত হচ্ছিলেন। নবী (সা.) সাহাবীদের অন্তরের অবস্থা উপলব্ধি করলেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা বলত এই রমণী তার সন্তানকে অগ্নিতে ফেলে দিতে পারে কি? সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অগ্নিতে ফেলে দেয়া দূরের কথা সে তো তার কল্পনাও করতে পারে না। একথা শুনে নবী (সা.) বললেন, বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা এর চেয়েও অধিক। তিনি আদৌ চাননা যে, তার বান্দাগণ জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হোক।

এ দু'টি ঘটনা এমন ছিল যেখানে পূর্বে থেকেই মন একটি কথা শ্রবণ ও অনুধাবনের জন্য প্রস্তুত ছিল, আর নবী (সা.) এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরলেন। এভাবে মনের আনুকূল্যকে তিনি একটা আদর্শিক ইতিবাচক প্রবাহে নিয়ে আসলেন।

(২) মাদউকে তার কথাবার্তা ও কাজকর্ম থেকে ফারেগ করে নেয়া

কোন বিষয়বস্তু হৃদয়ে রেখাপাত করার জন্য সেদিকে পূর্ণ মনোযোগিতা নিবিষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। যখন কেউ কোন কথাবার্তা বা কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকে, তখন সে ব্যাপারেই তার মন কাজ করতে থাকে। সেই মুহূর্তে যদি তাকে দাওয়াত দেয়া হয়, তাহলে দাওয়াত তার মনে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। কারণ একই সাথে মানুষ একাধিক বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগিতা নিবদ্ধ করতে সক্ষম হয় না। মনোযোগিতা বলাই হয় একাধিক বিষয় থেকে সরিয়ে এনে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে চেতনাকে সীমাবদ্ধ করা। অন্যভাবে বলা যায়– কোন একটি নির্বাচিত বিষয়কে চেতনার কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসার মানসিক প্রক্রিয়াই হল মনোযোগ। যদিও একই সঙ্গে আমরা কয়েকটি বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে পারি, যখন আমরা কারও সঙ্গে কথা বলি তখন কি কথা বলছি তার প্রতি মনোযোগ থাকে, আবার সামনে কি কথা বলব এবং শ্রোতার মনে আমার কথা কিরূপ প্রতিক্রিয়া করছে ইত্যকার বিষয়াদি সম্পর্কেও আমরা ভাবতে থাকি। এ থেকে মনে হতে পারে যে, মানুষ একই সঙ্গে একাধিক বিষয়ে মনোযোগী হতে পারে। কিন্তু পারতপক্ষে চেতনার কেন্দ্রস্থলে একটি বিষয়ই থাকা সম্ভব। একই সময়ে একটি মাত্র বিষয়েই পূর্ণ মনোযোগী হওয়া সম্ভব। অন্যান্য যে সব বিষয়ে মনঃসংযোগ হয়ে থাকে সেগুলো

চেতনার ক্ষেত্র অধিকার করে থাকলেও চেতনার কেন্দ্রস্থলে স্থান পায় না। ফলে অন্যান্য বিষয়গুলোর প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হওয়া যায় না। ঘরে বসে মনোযোগ সহকারে একটি বই পড়তে থাকলে বাইরের নানা রকম শব্দ, হৈ চৈ ইত্যাদি যদিও কানে এসে ঢোকে, তবুও বইটির প্রতি পূর্ণ মনোযোগী থাকলে পাঠ্য বিষয়টিই চেতনার কেন্দ্রস্থল অধিকার করে থাকবে, ফলে বাইরের শব্দ ও গোলমাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভ হবে না। অতএব বোঝা গেল-একই সময়ে একটি মাত্র বিষয়েই পূর্ণ মনোযোগী হওয়া সম্ভব। কুরআনে কারীমের একটি আয়াতে এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে,

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ.

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি। (সূরা আহ্যাব : ৪)

সুতরাং দাওয়াতের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মাদঊর সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যেই মাদঊকে তার কথাবার্তা এবং কাজ-কর্ম থেকে ফারেগ করে নিতে হবে। বিদায় হজ্জে যখন রাসূল (সা.) ভাষণ শুরু করবেন, তখন হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-কে বললেন, তুমি লোকদেরকে কথাবার্তা থেকে নিবৃত্ত কর। অতঃপর তিনি ভাষণে বললেন, ...। (বোখারী ও মুসলিম)

আল্লামা নববী এ হাদীছ থেকে দাওয়াতের এই নীতি উদ্ভাবন করেছেন যে, আলেম ও ওয়াজকারীর (তথা দাওয়াত প্রদানকারীর) কর্তব্য শ্রোতাদেরকে কথাবার্তা থেকে নিবৃত্ত করে নেয়া, যাতে তারা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তার বক্তব্য শ্রবণ করতে পারে। (কিতাবুল আযকার : ২৮৬ পৃষ্ঠা)

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর বক্তব্য থেকেও কথা বলার পূর্বে মনোযোগ আকর্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। নবী কারীম (সা.)ও আলোচনার পূর্বে বিভিন্ন ভাবে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করে নিতেন। কখনও প্রশ্নের মাধ্যমে শ্রোতার মনোযোগ নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে নিতেন, আবার কখনও কিছুটা অসম্পূর্ণ কথা বলে চুপ করে যেতেন, তারপর যখন শ্রোতাদের মধ্যে অবশিষ্ট কথা শ্রবণের ঔৎসুক্য সৃষ্টি হত তখন সম্মুখে অগ্রসর হতেন। এ দু'টো পদ্ধতির দু'টো উপমা তুলে ধরছি−

একদা রাসূল (সা.) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা জান কি

দরিদ্র কাকে বলে? সাহাবাগণ জওয়াব দিলেন, আমরা দরিদ্র তাকে বলি যার নিকট দেরহাম দীনার (টাকা-পয়সা) নেই। রাসূল (সা.) [এভাবে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার পর] বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত দরিদ্র সে, যে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার নিকট নামায, রোযা ও যাকাত (এর ন্যায় নেক আমলের ভান্ডার) থাকবে, কিন্তু এতদসঙ্গে (তার আমল নামায়) এ-ও থাকবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারও উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, কারও অর্থ আত্মসাৎ করেছে, কারও রক্তপাত ঘটিয়েছে, কাউকে প্রহার করেছে। তখন তার নেকী কিছু এই মাজলূমকে দিয়ে দেয়া হবে, কিছু ঐই মাজলূমকে দিয়ে দেয়া হবে। আর যদি অপরের অধিকারসমূহ আদায়ের পূর্বে তার নেকীসমূহ নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে হকদারদের পাপসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

একদা রাসূল (সা.) ভাষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে মিম্বরে আরোহণ করছিলেন, প্রথম ধাপে পা রেখে বললেন আমীন, দ্বিতীয় ধাপে পা রেখেও অনুরূপ বললেন, তৃতীয় ধাপে পা রাখার সময়ও অনুরূপ আমীন বললেন। এটা ছিল একটা অসম্পূর্ণ কথা এবং এ জাতীয় কথা আর কখনও তিনি বলেননি। তাই সাহাবীদের মধ্যে এরূপ কথা বলার কারণ জানার জন্য ঔৎসুক্য দেখা দিল। ভাষণ থেকে ফারেগ হওয়ার পর মিম্বর থেকে নীচে নেমে আসলে তারা রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমরা মিম্বরে আরোহণের সময় আপনার থেকে এমন একটা কথা শুনলাম যা ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। রাসূল (সা.) সাহাবাদের আগ্রহ এবং মনোযোগ দেখে "আমীন" বলার কারণ ব্যাখ্যা করলেন যে, তখন জিব্রাঈল আমার সম্মুখে ছিলেন, যখন আমি প্রথম ধাপে পা রাখলাম তিনি বললেন ধ্বংস হোক সেই ব্যক্তি, যে রমযানের মোবারক মাস পেল তবুও তার মাগফিরাত হোল না। আমি বললাম আমীন। যখন আমি দ্বিতীয় ধাপে পা রাখলাম তখন তিনি বললেন, ধ্বংস হোক সেই ব্যক্তি যার সম্মুখে আপনার নাম এল আর সে দুরূদ পাঠ করল না। আমি বললাম, আমীন। তারপর যখন তৃতীয় ধাপে আমি পা রাখলাম, তখন তিনি বললেন, ধ্বংস হোক সেই ব্যক্তি, যে তার মাতা-পিতা অথবা উভয়ের কোন এক জনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথচ তাদের খেদমত করে জান্নাত অর্জন করতে পারল

না। আমি বললাম, আমীন।

কখনও কখনও কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনার পূর্বে রাসূল (সা.) কয়েকবার শ্রোতাকে নাম ধরে ডেকে তার পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ পূর্বক বিষয়টি ব্যক্ত করতেন। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, একদা আমি নবী কারীম (সা.)-এর বাহনের পিছনে বসা ছিলাম। আমার ও নবী (সা.)-এর মাঝে হাওদার (উটের পিঠের আসনের) কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া আর কোন ব্যবধান ছিল না। নবী (সা.) বললেন, হে মুআয ইবনে জাবাল! আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বান্দা হাজির; আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। তারপর তিনি কিছু দূর অগ্রসর হয়ে আবার বললেন, হে মুআয ইবনে জাবাল! আমি আরয করলাম, বান্দা আপনার খিদমতে হাজির; আপনার আনুগত্য শিরোধার্য, হে আল্লাহর রাসূল! তারপর তিনি কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আবার বললেন, হে মুআয ইবনে জাবাল! আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! বান্দা আপনার খিদমতে হাজির; আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। তিনি বললেন, তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কি হক রয়েছে? আমি আরয করলাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। নবী (সা.) বললেন, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক এই যে, তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। তারপর কিছুদূর চললেন। নবী (সা.) আবার বললেন, হে মুআয ইবনে জাবাল! আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বান্দা আপনার খিদমতে হাজির; আপনার আনুগত্য শিরোধার্য। নবী (সা.) বললেন তুমি কি জান, এগুলো করলে আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার কি হক আছে? আমি আরয করলাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। নবী (সা.) বললেন, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না।

দাওয়াত কার্যে হতাশা ও স্থবিরতা রোধের মনস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থা পত্র

দাওয়াত কর্মে হতাশা ও স্থবিরতা দেখা দেয়ার কয়েকটি কারণ হতে পারে-

(এক) দাওয়াত কর্মে একটি সময় ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনা সাপেক্ষ কার্য। বহু ক্ষেত্রেই এ কার্যে ত্বরিত ও তাৎক্ষণিকভাবে ইপ্সিত ফল লাভ হয় না। ফলে তাড়াহুড়া গোছের মেজায সম্পন্ন দায়ীর মধ্যে প্রেষণা অপূর্ণ

থাকার কারণে হতাশা ও স্থবিরতা দেখা দিতে পারে।

(দুই) দায়ীকে একটি বিরূপ মন-মানসিকতা সম্পন্ন সমাজের পরিশুদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়। তাই অনেক সময়ই তাকে কায়েমী স্বার্থবাদীদের হুমকি, বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়, হতে হয় অনেকের নিন্দা, তিরস্কার ও সমালোচনার মুখোমুখী। এটাও দায়ীর মধ্যে হতাশা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

(তিন) কখনো বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে লোভ-লালসা বা স্বার্থের আকর্ষণ দ্বারা দায়ীকে তার স্থির লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার অপচেষ্টা চালানো হয়। এসব তিক্ত ও বিড়ম্বনাকর পরিস্থিতির শিকার হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই দায়ীর মধ্যে দাওয়াত কর্মে স্থবিরতা দেখা দিতে পারে কিংবা দৃঢ়তার অভাব দুষ্ট দায়ী আপন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে দাওয়াত কর্মের অব্যাহত গতিতে অবাঞ্ছিত স্থবিরতা সৃষ্টি করতে পারে। ইসলাম দাওয়াত কার্যের সম্ভাব্য এই হতাশা ও স্থবিরতা রোধ কল্পে যে সব মনস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থা পত্র দান করেছে তা নিম্নরূপ–

(১) ত্বড়িৎ ও তাৎক্ষণিক ভাবেই ইপ্সিত ফল লাভ না হতে দেখে অথবা কাজের বাহ্যিক ফলাফল বাঞ্ছিতরূপে লাভ না হওয়ায় যারা হতাশার শিকার হয়ে পড়েন আর এভাবে কাজে স্থবিরতা দেখা দেয়, তাদের এই হতাশা ও স্থবিরতা রোধ কল্পে ইসলাম এই নীতি প্রদান করেছে যে, দায়ী প্রথমতঃ মনে করবে যে, যতটুকু কাজ সে করবে তার ছওয়াব সে পেয়ে যাবে, তার দাওয়াতের ফল দেখা না দেখার উপর তার ছওয়াবকে নির্ভরশীল রাখা হয়নি। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে

الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ،

অর্থাৎ, যে কল্যাণকর্মের পথ দেখায় সে উক্ত কর্ম সম্পাদনকারীর ন্যায় (কল্যাণ ও ছওয়াব লাভ করে থাকে)। [আল-মাকাসিদুল হাছানা]

(২) বাহ্যিক ফলাফল লাভ হওয়া না হওয়ার উপর ব্যক্তির সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল নয় বরং ব্যক্তি কতটুকু কাজ করতে পারল বা পারল না এরই নিরিখে তার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ণিত হবে। হযরত নূহ (আ.) সাড়ে নয়শত বৎসর দাওয়াত দিয়েছিলেন, অথচ তাঁর অনুসারী হয়েছিলেন খুবই অল্প সংখ্যক লোক, তাই বলে কি তিনি ব্যর্থ ছিলেন? কুরআনে কারীমে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে

وَمَآ اٰمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيْلٌ،

অর্থাৎ, তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছিল মাত্র অল্প কয়েকজন। (সূরা হুদ : ৪০)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে এই "অল্প সংখ্যক" বলতে মাত্র ৮০ জন। কারও কারও বর্ণনা মতে মাত্র ১০ জন। (তাফসীরে ইবনে কাছীর)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়-কোন কোন নবীর অনুসারী ছিলেন দশের কম, কোন কোন নবীর অনুসারী মাত্র পাঁচজন এবং কোন কোন নবী এমনও অতিবাহিত হয়েছেন সারা জীবনেও যার একজন অনুসারী হয়নি। কিয়ামতের দিন তিনি একাই উঠবেন। (বোখারী : ২য় খণ্ড, ৯৬৮ পৃষ্ঠা)

অতএব নিজের দাওয়াতের ফলাফল প্রকাশ না হতে দেখে ব্যর্থতা অনুভব করা আদৌ ঠিক নয়। মূলত দাওয়াত প্রদান ও সৎ পথ প্রদর্শন আমার কর্তব্য, মাদঊর সৎ পথ লাভ আমার ইখতিয়ারে নয়-এই থাকবে দায়ীর মানসিকতা। তাহলেই কোন ব্যর্থতার অনুভূতি এবং তার ফলশ্রুতিরূপ-হতাশা ও স্থবিরতা দেখা দিবে না। কুরআনে কারীমে এই মানসিকতা সৃষ্টি কল্পে রাসূল (সা.)কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ.

অর্থ: তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে (তুমি দুঃখিত বা হতাশ হবে না) তোমাকেতো আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি, তোমার কাজতো কেবল প্রচার করে যাওয়া। (সূরা শুরা : ৪৮)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ.

অর্থাৎ, তুমি যাকে ভালবাস (ইচ্ছা করলেই) তাকে সৎ পথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনয়ন করেন। (সূরা কাসাস : ৫৬)

সৎ পথ প্রদর্শনের পর সকলেই যে সৎ পথে আসবে না এটাই স্বাভাবিক। আর এটাকে স্বাভাবিক ভাবতে পারলেই কাঙ্খিত ফল না দেখলেও দায়ীর মনে অস্বস্তিবোধ হবে না, তার দাওয়াত কেউ গ্রহণ করুক বা না করুক সে স্বাভাবিক গতিতেই তার দাওয়াত অব্যাহত রাখতে পারবে। কিছু লোক বিপথে থাকবে এটাই যে স্বাভাবিক এবং আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের অন্তর্ভুক্ত এই মর্মে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে তারা নয়, যাদেরকে তোমার প্রতিপালক দয়া করেন এবং তিনি তাদেরকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছেন। "আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই", তোমার প্রতিপালকের এ কথা পূর্ণ হবেই। (সূরা হুদ : ১১৮-১১৯)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَ لَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থাৎ, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎ পথে পরিচালিত করতাম, কিন্তু আমার এ কথা অবশ্যই সত্য যে, আমি নিশ্চয় জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। (সূরা সাজদা : ১৩)

(৩) যারা বিরোধিতা, ষড়যন্ত্র ও নির্যাতন বা নিন্দা সমালোচনার মুখে মুষড়ে পড়েন, মন ভেঙ্গে বসেন এমনকি ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিপক্ষের জন্য অকল্যাণও কামনা করে বসতে পারেন, তাদের মানসিক স্বস্তির জন্য ইসলাম নিম্নোক্ত মনস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেছে।

(এক) হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব এক চিরাচরিত ও স্বাভাবিক নিয়ম, বাতিলের পক্ষ থেকে বিরোধিতা, ষড়যন্ত্র, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন বা নিন্দা সমালোচনা আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। পৃথিবীর শুরু থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত নবী ও হকপন্থীগণ এসব অবাঞ্ছিত বিষয়ের শিকার হয়ে আসছেন। অতএব এটা চিরাচরিত বিষয়-এরূপ মনে করে নিতে হবে, তাহলে কষ্টবোধ লাঘব হবে। কেননা মানুষ যখন কোন কষ্টকর বিষয়ে অনেককে জড়িত দেখতে পায় তখন তার কষ্টবোধ অনেকটা সাধারণ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কোন রোগীকে যখন বাড়িতে বিছানায় পড়ে কাতরাতে দেখা যায়, তখন ঐ রোগীকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে অন্যান্য অনেককে তার ন্যায় কষ্টে জড়িত দেখে সে নিজেকে অনেকটা হালকা বোধ করতে থাকে। বিভিন্ন ক্লেশকর বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে

মনস্তাত্ত্বিক সান্ত্বনা প্রদানের এই নীতি কুরআন-হাদীছে অনুসৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ রোযা একটা কষ্টকর ইবাদত, এই রোযার বিধান বর্ণনা করে বলা হয়েছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। (সূরা বাকারা : ১৮৩)

অন্যত্র কুরবানীর বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا،

অর্থ: আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি। (সূরা হজ্জ : ৩৪)

অনুরূপভাবে দাওয়াতের অঙ্গনেও নানারূপ বিরোধিতা, ষড়যন্ত্র, নির্যাতন ও নিন্দা-সমালোচনার মুখোমুখী হওয়া স্বাভাবিক। এটা কোন নতুন পরিস্থিতি নয়, সকল নবী ও হক পন্থীরাই এর শিকার হয়েছেন। এটা বোঝানোর জন্য তাই কুরআনে বিভিন্ন নবীদের প্রতিপক্ষের বিরোধীতা, নির্যাতন ও নিন্দা-সমালোচনার শিকার হওয়ার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে দায়ী এটাকে স্বাভাবিক ও সাধারণ মনে করে মানসিক সান্ত্বনা লাভ করতে পারে এবং তার মান, ইজ্জত সব বিসর্জন দেয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি আয়াত তুলে ধরা হচ্ছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ وَ اِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ وَ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ وَ اِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ.

অর্থাৎ, যারা অপরাধী তারাতো মু'মিনদেরকে উপহাস করত এবং তারা যখন মু'মিনদের নিকট দিয়ে যেত, তখন চক্ষু টিপে ইশারা করত এবং যখন নিজেদের আপনজনদের নিকট ফিরে আসত তখন তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে আর যখন তাদেরকে (মু'মিনদেরকে) দেখত, তখন বলত, এরাইতো পথ ভ্রষ্ট। (সূরা মুতাফফিফীন : ২৯-৩২)

وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ..... قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّ مَا نَحْنُ بِتَارِكِيْ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَ مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ. اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْءٍ.

অর্থাৎ, আদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী। ..... তারা বলল, হে হুদ! তুমি আমাদের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন করনি, তোমার কথায় আমরা আমাদের ইলাহদের পরিত্যাগ করছি না এবং তোমাতে আমাদের বিশ্বাস নেই। আমরাতো এই বলি যে, আমাদের ইলাহদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে। (অর্থাৎ, তোমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে।) [সূরা হুদ : ৫০-৫৪]

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ.

অর্থাৎ, তারা বলল, হে শুআয়ব! তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বুঝি না এবং আমাদের মধ্যে তোমাকে আমরা দুর্বলই দেখছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম। আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও। (সূরা হুদ : ৯১)

ইত্যাকার বহু আয়াতে বিভিন্ন নবীর প্রতি তাদের সম্প্রদায়ের নিন্দা ও তিরস্কারের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে- হযরত যাকারিয়া (আ.)-কে এই দাওয়াতেরই কারণে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হয়েছিল, কোন কোন নবীকে জীবন্ত প্রোথিত করে দেয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য-এসব বর্ণনা দায়ীর মধ্যে মনস্তাত্ত্বিকভাবে সান্ত্বনা সৃষ্টি করে থাকে নিঃসন্দেহে।

(দুই) প্রতিপক্ষের থেকে যেসব নির্যাতন, কটুক্তি ও নিন্দা সমালোচনা হয় এটা তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণেই হয়ে থাকে, কেননা তাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের উম্মেষ ঘটলে, তাদের সত্যিকার বোধোদয় হলে তারা

কখনও এহেন আচরণ করত না। কেননা তাদেরই কল্যাণে এই দাওয়াত পরিচালিত হচ্ছে; এমতাবস্থায় তাদের এই বিরূপ আচরণ নির্বুদ্ধিতা বৈ কি? অতএব ওদেরকে নির্বোধ হিসেবে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। দায়ীর মধ্যে যদি এই মনোভাব সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে আঘাত, অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন কোন কিছুই তাকে ক্ষিপ্ত করবে না। নিন্দা, তিরস্কার, কটুক্তি, সমালোচনা কোন কিছুই তাকে হতাশ করবে না বরং তাদের প্রতি করুণাই বৃদ্ধি করবে যে, হায়! ওদের সত্যিকার বোধোদয় হল না, ওরা প্রকৃত জ্ঞানের ছোঁয়া পেল না! মহানবী (সা.) তায়েফে গিয়ে সেখানকার লোকদের দ্বারা নিগৃহীত ও নির্যাতিত হওয়ার পর তাই কাতর কণ্ঠে আল্লাহর দরবারে দু'আ করে বললেন,

اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার (এই অবুঝ) সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান কর, কেননা তাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের উম্মেষ ঘটেনি।

তায়েফ বাসীদের প্রতি ক্ষিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তাদের প্রতি মহানবীর করুণা আরও উদ্বেলিত হয়ে উঠল। এই চেতনা সৃষ্টি হলে যুলুম-নির্যাতন, নিন্দা গালমন্দ কখনো দায়ীকে হতোদ্যম করতে পারবে না বরং নির্যাতন, নিপীড়ন, কটুক্তি, সমালোচনা যতই তীব্র হবে, তাদের প্রতি করুণা ততই বৃদ্ধি পাবে। ফলে দাওয়াতও পূর্বাপেক্ষা জোরালো হতে থাকবে। দায়ী তখন নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাওয়ার মত এক অদম্য স্পৃহা লাভ করবে।

মাদউকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আরও একটা কারণ এই যে, সে প্রতিনিয়ত শয়তানের প্ররোচনার শিকার হয়ে চলছে, শয়তানই তার কুকর্মকে তার কাছে সুন্দর রূপে প্রতিভাত করে দেখাচ্ছে। অতএব তাকে দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত না হয়ে বরং তাকে আরও অধিক বোঝানোর প্রচেষ্টায় রত হওয়া উচিৎ। তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে তার জন্য বদ দু'আর পরিবর্তে বরং তার প্রতি করুণা সিক্ত হয়ে তার জন্য দু'আ করা উচিৎ। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اَلَمْ تَرَ اَنَّآ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ, তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আমি কাফেরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে বিশেষভাবে

تَؤُزُّهُمْ اَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ.

(মন্দ কর্মে) উৎসাহিত করে। সুতরাং তাদের জন্য তাড়াহুড়া (করে আযাবের দরখাস্ত) করোনা। (সূরা মারয়াম : ৮৩-৮৪)

অন্য আয়াতে আদ ও ছামূদ গোত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ كَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ.

অর্থ: শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং তাদেরকে সৎ পথ অবলম্বনে বাঁধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ। (সূরা আনকাবূত : ৩৮)

(তিন) নিন্দা, সমালোচনা, কটুক্তি, নির্যাতন, নিপীড়ন যারই সম্মুখীন হতে হয় দায়ীকে, এসব কিছুরই বিনিময়ে রয়েছে তার জন্য অফুরন্ত পুরস্কার। প্রতিকুলতার মুখে ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারলে সেই ধৈর্যের বিনিময়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে অফুরন্ত নেয়ামত সমৃদ্ধ জান্নাত। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ

অর্থাৎ, আর সবর; তার পুরস্কার জান্নাত।

মহা পুরস্কারের এই বিশ্বাস যদি দায়ীর অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়, তাহলে প্রতিকূলতা দেখে সে কর্মে ক্ষ্যান্ত দিবে না, নিন্দা তিরস্কার ও সমালোচনার মুখে সে কুন্ঠিত হবে না, নির্যাতন নিপীড়ন কোন কিছুই তাকে হতোদ্যম করতে পারবে না। ভবিষ্যত ফসল প্রাপ্তির আশায় কৃষক যেমন রোদ, বৃষ্টি, ঝড় অকাতরে সয়ে যায়, সুস্থতা লাভের বাসনায় রোগী যেমন তিক্ত বিস্বাদ ঔষধ স্মিত চিত্তে গলাধকরণ করতে দ্বিধাবোধ করে না, সুন্দর ফুটফুটে একটি সন্তানের নতুন মুখ দর্শনের স্বপ্নে জননী যেমন গর্ভধারণের কষ্টে আবেগ উৎফুল্লতা বোধ করে, তেমনিভাবে অনন্ত অফুরন্ত পুরস্কারের বিশ্বাস দায়ীর মধ্যেও সব প্রতিকূলতা বরদাশত করার এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি সৃষ্টি করবে। যুলুম নির্যাতন, নিপীড়ন সয়ে যাওয়ার মধ্যে সে এক পুলক অনুভব করতে থাকবে। হতোদ্যম ও স্থবিরতা রোধের এ এক অনন্য মনস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপত্র।

(৩) দায়ীর সামনে যখন স্বার্থের হাতছানি দেখা দেয়, লোভ-লালসা যখন তার দৃঢ়তায় চিড় ধরাতে চেষ্টা করে, শয়তানী কুমন্ত্রণা নাফরমানী ও খাহেশাত যখন তার মানসপটে পদার্থকে লোভনীয় করে তোলে, তখন

মনস্তাত্ত্বিক ভাবে তাকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, দায়ীকে তখন আল্লাহ প্রদত্ত মহান মর্যাদার আসন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে; দুনিয়ার হেয়তা, পদার্থের তুচ্ছতা, সম্পদ ঐশ্বর্যের নগন্যতা, পক্ষান্তরে আল্লাহ প্রদত্ত পুরস্কারের শাশ্বত্ব ও অনন্যতা সম্পর্কিত অনুভূতি অন্তরে জাগ্রত করে তুলতে হবে।

মির্জা মুজহের জানে জানাঁ-কে যখন দিল্লীর সম্রাট এই মর্মে প্রস্তাব পাঠান যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই বিশাল রাজত্ব দান করেছেন হুজুর অনুগ্রহ পূর্বক এর থেকে কিছু গ্রহণ করুন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে সপ্ত ভুখন্ডকে مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ (পার্থিব জগতের ভোগ্য উপকরণ অতিকিঞ্চিত) বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেখানে আপনার অধিকারভুক্ত এক ভূখন্ডের একাংশ আবার তেমন কি হতে পারে, যার দিকে এই ফকীরকে লালসার হাত প্রসারিত করতে হবে? (তালিবানে উলূমে নবুওয়াত কা মাকাম...)

হযরত সুলায়মান (আ.) যখন রাণী বিলকীসের কাছে দাওয়াতী পত্র প্রেরণ করেন এবং রাণী বিলকীস সুলায়মান (আ.)-এর হাক্কানিয়াতকে পরীক্ষা করার জন্য হাদিয়া উপঢৌকন প্রেরণ করেছিল, তখন সুলায়মান (আ.) তার জবাবে বলেছিলেন,

اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ اٰتٰنِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰكُمْ.

অর্থঃ তোমরা ধন-সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। (সূরা নাম্ল : ৩৬)

আপনার সম্পদ ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এই স্বকীয়তার অনুভূতি, এই আত্মমর্যাদাবোধ দায়ীর সামনে বিস্তৃত লালসার প্রসারিত হাতকে গুড়িয়ে দিবে। বরং তার সামনে যেন এরূপ হস্ত প্রসারিত হতে না পারে, এরূপ মানসিক বিড়ম্বনার সম্মুখীন যেন তাকে হতে না হয়, সে জন্য প্রথম থেকেই তাকে যেমন নিঃস্বার্থ মনোভাব নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে তেমনিভাবে প্রতিপক্ষকে একথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান আমাদের চাওয়ার নেই। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) তাই দাওয়াতের সময় উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতেন—

لَا اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ

অর্থাৎ, আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান কামনা করিনা,

اَجْرِیَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ.

আমার প্রতিদানতো রয়েছে আল্লাহ্‌র নিকট।

কুরআনে কারীমের বহু সংখ্যক আয়াতে বিভিন্ন নবীদের দাওয়াত প্রসঙ্গে একথা উল্লেখিত হয়েছে। নবীদের উসওয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্যেইতো প্রযোজ্য।
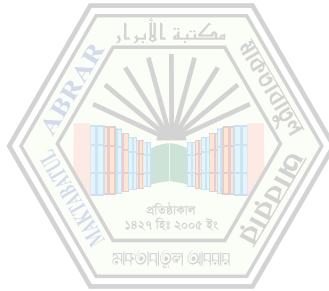
চতুর্থ অধ্যায়
ইবাদত মনোবিজ্ঞান
(Worship Psychology)

ইবাদতের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করার পদ্ধতি

ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে মানুষের জীবনের সবকিছু আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করাকে বলা হয় ইবাদত। আর কারও উঠা-বসা, চলা-ফেরা, আচার-আচরণ ইত্যাদি সবকিছুকেই একটা বিধিবদ্ধ নিয়মের অধীনে আনতে গেলে এর জন্য পূর্বাহ্নে তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। কেননা কারও বদ্ধমূল মানসিকতাই তার সবকিছুকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অতএব কারও থেকে ইবাদত আদায় করতে হলে তাকে এর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে। ইবাদতের জন্য কাউকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার যে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিগুলো রয়েছে তা হল–

১. ঈমান আকীদা ঠিক করা

আকীদা-বিশ্বাস মূলত মানুষের কর্মনীতি নির্ধারণ করে। মন হচ্ছে মানুষের পরিচালিকা শক্তি, এই মনের আকীদা-বিশ্বাস যেমন হবে, সেভাবেই মানুষ পরিচালিত হবে। ইসলাম তাই ইবাদতের পূর্বে ঈমান-আকীদার তা'লীম দিয়েছে। বিধর্মীকে দাওয়াত প্রদানের বেলায়ও প্রথমে ঈমানের দিকে দাওয়াত প্রদানের নীতি রাখা হয়েছে। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় রাসূল (সা.) কাফেরদেরকে প্রথমে ঈমানের দিকে তারপর ঈমান গ্রহণ করলে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ইবাদতের দিকে দাওয়াত প্রদানের নীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। দাওয়াত অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. মা'বূদের মধ্যে ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা ও গুণাবলী সম্পর্কে ধারণা প্রদান

ইবাদত অর্থ দাসত্ব এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আনুগত্য করা। কেউ কারও এরূপ দাসত্ব ও আনুগত্য তখনই করবে যখন সে জানবে যে, সেই আমার সব। আমার অস্তিত্ব, আমার জীবন-মরণ সবই তার নিকট দায়বদ্ধ,

আমার সব প্রয়োজন সেই পূর্ণ করতে সক্ষম, তাকে ছাড়া আমার কোন উপায়ন্তর নেই। অতএব তার দাসত্ব, তার নির্দেশের আনুগত্য বৈ কোন গত্যন্তর নেই। সামান্য এক অবলা প্রাণী-কুকুর যখন বোঝে যে, আমার মুনীব আমার আহার যোগান দিয়ে থাকেন, তখন সে মুনীবের কিভাবে আনুগত্য করে তা আমরা সকলেই জানি। আল্লাহ্ তা'আলা এক আয়াতে ইবাদতের নির্দেশ দেয়ার পর তাই উল্লেখ করেছেন যে, তোমরা যে সত্তার ইবাদত করবে তিনি তোমাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি তোমাদের লালন-পালন করেন এবং তোমাদের লালন-পালনের জন্য জীবিকা সরবরাহ করেন আর তোমাদের বসবাসের জন্য পৃথিবীকে উপযোগী বানিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ.

অর্থাৎ, হে মানুষেরা! তোমরা ইবাদত কর তোমাদের প্রতিপালকের, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা (জাহান্নাম থেকে) রক্ষা পাও। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ বানিয়েছেন। আর তোমাদের জীবিকার জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তার দ্বারা সব রকম ফসল উৎপন্ন করেন। (সূরা বাকারা : ২১-২২)

৩. যার ইবাদত করা হবে তার নিঃস্বার্থতা প্রমাণ

কোন নির্দেশ প্রদানকারী যখন স্বার্থহীন প্রমাণিত হয় এবং এটা জানা থাকে যে, এই নির্দেশের মধ্যে তার কোন স্বার্থ নিহিত নেই বরং এটা মান্য করার মধ্যে আমারই কল্যাণ নিহিত, তখন সে নির্দেশ মান্য করতে এবং সে নির্দেশ দাতার আনুগত্য করতে সকলেই উদ্বুদ্ধ হয় এবং দ্বিধা সংকোচহীন চিত্তে সে নির্দেশ পালনে এগিয়ে আসে। আল্লাহ তা'আলা ইবাদতের প্রসঙ্গ উল্লেখের পর তিনি যে কোন স্বার্থ পোষণ করেন না তা বর্ণনা করে এভাবে ইবাদতের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّ مَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ.

অর্থাৎ, আমি জিন ও ইনছানকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের থেকে কোন জীবিকা পাওয়ার ইচ্ছা রাখি না। তারা আমার আহার্য সরবরাহ করবে এ ইরাদাও আমার নেই। (অর্থাৎ, কোনভাবে এতে আমার স্বার্থ নেই)। (সূরা যারিয়াত : ৫৬-৫৭)

রাসূল (সা.)ও দ্বীনী কথা পেশ করার পশ্চাতে তার কোন স্বার্থ নিহিত নেই তা ব্যক্ত করে বলেছেন,

وَيَاْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ.

অর্থাৎ, তোমাদের নিকট এমন ব্যক্তি (রাসূল [সা.]) সংবাদ এনে দেয় যাকে তোমরা পাথেয় প্রদান কর না। (অর্থাৎ, সে কোন বিনিময়ের প্রত্যাশী নয়।)

৪. কোন বিধান সাধ্যাতীত নয়-এই বিশ্বাস প্রদান করাঃ

সাধ্যের অতীত কোন কাজ করতে কেউ মানসিকভাবে প্রস্তুত হয় না। পক্ষান্তরে অসাধ্য নয়, অসম্ভব নয়-এরূপ বুঝতে পারলে কঠিন কিছুও মানতে মানুষ প্রস্তুত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাই শরীআতের সব বিধান সম্পর্কে বলেছেন,

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতীত কোন কিছুর চাপ দেন না। (সূরা বাকারা : ২৮৬) অর্থাৎ, যা কিছু মানুষকে বিধান দেয়া হয়েছে সবই তার সাধ্যের মধ্যে রয়েছে।

৫. মানুষের বিবেচনা চূড়ান্ত বিবেচনা নয়-এই তত্ত্বে বিশ্বাস করানো

ইবাদত-বন্দেগী, শরীআতের বিধি-বিধান ও নিয়ম-পদ্ধতি কোন্টা গ্রহণযোগ্য কোন্টা গ্রহণযোগ্য নয়, কোন্টা ভাল কোন্টা মন্দ-এই বিবেচনার ভার মানুষের উপর ছেড়ে দেয়া হলে অনেকেই অনেকটা মানার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হত না। তখন যে যেটাকে তার বিবেচনায় ভাল মনে করত না সেটা মানার জন্য সে তার মনকে প্রস্তুত করতে পারত না।

ইসলাম তাই বলেছে, তোমাদের ভাল-মন্দ বিবেচনা চূড়ান্ত সঠিক নাও হতে পারে। হয়ত কোন ভালটাকেই তোমরা মন্দ মনে করে বসবে কিম্বা কোন মন্দটাকেই ভাল ভেবে ভুল করবে। তাই আল্লাহ্‌র দেয়া বিধি-বিধান তোমাদের বিবেচনায় যেমনই হোক সেগুলোকে চূড়ান্তভাবে ভাল এবং গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিতে হবে। তোমাদের এক্ষেত্রে বিবেচনাকে মাপকাঠি বানানো যাবে না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় খারাপ মনে হবে অথচ তোমাদের জন্য তা ভাল। আবার কোন একটা বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় মনে হতে পারে অথচ তোমাদের জন্য তা খারাপ। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন, যা তোমরা জান না। (সূরা বাকারা : ২১৬)

ইবাদতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির উপায়

কোন কাজের লাভ ও উপকারিতাই হল উক্ত কাজের আকর্ষণ। কোন কাজে কেউ কোন লাভ বা উপকারিতা খুঁজে না পেলে তাতে সে আকর্ষণ বোধ করে না। আর কোন কাজে আকর্ষণ বোধ করলে তা যত কঠিন ও কষ্টকরই হোক না কেন অবলিলায় তা করতে মানুষ অগ্রসর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে উপকারিতা সম্মুখে না থাকলে সামান্য কাজেও কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অগ্রসর হয় না বা অগ্রসর হওয়ার মনোভাব জাগ্রত হয় না। ইসলাম ইবাদতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য তাই ফাযায়েলের বিরাট অধ্যায় রেখেছে, যা ইবাদত ও আমলের প্রতি মানুষকে আকর্ষিত করে থাকে। ইবাদত ও আমল পরিত্যাগ করলে যে বিভিন্ন শাস্তির কথা কুরআন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে তার মাধ্যমেও মানুষ ইবাদত ও আমল পরিত্যাগ না করার প্রতি আকর্ষিত এবং পরিত্যাগ করার প্রতি বিকর্ষিত হয়ে থাকে। অতএব এ অধ্যায়টিও প্রকারান্তরে ইবাদত ও আমলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকরণ প্রক্রিয়ারই একটি অংশ।

ইবাদতে স্বতঃস্ফূর্ততা সৃষ্টির উপায়

যে ক্ষেত্রে মানুষের করা না করা উভয়টার ক্ষমতা থাকে সেটা মানুষ করে থাকে স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে। পক্ষান্তরে বিপরীতটা করার ক্ষমতা না

থাকলে তখন সে কাজে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা আসে না। আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃত কাজেরই মূল্যায়ন হয়ে থাকে। জিন ও ইনছান ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য সব কিছুও আল্লাহ্‌র ইবাদত তথা আনুগত্য করে থাকে, কিন্তু ফেরশতাদের মধ্যে বিপরীতটা করার ক্ষমতা নেই বিধায় তাদের ইবাদতের ঐ মূল্যায়ন নেই যা জিন ও ইনছানের ইবাদতের রয়েছে। কেননা জিন ও ইনছানের মধ্যে বিপরীতটা করার ক্ষমতা রয়েছে, এতদস্বত্ত্বেও যখন তারা ইবাদত করবে সেটা হবে স্বতঃস্ফূর্ত-বাধ্যগত নয়, সে মতে তাদের ইবাদতও অধিক মূল্যায়নের যৌক্তিকতা রাখে।

ইবাদতে মনোযোগিতা নিবদ্ধ করার পদ্ধতি

১. প্রেষণা (Motives)

কোন বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ কতটা নিবদ্ধ হবে, মনোযোগ কতটা আকৃষ্ট হবে তা নির্ভর করে ঐ বস্তুর প্রতি আমাদের আভ্যন্তরীণ তাগিদ এবং আগ্রহ ইত্যাদির উপর। অতএব ইবাদতে মনোযোগিতা সৃষ্টির জন্য প্রথমে সংশ্লিষ্ট ইবাদতের গুরুত্ব মনে বদ্ধমূল করতে হবে এবং তার লাভ ও উপকারিতা কি তা মনে উপস্থিত করে তার প্রতি প্রেষণা ও আগ্রহকে জাগ্রত করতে হবে।

২. প্রস্তুতি ও প্রত্যাশা (Set and expectancy)

মনোযোগের একটি শর্ত হল প্রস্তুতি ও প্রত্যাশা। যে জিনিসের প্রতি আমাদের মানসিক প্রস্তুতি ও প্রত্যাশা যতখানি হবে তার প্রতি আমাদের মনোযোগও ততখানি নিবদ্ধ হবে। তাই দেখা যায়– কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া দৌড়ে এসে তাড়াহুড়া করে নামাযে দাঁড়ালে সেই নামাযে ততখানি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় না, যতখানি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় ধীরে সুস্থে উযূ করে ধীরে সুস্থে এসে নামাযে দাঁড়ানোর দু'আ পড়ে নামায শুরু করলে। পূর্বে থেকে নামাযের ওয়াক্ত আসার পর নামায পড়ার প্রত্যাশায় অপেক্ষমান ব্যক্তির নামায যতটা মনোযোগিতার সাথে হবে, ততটা হবে না একজন লোককে হঠাৎ ধরে নামাযে দাঁড়িয়ে দিলে। ইসলামে তাই নামাযের ওয়াক্ত আসার পূর্বেই উযূ ইত্যাদি সেরে নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকাকে মুস্তাহাব করা হয়েছে। শা'বান মাস থেকেই রমযানের রোযা রাখার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করার নীতি রাখা হয়েছে। এসব নীতির পশ্চাতে ইবাদতে মনোযোগিতা নিবদ্ধ হওয়ার ফায়দাও নিহিত রয়েছে।

৩. স্বশব্দে পাঠ ও স্বকর্ণে শ্রবণ

নামাযে যা কিছু পাঠ করা হয় তা যদি শব্দহীনভাবে পাঠ করা হয় তাহলে নামাযের বাইরের অন্য কোন শব্দ কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে মনোযোগিতা অন্য দিকে বিচ্যুত করে দিতে পারে। তাই অধিকতর সহীহ মতানুসারে নামাযের কিরাত ও অন্যান্য দু'আ দুরূদ ইত্যাদি এতটুকু শব্দে পাঠ করতে বলা হয়েছে যা নিজের কানে শ্রবণ করা যায় এবং মুক্তাদী হলে মনোযোগ সহকারে ইমামের কিরাত শ্রবণ করা জরুরী করে দেয়া হয়েছে। এভাবে নামাযের মনোযোগিতা বিচ্যুত হওয়ার পথ কিছুটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ইমামের কিরাত উৎকর্ণ হয়ে শ্রবণ করার নির্দেশ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াত থেকে–

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ،

অর্থাৎ, যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন উৎকর্ণ হয়ে তা শ্রবণ কর। (সূরা আ'রাফ : ২০৪)

৪. দৃষ্টি নির্দিষ্ট স্থানে নিবদ্ধ রাখা

নামাযে এক এক রুকনের মধ্যে এক এক স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাকে মুস্তাহাব করে দেয়া হয়েছে এবং এদিক সেদিক দৃষ্টি ফিরানোকে মাকরূহ বা খেলাফে আওলা (অনুত্তম) করে দেয়া হয়েছে। কেননা অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করলে নামাযের বাইরের উদ্দীপক দৃষ্টির মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নামায থেকে মনোযোগিতাকে বিচ্যুত করে দিতে পারে। নামাযে এদিক সেদিক দৃষ্টি ঘুরালে মনোযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার এ বিষয়টির দিকে নিম্নোক্ত হাদীছে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلٰوةِ الْعَبْدِ. (متفق عليه)

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নামাযে এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "এটা হল নামাযকে ছিনিয়ে নেয়া। এভাবে শয়তান বান্দার নামাযকে ছিনিয়ে নেয়।" (বোখারী ও মুসলিম)

৫. মোরাকাবা

কোন দাস-দাসী ও কর্মচারী যখন বুঝতে পারে যে, মুনীব তার কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করছেন, তখন সে মনোযোগিতার সাথে কাজ করে

থাকে। তদ্রূপ নামায ইত্যাদি ইবাদতের মধ্যে যখন এই চিন্তা করা হবে যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন, আমার নামায আমার ইবাদত সুন্দর হচ্ছে কি-না তা তিনি প্রত্যক্ষ করছেন, তখন তার নামায ও ইবাদত সুন্দর হবে এবং অমনোযোগিতা দূর হবে। আল্লাহ আমাকে দেখছেন এই ধ্যানকে বলা হয় মোরাকাবা। হাদীছে এরূপ ধ্যানের সাথে ইবাদত করার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে,

أُعْبُدُوا اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ،

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর এমনভাবে, যেন তুমি তাকে প্রত্যক্ষ করছ। বস্তুত তুমি তাকে প্রত্যক্ষ করতে না পারলেও তিনি তো তোমাকে প্রত্যক্ষ করছেন। (বোখারী ও মুসলিম)

৬. আরও কয়েকটি বিষয়ের ভাবনা

মনোযোগ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হতে থাকে-এই মুহূর্তে যে বিষয়টি মনোযোগের কেন্দ্রে রয়েছে পর মুহূর্তে সেখানে অন্য বিষয় চলে আসে এবং আগেরটি মনোযোগের প্রান্তে বা একটু পরে হয়ত চেতনার সম্পূর্ণ বাইরে চলে যায়। তাই আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে অনেক্ষণ ধরে একটি বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে পারি না। তাই পূর্বে নামাযে মনোযোগিতা নিবদ্ধ রাখার জন্য যে বিষয়গুলো চিন্তায় রাখার কথা বলা হয়েছে মনোযোগিতার নিয়ত পরিবর্তনশীলতার ফলে সে কয়েকটি বিষয় এড়িয়েও মনোযোগিতা অন্যত্র চলে যেতে পারে। সেমতে আরও কয়েকটি বিষয় চিন্তায় আনার কথা বলা হয়েছে, যাতে চিন্তা আবর্তিত করার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয় এবং তবুও যেন মনোযোগিতা বিচ্যুত হয়ে নামায সংক্রান্ত বিষয়ের বাইরে চলে যেতে না পারে। এরূপ অন্য যে বিষয়গুলো চিন্তায় আনা যায় তার মধ্যে রয়েছে-

(এক) এই ভাবা যে, এটাই হয়ত আমার শেষ নামায, আর হয়ত কোন নামায পড়ার সুযোগ আমার হবে না। এরূপ ভাবনা নামাযকে সুন্দর করার জন্য চেতনাকে কেন্দ্রভূত রাখতে সহায়ক হবে। কেননা শেষ সুযোগকে কেউ হেলায় হাত ছাড়া করে না।

(দুই) বুযুর্গানে দ্বীন অনেকে নামাযের মধ্যে এই চিন্তা করতেন যে, কা'বা আমার সম্মুখে, আমি পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে আছি, আমার ডানে জান্নাত আর বামে জাহান্নাম, আজরাঈল আমার মাথার উপর দন্ডায়মান। এরূপ নাজুক মুহূর্তের ভাবনা মনোযোগ অন্যত্র বিচ্যুত হতে দেয় না।

(তিন) এই চিন্তা ভাবনা রাখা যে, নামাযের প্রত্যেকটি রুকন এবং প্রত্যেকটা আমল সহীহভাবে মাসায়েল অনুসারে আদায় হচ্ছে কি-না।

(চার) নামাযে যা কিছু পাঠ করা হয় তার অর্থের দিকে খেয়াল করা।

ইবাদত করতে কষ্টবোধ হওয়ার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকার

নামায, রোযা, জেহাদ ইত্যাদি বহু ইবাদত আছে যা করতে কষ্টবোধ হয়ে থাকে। অবশ্য যে কোন কষ্টকর কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর কষ্টবোধ থাকে না, সেটা তখন স্বাভাবিক বোধ হতে থাকে। অভ্যাসে পরিণত হওয়ার আগ পর্যন্ত যে কষ্টবোধ হবে তার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকার হল অনুরূপ কষ্ট আরও অনেকে করে থাকে- একথা স্মরণ করা। এরূপ স্মরণ করলে কষ্টবোধ কমে যায়, কেননা কোন কষ্টকর কাজে আরও অনেককে শরীক দেখলে কষ্টবোধ হ্রাস পেয়ে থাকে। এজন্যেই কোন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ঘরে থেকে যতটা কাতরায় এবং অস্থিরতা প্রকাশ করে, হাসপাতালে তাকে ভর্তি করে দেয়া হলে অন্য আরও রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে যেয়ে সে তখন অনেকটা শান্ত হয়ে যায়। একই কারণে ঘরে থেকে একাকী নামায পড়লে যতটা কষ্টবোধ হয় মসজিদে গিয়ে বা অন্যত্র জামাআতে নামায পড়লে ততটা কষ্টবোধ হয় না। রোযা রাখতে কষ্টবোধ হয়ে থাকে, এ কষ্টবোধ হ্রাস করার জন্য কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে যে, রোযা অন্যান্য উম্মতের উপরও ফরয ছিল শুধু তোমরা নও সকলেই রোযা রেখে আসছে, তাহলে কষ্টবোধ করার কি আছে? ইরশাদ হয়েছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল। (সূরা বাকারা : ১৮৬)

এ আয়াতে পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর রোযা ফরয হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে যেমন রোযার বিশেষ গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে, তেমনিভাবে এর দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান তথা কষ্টবোধকে লাঘব করাও উদ্দেশ্য। নামায সম্পর্কেও অনুরূপ তথ্য প্রদান করা হয়েছে যে, তা অন্য উম্মতের উপরও ফরয ছিল।

ওহুদ যুদ্ধে যখন সত্তর জন সাহাবী শহীদ হন এবং অনেকে আহত হন, তখন সাহাবীদেরকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য এই মর্মে আয়াত নাযিল

হয় যে, অনুরূপ অবস্থা প্রতিপক্ষেরও হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়ের কারণে মুসলমানদের মনে যে কষ্টবোধ হয়েছিল সে প্রসঙ্গেও আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, পরাজয় অন্যদেরও হয়ে থাকে, জয় পরাজয় এটাতো আবর্তিত হয়ে থাকে। যে আয়াতে এ দু'টো বিষয় উল্লেখ করা হয় সে আয়াতটি এই–

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ وَ تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ.

অর্থাৎ, যদি তোমরা আহত হয়ে থাক, তাহলে তারাওতো (প্রতিপক্ষওতো) তেমনি আহত হয়েছে। আর এদিনগুলো (অর্থাৎ, জয় পরাজয়) আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তিত করে থাকি। (সূরা আলে-ইমরান : ১৪০)

ওহুদের যুদ্ধে এক সময় রাসূল (সা.)-এর মৃত্যুর (ভুয়া) সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সাহাবীদের মনে যে কষ্টবোধ দেখা দেয় এবং তার কারণে তাদের দিশেহারা হওয়ার উপক্রম হয়, তখন তাদেরকে শান্ত করার জন্য আয়াত নাযিল করা হয়, তাতে বলা হয়– মুহাম্মাদতো একজন রাসূল, তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন, তারাও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। অতএব রাসূলের মৃত্যু জনিত মনঃকষ্টের সম্মুখীন শুধু তোমরা হওনি পূর্ববর্তীরাও হয়েছে। সুতরাং তোমরা শান্ত হও, সম্বিত ফিরিয়ে আন। আয়াতটি এই–

وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ.

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো নয়। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি সে মৃত্যু বরণ করলে কিম্বা আহত হলে তোমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে? (সূরা আলে-ইমরান : ১৪৪)

পঞ্চম অধ্যায়

আচরণ মনোবিজ্ঞান
(Behaviour psychology)
(সমাজ সামাজিকতা ও শিষ্টাচার বিষয়ক)

মানুষের পারস্পরিক আচার-ব্যবহার সমাজ-সামাজিকতা তথা উঠা-বসা চলা-ফেরা, সালাম-কালাম, কথা-বার্তা, সৌজন্য-বিনিময় ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালাসমূহ অত্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক। আমরা অনেকেই মনে করি ইসলামের বিষয়গুলো গুরুত্বহীন কিম্বা এগুলো সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট নীতিমালা অনুপস্থিত। তাতে আবার মনস্তাত্ত্বের ভূমিকাও রয়েছে তাতো একেবারেই আমাদের কল্পনাতীত। এ অধ্যায়ের আলোচনা সমাপ্তির পরই আমরা বুঝব আমাদের এ ধারণাগুলো কতখানি ভুল এবং অধ্যায়টির বিষয়গুলো আদ্যোপান্ত পাঠ করার পর সকলেই এই স্বীকৃতি দিতে হবে যে, সমাজ-সামাজিকতা ও শিষ্টাচার সম্পর্কে ইসলাম প্রদত্ত এই নীতিমালা যারপরনাই সুন্দর, অত্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক এবং খুবই বিন্যস্ত ও সুবিস্তৃত।

(এক) কাউকে বিড়ম্বনায় না ফেলা কাউকে অপ্রস্তুত না করা

কথা-বার্তা, আচার-আচরণ কিংবা ভাব-ভঙ্গি দ্বারা কেউ বিড়ম্বনায় পড়তে পারে কিংবা কেউ অপ্রস্তুত হতে পারে ইসলামে এরূপ নীতি পরিত্যাজ্য। তাই ইসলামে নীতি দেয়া হয়েছে–

(ক) গৃহে বা মজলিসে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ

গৃহে বা মজলিসে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় হুট করে কারও গৃহে প্রবেশ করলে ভেতরের লোক বা লোকজন যদি কোন লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে থাকে তাহলে তারা অত্যন্ত অপ্রস্তুত হবে কিংবা অপরিচিতের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শংকা বা উৎকণ্ঠায় পড়বে। কিংবা মজলিসের বা ঘরের লোকজন এমন কোন বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত থাকতে পারে যাতে আগন্তুকের অন্তর্ভুক্তি অবাঞ্ছিত মনে হতে পারে। এমতাবস্থায় বিনা অনুমতিতে আগন্তুকের প্রবেশ ঘটলে তারা আলোচনা চালিয়েও যেতে পারবে না আবার বিষয়ান্তর পূর্বক কালক্ষেপন করাতেও তাদের অসুবিধে থাকতে পারে। ফলে তাদের জন্য এটা হবে

এক মানসিক অস্বস্তি ও বিড়ম্বনাকর পরিস্থিতি। ইসলামে তাই অনুমতি গ্রহণের নীতি রাখা হয়েছে। বিশেষভাবে যেসব মুহূর্তে মানুষ গৃহাভ্যন্তরে নিরাভরণ থাকতে পারে, সেই মুহূর্তগুলোতে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَ حِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ.

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ, তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি, তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময় অনুমতি গ্রহণ করে -ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে-যখন তোমাদের পোষাক খুলে রাখ তখন-এবং ইশার নামাযের পর। এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। (সূরা নূর : ৫৮)

এখানে লক্ষণীয় যে, মালিকানাভুক্ত দাস-দাসী যাদের সর্বদা ঘরে যাতায়াত করতে হয় তাদেরকেও যখন অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তখন অন্যদের বেলায়তো তা আরও বেশী গুরুত্ব রাখে। অন্য এক আয়াতে সকলকে এই বিধানের শামেল করে বলা হয়েছে,

يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

অর্থ: হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ কর না, যে পর্যন্ত (প্রবেশের) অনুমতি গ্রহণ না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (সূরা নূর : ২৭)

(খ) মেজবান বা মেহমান যাতে বিড়ম্বনা বোধ করে

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) মেহমানের পালনীয় আদব সম্পর্কে কতকগুলো বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন, যার অন্যথা হলে মেজবান মানসিক বিড়ম্বনায় পড়ে থাকে। কুরআন ও হাদীছের আলোকে তিনি এসব নীতিমালা চয়ন করেছেন। "আদাবুল মুআশারাত" গ্রন্থে বর্ণিত উক্ত নীতিমালার আলোকে বলা যায়

(১) কারও গৃহে পূর্ব অবগতি ব্যতীত খাওয়ার সময় মেহমান রূপে উপস্থিত হওয়া সমীচীন নয়। কারণ, গৃহকর্তার কাছে তখন আপ্যায়নের মত কিছু ব্যবস্থা না থাকলে তিনি লজ্জিত হবেন এবং মেহমানদারী না করতে পারায় মানসিকভাবে পীড়িত হবেন কিম্বা নিজেদের খাবার মেহমানকে দিয়ে নিজেরা অভুক্ত থেকে মনস্তাপে ক্লিষ্ট হবেন।

(২) ক্ষুধা না থাকা, রোযাদার হওয়া, কিম্বা অন্য কোন কারণে খাওয়ার প্রয়োজন বা ইচ্ছা না থাকলে তৎক্ষণাৎ মেজবানকে সে সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। কোন খাদ্য-খাবার ও আপ্যায়ন সামগ্রি প্রস্তুত হওয়ার পর সেটার প্রতি অনিচ্ছা ব্যক্ত করলে অহেতুক অন্য খাদ্য-খাবার জোগাড় গোছাল ও অর্থহীন ব্যয়ের জন্য মেজবান মনঃকষ্টে ভুগবেন।

(৩) ঝাল কম খাওয়ার অভ্যাস কিম্বা কোন খাদ্য খাবার থেকে বাছ-বিচার থাকলে পূর্বাহ্নেই মেজবানকে সে সম্পর্কে অবহিত করা কর্তব্য। অন্যথায় সম্মুখে খাবার উপস্থিত হওয়ার পর ইত্যাকার ব্যক্তিগত রুচির কথা প্রকাশ করা দ্বারা অযথাই মেজবানকে অপ্রস্তুত এবং তার জন্য ভিন্ন খাবার যোগাড়ের বিড়ম্বনায় ফেলা হবে।

(৪) কারও গৃহে মেহমান হওয়ার পর কোন বিশেষ খাদ্য-খাবারের জন্য তাকে ফরমায়েশ না করা। হোকনা তা অতি সামান্য কোন কিছু, তবুও সেই মুহূর্তে সেটা তার গৃহে উপস্থিত না থাকলে মেহমানের দাবী পূরণে ব্যর্থতার দরুণ গৃহকর্তা লজ্জিত হবেন।

(৫) মেজবানের অনুপস্থিতিতে খাওয়ার সময় পেট ভরে গেলে কিছু খাদ্য ব্যঞ্জন অবশিষ্ট রেখে দেয়া, যাতে মেহমানের খাবার কম হয়েছে সন্দেহে মেজবান পক্ষ লজ্জিত বোধ না করেন।

(৬) অনাহুতভাবে কারও গৃহে মেহমানদারীতে উপস্থিত হওয়া কিম্বা এরূপ অনাহুত কাউকে মেজবানের অনুমতি ছাড়া নিজের সঙ্গে নেয়া অনুচিত। এরূপ হলে অনেক ক্ষেত্রেই খাদ্য-খাবারের ব্যবস্থা সীমিত হওয়ার দরুণ কিম্বা অন্য কোন কারণে দাওয়াতকর্তা এরূপ অতিরিক্ত লোকের উপস্থিতিতে বিড়ম্বনা বোধ করে থাকেন। অবশ্য যদি নিশ্চয়তা থাকে যে, মেজবান এতে অসন্তুষ্ট হবেন না, তাহলে এরূপ অতিরিক্ত লোক নেয়াতে কোন দোষ নেই।

(৭) মেজবানের গৃহে এত বেশী দিন অবস্থান করা উচিত নয়, যাতে মেজবান অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। হাদীছে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

এসেছে। তদ্রূপ কারও সাথে সাক্ষাৎকালে এত বেশী সময় তার কাছে থাকা উচিৎ নয়, যাতে তিনি চক্ষু লজ্জায় উঠে যেতেও বলতে পারবেন না অথচ অস্বস্তিবোধ করতে থাকবেন। এসব ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রতি খুবই লক্ষ্য রাখা জরূরী।

(৮) মেজবানেরও কিছু বিষয় লক্ষণীয়; যেমন খাওয়ার সময় স্বাধীনভাবে মেহমানকে খেতে দেয়া, অতিরিক্ত খাওয়ার জন্য কিম্বা কোন কিছু রুচি বিরুদ্ধ হলেও তা গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি না করা, এটা মেহমানের বিঃস্বাদ কিম্বা মনঃপীড়ার কারণ হতে পারে।

(৯) মেহমানের খাদ্য গ্রহণের প্রকৃতি গভীরভাবে লক্ষ্য করা কিম্বা তার মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকা উচিত নয়, এতে তার মনোসংকোচ সৃষ্টি হতে পারে। বরং খাদ্য খাবার তার সামনে উপস্থিত করতঃ হালকাভাবে শুধু তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(১০) একাধিক মেহমানকে একই মজলিসে আপ্যায়নের ক্ষেত্রে সকলের প্রতি একই রকম যত্ন নেয়া সমীচীন। অন্যথায় কেউ তার প্রতি অবহেলা করা হচ্ছে কিম্বা তাকে ক্ষুদ্র ভাবা হচ্ছে চিন্তা করে মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে পারেন।

(গ) কারও জন্য অপেক্ষায় থাকলে পূর্বে তাকে অবহিত করণ

কারও জন্যে অপেক্ষায় থাকলে পূর্বে তাকে অবহিত করা উচিত। আর তা সম্ভব বা সঙ্গত না হলে পরে অপেক্ষমান ব্যক্তিকে একথা জানানো ঠিক নয় যে, আমি দীর্ঘক্ষণ আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। এতে তাকে অহেতুক লজ্জায় ফেলা হবে। আবার গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত লোকের ধারে কাছে এমন স্থানে থেকেও অপেক্ষা করা সমীচীন নয় যাতে তার কাজের মনোযোগ বিঘ্নিত হয়। (আদাবুল মুআশারাত)

(ঘ) ঋণ চেয়ে কাউকে বিড়ম্বনায় না ফেলা

কোন এমন ব্যক্তির নিকট ঋণ চাওয়া সঙ্গত নয় যেখানে অবস্থা দৃষ্টে মনে হবে যে, সামর্থ না থাকলেও তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না, ফলে অন্যের থেকে ধার-কর্জ করে হলেও তিনি তার দাবী পূরণে সচেষ্ট হবেন। এরূপ অবস্থায় তিনি অপ্রস্তুত হবেন ও বিড়ম্বনা বোধ করবেন। তবে যদি এই বিশ্বাস হয় যে, তিনি বিড়ম্বনা বোধ করবেন না কিম্বা সামর্থ না থাকলে অকপটে তিনি তা ব্যক্ত করতে পারবেন, এরূপ অবস্থায় ঋণ চাওয়াতে

কোন দোষ নেই। কারও থেকে কোন সুপারিশের দাবী কিম্বা অন্য কোন প্রকার ফরমায়েশের ক্ষেত্রেও মনস্তাত্ত্বিক এই নীতিটি লক্ষণীয়।

(ঙ) নিজের পরিচয় গোপন রেখে পরে তা প্রকাশ করা প্রসঙ্গ

কারও সাথে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে পূর্বাহ্নেই সে সম্পর্কে নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ধারণা তাকে দিতে হবে এবং নিজের পরিচয় সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে হবে, অন্যথায় হতে পারে সে সম্পর্কে তিনি তাকে নিতান্তই অজ্ঞ বা স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী ভেবে সেই আলোকেই তার সাথে আলোকপাত করবেন। এমতাবস্থায় পরে যদি প্রকাশ পায় যে, এ ব্যাপারে পূর্বাহ্নেই তার যথেষ্ট জ্ঞান/অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাহলে তিনি অপ্রস্তুতই হবেন।

(দুই) কারও মনে বিরক্তির উদ্রেক না করা

মনস্তাত্ত্বিকভাবে অনেক কথা, কাজ বা আচরণ দ্বারা অন্যের মনে বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে। ইসলামী মুআশারার নীতিতে এরূপ বিষয় পরিত্যাজ্য। তাই নিম্নোক্ত নীতিমালা দেয়া হয়েছে।

(ক) কারও কথার মাঝে কথা না বলা

কারও কথা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মাঝখানে কথা বলা অনুচিত। কারণ এতে তিনি কথার ধারা হারিয়ে ফেলতে পারেন বা তার বক্তব্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন হচ্ছে ভাবতে পারেন, যা তার বিরক্তির কারণ হবে। বরং কিছু বলতে হলে তার কথা পূর্ণ হওয়ার পরই বলা শ্রেয় কিম্বা তার বক্তব্যের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকলে তার বক্তব্য শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে হবে। হতে পারে একটু পরেই তিনি এই উহ্য প্রশ্নের সমাধান পেশ করবেন। সেক্ষেত্রে এখনই তার কথা কেটে প্রশ্ন করলে তার মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক হবে বৈ কি? হাদীছে তাই বলা হয়েছে,

لَاتَقْطَعْ عَلَى النَّاسِ كَلَامَهُمْ،

অর্থাৎ, (কথার মাঝে কথা বলে) মানুষের কথা কেটে দিওনা। (তাকরীরে বোখারী)

একজনের কথা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অন্যের কথা বলা তাই আদবের খেলাফ। (উমদাতুল কারী : ২য়)

তবে বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান অধ্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছি।

(খ) প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা না বলা

প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা দ্বারাও অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মনে বিরক্তির উদ্রেক হয়ে থাকে। তদুপরি এতে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের সময়ের অপচয় হয়। কথা বেশী হলে ভুলের সম্ভাবনা বেশী থাকা ইত্যাকার ক্ষতির দিকগুলো তো রয়েছেই। প্রয়োজনাতিরিক্ত কথার ফলে শ্রোতার মনে বিরক্তির উদ্রেক হওয়ায় বক্তার বক্তব্যের কার্যকারিতা ও তার কথার ওজস্বীতাও বিনষ্ট হয়।

(গ) আত্মপ্রশংসা পরিহার করা

মানুষের মনে বিরক্তির উদ্রেক করা নিষেধ। এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, অন্যের সামনে আত্মপ্রশংসা করাও নিষেধ। কারণ নিজের মুখে স্বীয় কর্মকান্ডের প্রশংসা কীর্তন অন্যের মনে বিরক্তির উদ্রেক করে থাকে। তদুপরি এটা অনেক ক্ষেত্রেই এখলাসের পরিপন্থী হয়ে থাকে, যা কর্তা ব্যক্তির আমলের ছওয়াব নষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এ প্রেক্ষিতেও এটা নিষিদ্ধ নিঃসন্দেহে। শরীআত যেখানে কারও সম্মুখে তার প্রশংসা করতে নিষেধ করেছে, তদ্রূপ অন্যকে নিজের প্রশংসা রত দেখলে বাধা দেয়ার শিক্ষা দিয়েছে, সেখানে নিজেরই বাচনিক নিজের প্রশংসা কীর্তন কতখানি নিষিদ্ধ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ،

অর্থাৎ, তোমরা আত্মপ্রশংসা কর না।
(সূরা নাজ্‌ম : ৩২)

তবে উল্লেখ্য যে, আত্মপ্রশংসা দু'ধরনের উদ্দেশ্যে হতে পারে, অহংকার, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ প্রভৃতি কারণে; এটা উপরোক্ত আয়াতের আলোকে গর্হিত। আবার কোন ধর্মীয় কল্যাণের নিয়তেও আত্মপ্রশংসা হতে পারে, যেমন উপদেশ বা ভাল শিক্ষা গ্রহণের জন্য, ভাল কাজের প্রতি অনুরক্ত বা মন্দ কর্মের প্রতি বিতশ্রদ্ধ করে তোলার জন্য ইত্যাদি। এরূপ ক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসা নিষেধ নয় বরং উত্তম। কুরআনে বলা হয়েছে, হযরত ইউসুফ (আ.) মিসর সম্রাটের নিকট বলেছিলেন,

اِجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ.

অর্থাৎ, আমাকে দেশের ধন-সম্পদের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন, আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও সুবিজ্ঞ। (সূরা ইউসুফ : ৫৫)

রাসূল (সা.) বলেছেন,

اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِاللهِ وَاَتْقَاكُمْ،

অর্থাৎ, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও সর্বাধিক পরহেযগার।

কুরআন ও হাদীছে আত্মপ্রশংসার স্বপক্ষে এরূপ বহু প্রমাণ দেখা যায়, এ সমস্ত সদুদ্দেশ্যে সংঘটিত অবস্থার বর্ণনা। আর বলা বাহুল্য-সদুদ্দেশ্যে আত্মপ্রশংসা সংঘটিত হলে তার ভাষা, ভাব-ভঙ্গি ও সুর এমন হবে যা শ্রোতার মনে বিরক্তির উদ্রেক করবে না। মানুষের মনের উদ্দেশ্য তার ভাষা, ভাব-ভঙ্গি ও সুরের উপর প্রভাব ফেলে থাকে- এ বিষয়টিও মনস্তাত্ত্বিক নীতি সমর্থিত।

(ঘ) অপরিপক্ক অভিজ্ঞতার বর্ণনা পরিহার করা

আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি-অন্যের অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনতে ক্ষেত্র বিশেষে কিছুটা ভাল লাগলেও যদি সে অভিজ্ঞতার বর্ণনা নিতান্তই অপরিপক্ক বা এলোমেলো কিম্বা অসামঞ্জস্যশীল হয় তাহলে তা শুনতে অত্যন্ত বিরক্তিবোধ হয়। মনস্তাত্ত্বিক এ বিষয়টিও লক্ষণীয়।

(ঙ) বড় মজলিসে সকলের সাথে পৃথক পৃথক মুসাফাহা না করা

শরীআতে মুসাফাহা পরস্পর ভালবাসা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে। অতএব কখনও যদি সেই মুসাফাহা ভালবাসা নয় বরং বিরক্তি সৃষ্টির কারণ হয় তখন তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। বহু লোকের মজলিসে গিয়ে যদি কেউ একাধারে সকলের সঙ্গে মুসাফাহা শুরু করে দেন তখন মজলিসের ধারা প্রবাহ বিঘ্নিত হওয়ায় উপস্থিত অন্যান্যদের মনে বিরক্তির সৃষ্টি হবে। হযরত থানভী (রহ.) বলেন, এরূপ মুসাফাহা অনুচিত। (আদাবুল মুআশারাত)

তদ্রূপ কেউ বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত থাকলেও তার সাথে মুসাফাহা বিরক্তির কারণ হবে কি-না তা ভেবে নিতে হবে। এরূপ সম্ভাবনা থাকলে সেক্ষেত্রে শুধু সালামের উপরই ক্ষ্যান্ত করা উচিৎ। (প্রাগুক্ত) এমনকি গভীর অধ্যয়নে রত কিংবা গভীর মনোযোগের সাথে যিক্‌র শুগলে লিপ্ত ব্যক্তিকে সালাম প্রদানের ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষণীয়। এসব ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক দিকটা আমরা একেবারেই ভুলে থাকি! কিন্তু শরীআত অনুরূপ শিক্ষা দেয়নি।

(তিন) কাউকে দ্বন্দ্ব শংকায় না ফেলা

সামাজিকতা ও শিষ্টাচারের পর্যায়ে ইসলাম এমন কতিপয় নীতি শিক্ষা দিয়েছে যার সার নির্যাস হল কাউকে দ্বন্দ্ব শংকায় না ফেলা। যেমন:

(ক) অপরিপূর্ণ বা অস্পষ্ট কথা না বলা

অপরিপূর্ণ, অস্পষ্ট বা গোলমেলে কথা দ্বারা শ্রোতা মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে থাকে, অনেক ক্ষেত্রে শংকায়ও পতিত হয়। স্পষ্ট কথা বলা হলে মর্মোদ্ধারের জন্য শ্রোতাকে এই বাড়তি মানসিক বেগ পেতে হয় না।

হাদীছে তাই এসেছে,

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الْأُغْلُوْطَاتِ.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভ্রান্তিকর বক্তব্য থেকে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ)

হাদীছে আছে, একদিন হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) রাসূল (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অনুমতির জন্য কড়া নাড়লেন, রাসূল (সা.) ভিতর থেকে প্রশ্ন করলেন কে? উত্তরে জাবের (রা.) বললেন, "আনা" (অর্থাৎ, আমি) এতে রাসূল (সা.) তাকে শাসিয়ে বললেন, "আনা", "আনা" (অর্থাৎ, আমি আমি এরূপ বললে কাউকে চেনা যায় নাকি?) তিনি এরূপ উত্তর পছন্দ করেননি। (বোখারী : ২য় খণ্ড, ৯২৩ পৃষ্ঠা)

এই অপছন্দ করার কারণ হল, এরূপ অস্পষ্ট কথায় কাউকে চেনা যায় না। যে প্রথম শব্দে তাকে চিনল না সে "আমি" শব্দ দ্বারা কিরূপে চিনবে? এরূপ অস্পষ্ট কথা দ্বারা ভেতরের লোকের উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে, বিরক্তিবোধ হবে, কিম্বা ক্ষেত্র বিশেষে অবাঞ্ছিত লোকের আগমন ঘটল কি-না ভেবে শংকায় পতিত হবে। এর থেকেও আরও উদ্বেগ এবং শংকাজনক হবে যদি ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করা হয় কে? আর বাইরে সে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে, কোন উত্তরই না দেয়। এরূপ করা ইসলামী মুআশারা সম্পর্কিত শিক্ষার পরিপন্থী।

(খ) কথার জওয়াবে হ্যাঁ/না কোনটা না বলা

উপরের আলোচনা থেকেই বোঝা গেল যে, কোন প্রশ্নের জওয়াবে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থাকাতে প্রতিপক্ষের মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়। এমনিভাবে যে কোন প্রশ্ন বা কথার জওয়াবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনরূপ সাড়া না দিলে বক্তা বা আলোচক এই দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকেন যে, হয়ত কথা বা

বিষয়টা আমি বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি। কিম্বা কোন প্রশ্নের জওয়াবে 'হ্যাঁ' বা 'না' কোনটাই না বলা হলে সেক্ষেত্রে প্রশ্নকারী এক ধরনের মানসিক অস্বস্তি ভোগ করতে থাকেন। ইসলামী মুআশারাতে এত ক্ষুদ্র মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ও বিবেচনায় আনা হয়েছে।

(গ) ভুয়া ভয় না দেখানো

কোন কথা বা আচরণ কিম্বা কোন অস্ত্র দ্বারা ভুয়া ভয় দেখালেও সাময়িকভাবে মনে আশংকা সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই এরূপ বিষয়ও ইসলামী মুআশারায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নবী কারীম (সা.) বলেন,

مَنْ اَشَارَ اِلٰى اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهٗ حَتّٰى يَدَعَهَا وَاِنْ كَانَ اَخَاهُ لِاَبِيْهِ وَاُمِّهٖ.

অর্থাৎ, যে কেউ তার ভাইকে লোহা (নির্মিত অস্ত্র) দ্বারা (ভীতিজনক) ইঙ্গিত করে, ফেরেশতা তার প্রতি লা'ণত করে, যতক্ষণ সে অস্ত্র পরিত্যাগ না করে; যদিও সে তার আপন ভাই হয়। (মুসলিম : ২য় খণ্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা)

আল্লামা নববী এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হাদীছে মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি হাস্য রসিকতা বশত হলেও এবং ফেরেশতার লা'ণতের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় এরূপ করা হারাম।

অন্য হাদীছে রাসূল (সা.) মসজিদ, বাজার ইত্যাদি লোক সমাবেশের স্থানে উন্মুক্তভাবে অস্ত্র নিয়ে গমনাগমন করতেও নিষেধ করেছেন। (মুসলি : ২য় খণ্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা) এই নিষেধাজ্ঞার কারণ অতি সুস্পষ্ট-কেননা এতে অসতর্কতা বশত কারও গায়ে খোঁচা বা আঘাত লাগতে পারে কিম্বা অন্তত কারও মনে ভীতির সঞ্চার হতে পারে।

(ঘ) দ্বন্দ্ব-সন্দেহ উদ্রেক করে এমন বৈধ কাজও পরিহার করা

কোন কাজ কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ হলেও তা এমনভাবে করা সঙ্গত নয় যার দ্বারা অন্যের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে, অন্যের মনে দ্বন্দ্ব সন্দেহ জাগতে পারে। আমার জন্য বৈধ কাজ আমি করে যাব তাতে অন্যে কি ভাববে না ভাববে তা আমার দেখা নিষ্প্রয়োজনীয়। এরূপ নীতি ঠিক নয়। দাওয়াত অধ্যায়ে "দায়ীর নিজের অবস্থানকে পরিস্কার রাখা" শিরোনামে এ সম্পর্কে হাদীছ ও মনীষীদের অনুসৃত নীতির আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(চার) কারও আত্মমর্যাদায় আঘাত না হানা

আত্মমর্যাদাবোধ মনের একটি অবিচ্ছেদ্য দাবী। আত্মমর্যাদায় আঘাত পেলে প্রত্যেকেই তাই মনস্তাত্ত্বিক ভাবে পীড়িত হয়ে পড়ে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা, পর্যায় ও গুণের জন্য তাই স্বীকৃতি পাওয়ার তরে উন্মুখ থাকে। কথা, কাজ ও আচরণ দ্বারা কারও আত্মমর্যাদায় যেন আঘাত না লাগে সে জন্য ইসলামে নিম্নোক্ত নীতিমালা দেয়া হয়েছে–

(ক) প্রত্যেকের শান অনুযায়ী তাকে সম্বোধন করা

মর্যাদাবান লোককে মর্যাদাসূচক খেতাব বা সম্মানজনক সম্বোধন না করা হলে তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগবে। রাসূল (সা.) এমনকি কাফেরদের ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসরণ করেছেন। রোম-সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নিকট তিনি যে দাওয়াতপত্র প্রেরণ করেন, তাতে নিম্নরূপ সম্বোধন করা হয়েছিল–

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى.....

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হতে রোম-প্রধান হেরাক্‌ল-এর প্রতি। যে হেদায়াত অনুসরণ করবে তার জন্য রয়েছে শান্তি। (বোখারী : ১ম খণ্ড, ৫ম পৃষ্ঠা)

বোখারীর ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, রাসূল (সা.) "রোম-সম্রাট" কথাটি পরিহার করেছেন, কেননা ইসলামের বিধানে সে সম্রাট নয়। তবে তার মনস্তাত্ত্বিক (মনের) আনুকূল্য লাভের জন্য রোম-প্রধান খেতাবে তাকে সম্বোধন করেছেন। (ফাতহুলবারী : ১ম খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)

আল্লামা শাব্বির আহমদ উছমানী বলেন, রাসূল (সা.)-এর এরূপ সম্বোধন থেকে জানা গেল যে, কোন সম্মানী লোকের সাথে পত্র বিনিময়ে বা কথোপকথোনকালে ভাল ও প্রকৃত খেতাব ব্যবহার করা ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী নয়। (ফজলুলবারী : ১ম খণ্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা)

(খ) তিনজনের উপস্থিতিতে দু'জনে কোন একান্ত কথা না বলা

তিনজনের উপস্থিতিতে দু'জনে একান্তে কোন কথা বলতে শুরু করলে তৃতীয় জনের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগবে এই ভেবে যে, তারা দু'জন এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলছে আমাকে যা শোনার

অযোগ্য ভাবা হচ্ছে, কিম্বা কোন গোপন বিষয়ে কথা হচ্ছে, যে ব্যাপারে আমাকে বিশ্বস্ত মনে করা হচ্ছে না বা আমাকে আপন মনে করা হচ্ছে না। ইত্যাকার চিন্তার ফলে তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগবে এবং সে মানসিকভাবে দুঃখ পাবে। হাদীছে বলা হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন,

قَال رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَايَتَنَاجٰى اِثْنَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ اَجْلِ اَنْ يَّحْزُنَهُ،

অর্থাৎ, রাসূল (সা.) বলেন, যখন তোমরা তিনজন থাকবে, তখন দু'জন একান্তে কোন কথা বলবে না অপর (তৃতীয়) জনকে বাদ দিয়ে, যতক্ষণ তোমরা আরও মানুষের সাথে মিলিত না হও। কারণ, এটা (অর্থাৎ, তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে একান্তে কথা বলা) তৃতীয় জনকে দুঃখ দেবে। (মুসলিম : ২য় খণ্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা; বোখারী ২য় খণ্ড, ৯৩১ পৃষ্ঠা)

এখানে লক্ষণীয় যে, তিনজনের চেয়ে অধিক লোক হওয়ার ক্ষেত্রে এরূপ দু'জনের একান্তে কথা বলাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি, তার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। যেহেতু সেরূপ ক্ষেত্রে কেউ এটা ভাববে না যে, তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন হচ্ছে কিম্বা তাকে অবিশ্বস্ত ভাবা হচ্ছে ইত্যাদি। কেননা তার ন্যায় আরও লোক মজলিসে উপস্থিত রয়েছে যার বা যাদের থেকেও সে বিষয়টি গোপন রাখা হচ্ছে।

(গ) মজলিসে বড়দের উপস্থিতিতে আগে বেড়ে কথা না বলা

কোন আলোচনা মজলিসে সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয়ে নিজ অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক থাকলে অন্যদের পক্ষে কিংবা গুরুজনদের উপস্থিতিতে অধীনস্তদের পক্ষে আগে বেড়ে কথা বলা সমীচীন নয়। এতে বড়দের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগতে পারে। ইসলামী সামাজিকতায় বড়দের অশ্রদ্ধা করা অত্যন্ত গর্হিত-এ দৃষ্টি ভঙ্গিতেও এরূপ করা সমীচীন নয়। বোখারী শরীফে ইমাম বোখারী (রহ.) "বড়দের সম্মান প্রদর্শন করা এবং সর্বাপেক্ষা গুরুজন আলোচনার সূচনা করবেন" শীর্ষক পরিচ্ছেদে রাফে' ইবনে খাদীজ ও সাহ্ল ইবনে আবী হাছ্মা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছ দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত করেছেন। (দ্র. বোখারী : ২য় খণ্ড, ৯০৭ পৃষ্ঠা)

অপর এক হাদীছে আছে রাসূল (সা.) একদা কোন এক বিষয়ে সমবেত সাহাবীদেরকে প্রশ্ন করলে কেউ তার উত্তর দিতে সক্ষম হলেন না। হযরত ইবনে উমরের মনে প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও মজলিসে তার পিতা ওমর ও আবূ বকর প্রমুখ গুরুজন উপস্থিত থাকায় তিনিও উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকেন। এ থেকেও ইমাম বোখারী আলোচ্য বিষয়ের প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। এ হাদীছটি "শিক্ষা মনোবিজ্ঞান" অধ্যায়ে "মাঝে মাঝে পরীক্ষা গ্রহণ" শীর্ষক আলোচনায় আরবী মতন ও অর্থসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঘ) গুরুজনদের কাছে জওয়াবী রেজিষ্ট্রী পত্র প্রেরণ না করাঃ

গুরুজনদের কাছে একনলেজমেন্ট চিঠি বা জওয়াবী রেজিষ্ট্রী পত্র প্রেরণ করলেও তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগতে পারে। কারণ এতে ভবিষ্যতে তিনি পত্র প্রাপ্তিকে অস্বীকার করতে পারেন- এরূপ একটি অনাস্থা প্রচ্ছন্ন থাকে। আর এই অনুভূতির ফলেই তিনি আত্মমর্যাদায় আঘাত পান। তবে বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্র রাখা যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, উদাহরণ স্বরূপ এ পর্যন্ত আত্মমর্যাদা হানিকর যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হল এগুলো এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সমাজ সামাজিকতার যে কোন পর্যায়ে এবং যে কোন ব্যাপারে যেন অন্যের আত্মমর্যাদায় আঘাত না লাগে তার প্রতি স্বযত্ন প্রয়াস নিতে হবে।

(ঙ) ব্যঙ্গোক্তি ও অন্যকে অপমান করাঃ

ব্যঙ্গোক্তি, কটাক্ষ, কটুক্তি, টিকা-টিপ্পনী, উপহাস ও বিদ্রূপজনক কথা দ্বারা আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগা বা অপমানিতবোধ করা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ নয়; সামান্য অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ মাত্রেই নিজের ক্ষেত্রে তা অনুভব করে থাকেন। এই ব্যঙ্গোক্তি বা উপহাস প্রভৃতির জন্ম হয় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্যের ক্ষুদ্রত্বের অনুভূতি থেকে। কেউ যখন কাউকে উপহাস করে কিম্বা কারও প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করে বা টিকা-টিপ্পনি কাটে তখন নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে থাকে, তার হাবভাব মুখভঙ্গি ও সুর থেকেও ফুটে ওঠে যে, সে নিজেকে উত্তম ও প্রতিপক্ষকে তুচ্ছ জ্ঞান করছে। কুরআনে কারীমে তাই উপহাস সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা বর্ণনার সময় অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করার এই উৎপত্তিমূল মনোভাবের কথাও উল্লেখ করেছে এবং বলেছে অপরকে তুচ্ছ ধারণা করার এই ভিত্তি নির্ভুল নাও হতে পারে। ইরশাদ হয়েছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ....الخ

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ, কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যার উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে, কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে এবং তোমরা একে অপরকে বিদ্রূপ কর না এবং একে অপরকে মন্দ উপাধীতে ডেকোনা। (সূরা হুজুরাত : ১১)

উল্লেখ্য, এ আয়াতে উপহাস সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। উপহাস বলা হয়, কোন ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং অপমান করার জন্য এমন ভাবে তার দোষ-ত্রুটি বা কোন কিছু আলোচনা করা, যাতে শ্রোতাদের হাসির উদ্রেক করে। এরূপ অপমানজনক আচরণ যখন মুখভঙ্গি, হস্ত, পদ ইত্যাদি দ্বারা সম্পন্ন হয় তখন তাকে বলা হয় অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য। আবার এরূপ আলোচনার মধ্যে কেউ ফোড়ন কাটলে তাকে বলে টিকা-টিপ্পনি। আয়াতে উল্লেখিত উপহাস সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা এই সকল প্রকারকেই অন্তর্ভুক্ত করে এবং কুরআনের বর্ণনা মতে এগুলো সব হারাম।

মন্দ বা কলঙ্কজনক উপাধীতে কাউকে ডাকা দ্বারাও আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগে থাকে, আয়াতে সে বিষয়টিকেও শামেল করা হয়েছে।

(পাঁচ) কাউকে উদ্বেগে না রাখা

কাউকে কোন ব্যাপারে উদ্বেগ বা টেনশনে রাখা অনুচিত। এরই জন্য ইসলামী মুআশারায় নিম্নোক্ত নীতিমালা দেয়া হয়েছে,

(ক) যথাযথভাবে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা

কোন ব্যাপারে কাউকে প্রতিশ্রুতি, ওয়াদা বা অঙ্গীকার প্রদান করা হলে যথাসময়ে এবং যথাস্থানে যদি তা পূর্ণ করা না হয় তাহলে অপর পক্ষ এই মানসিক উদ্বেগে থাকেন যে, আদৌ সেটা পূর্ণ করা হবে কি-না, কিংবা ওয়াদা কারীর কোন বিপদ ঘটার কারণে বিলম্ব হচ্ছে কি-না ইত্যাকার টেনশনে তিনি ভুগতে থাকেন। ইসলামী মুআশারায় ওয়াদা রক্ষার গুরুত্ব অতীব।

এমনকি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকে মু'মিনের অবিচ্ছেদ্য গুণ ও তা ভঙ্গ করাকে মুনাফিকের চিহ্ন হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। একবার এক ঘটনায় রাসূল (সা.) এক স্থানে তিন দিন যাবত অপেক্ষা করেছিলেন। "মাদারিজুন্নুবুওয়াত" গ্রন্থে আবূ দাউদের বরাতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল হাম্মাদ (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে-তিনি বলেন, নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে রাসূল (সা.) থেকে আমি একটা জিনিস ক্রয় করলাম, কিছু মূল্য বাকী থাকায় আমি বললাম, আপনি অপেক্ষা করুন আমি এখানেই এসে দিয়ে যাব। পরে আমি ভুলে গেলাম। তিন দিন পর আমার স্মরণ হলে সেখানে পৌঁছে দেখি রাসূল (সা.) সেখানে অবস্থান করে আছেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমাকে কষ্টে (উদ্বেগে) ফেলে দিয়েছ; তিন দিন যাবত এখানেই তোমার জন্য অপেক্ষায় রত আছি। (উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম : ৫৯ পৃষ্ঠা)

(খ) কেউ কোন দায়িত্ব দিলে সংশ্লিষ্ট কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তাকে অবহিত করা

কেউ কোন কাজের জন্য দায়িত্ব অর্পন করলে সে কাজের অগ্রগতি কিংবা আদৌ তা করা সম্ভব হল কি-না সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করা উচিৎ। কোন সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত যিনি দায়িত্ব অর্পন করলেন তিনি মানসিক উদ্বেগে থাকবেন। এমনও হতে পারে যিনি দায়িত্ব অর্পন করলেন তিনি ভাববেন কাজটি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, এমতাবস্থায় পরে যদি তিনি জানতে পারেন কাজটা আদৌ হয়নি আর ইতিমধ্যে বিলম্ব হয়ে যাওয়ার কারণে অন্যের দ্বারা তা সম্পন্ন করার সুযোগও নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন তার টেনশনের অন্ত থাকবেনা।

(গ) প্রতিশ্রুত বা কাংখিত পত্র/জওয়াবী পত্র প্রেরণে বিলম্ব না করা

পত্র বা পত্রের উত্তর প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হলে যথাসময়ে সেটা সম্পন্ন করা উচিত। প্রতিশ্রুত পক্ষ এর জন্য উদ্বেগে থাকতে পারে। আবার যে ক্ষেত্রে কেউ পত্র বা জওয়াবী পত্র পাওয়ার জন্য উদ্বেলিত থাকতে পারে, সে ক্ষেত্রেও যথাসাধ্য তার উদ্বেগ মোচনের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। কোন্ ক্ষেত্রে কার উদ্বেগ কতটুকু বা কি পর্যায়ের হবে তা মনস্তাত্ত্বিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব।

(ছয়) কারও মনে ঘৃণার উদ্রেক না করা

কারও মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়- এমন কথা ও কাজ পরিহার করা উচিৎ। যেমন পানি পান করার সময় গ্লাসের মধ্যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা,

খাওয়ার সময় ঘৃণা উদ্রেককারী কথা বলা। অনেক রুচিসম্পন্ন লোকের এতে বমি পর্যন্ত হয়ে যায়। অনরূপভাবে চপ চপ শব্দ করে খাওয়া, লোক সম্মুখে গালে নাকে হাত দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করা, হাঁছি প্রদান বা হাই তোলার সময় মুখে হাত দিয়ে না ঠেকানো, ঘর্মাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় লোক-মজলিসে গমন ইত্যাদি বহু এমন বিষয় রয়েছে যার দ্বারা অন্যের মনে ঘৃণার উদ্রেক হতে পারে। এমন সব কিছুই পরিত্যাজ্য। আবূ কাতাদাহ (রা.) বর্ণিত এক হাদীছে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

إِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الْإِنَاءِ.

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যখন পান করে তখন সে যেন পান-পাত্রে নিঃশ্বাস ত্যাগ না করে। (বোখারী : ১ম খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

মুহাদ্দিছগণ এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এই হাদীছে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। পানপাত্রে নিশ্বাস ত্যাগ করলে শ্বাসের মাধ্যমে নাক থেকে ময়লাকণা পাত্রে প্রবেশ করতে পারে কিংবা পানিতে মুখের দুর্গন্ধও যুক্ত হতে পারে, ফলে উক্ত পাত্রে অন্যের পক্ষে পান করা ঘৃণার উদ্রেক করবে। এরূপ শ্বাস ত্যাগের প্রয়োজন যাতে না হয়, সে জন্য তিনবার মুখ থেকে পাত্রকে পৃথক করে তিন শ্বাসে পান করার সুন্নাত তরীকা রাখা হয়েছে। (উমদাতুল কারী : ২য় খণ্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা) যাহোক এরই আলোকে অন্যান্য ঘৃণা উদ্রেককারী বিষয়ও অনুরূপভাবে নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে "যখন তোমাদের কেউ জুমুআর জামাআতে হাজির হয় সে যেন গোসল করে আসে। (বোখারী : ১ম খ, ১২০ পৃষ্ঠা) এই গোসলের নির্দেশের কারণ ছিল- তখনকার দিনে সাহাবীগণ পশমের মোটা পোষাক পরিধান করতেন। তাঁরা ছিলেন খেটে খাওয়া মানুষ এবং মসজিদ ছিল সংকীর্ণ ও ছাদ খুব উঁচু ছিল না। এরূপ অবস্থায় একদা গরমের মওসূমে রাসূল (সা.) মসজিদে প্রবেশ করে ঘর্মাক্ত মানুষের শরীর থেকে বের হওয়া দুর্গন্ধে লোকদের কষ্ট হচ্ছে টের পেলেন, তখনই তিনি এ নির্দেশ দেন। (আবূ দাঊদ) এবং এরই প্রেক্ষিতে জুমুআর দিনে গোসল ও খোশবূ ব্যবহারকে সুন্নাত করা হয়েছে এবং যথাসাধ্য উত্তম পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয়েছে। মুখের দুর্গন্ধে যেন অন্যদের কষ্ট না হয় সে জন্য প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযূ এবং মেসওয়াকের প্রতি তারগীব (উৎসাহ) দেয়া হয়েছে। অবশ্য এ ছাড়াও উযূ ও মেসওয়াকের বহু ফযীলত এবং ফায়দা রয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছের শেষাংশে রাসূল (সা.) বলেন,

اِذَا تَثَاوَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهٗ مَا اسْتَطَاعَ، (بخارى)

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে সে যেন যথাসম্ভব তা ঠেকায়। (বোখারী : ২য় খণ্ড, ৯১৯ পৃষ্ঠা)

وَفِيْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فَلْيَضَعْ يَدَهٗ عَلٰى فِيْهِ. (كما فى حاشية البخاري)

এক রেওয়ায়েতে আছে, সে যেন মুখে হাত রাখে। (বোখারীর টীকা দ্র.)

ইমাম বোখারী এ হাদীছ দ্বারা হাই তোলার সময় মুখে হাত স্থাপনের নীতি প্রমাণিত করেছেন।

(সাত) কাউকে আশাহত না করা

কেউ যখন কোন আশা নিয়ে কারও কাছে যায়, সে ক্ষেত্রে তাকে ব্যর্থ মনোরথ করে ফিরিয়ে দিলে তার মনে আঘাত লাগে এবং মনে মনে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এরূপ মানসিক আঘাত মুআশারার পারস্পরিক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে দেয়। ইসলামী মুআশারায় এরূপ নীতি সমর্থিত নয়। এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী স্মরণীয়।

(ক) যাচঞাকারীকে ব্যর্থ মনোরথ করে ফিরিয়ে না দেয়া

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَاتَنْهَرْ.

অর্থাৎ, কোন যাচঞাকারী বা সাহায্য প্রার্থীকে ধমক দিবে না।

উল্লেখ্য যে, এখানে সাহায্য প্রার্থী বলে শুধু আর্থিক সাহায্য প্রার্থীকেই বোঝানো হয়নি বরং আর্থিক ও জ্ঞানগত উভয় প্রকার সাহায্য প্রার্থী এর অন্তর্ভুক্ত। (মাআরিফুল কুরআন) কেউ কোন অর্থ সাহায্য কামনা করলে কিম্বা কোন শিক্ষণীয় বিষয় জানতে চাইলে কাউকে ব্যর্থ মনোরথ করে বিদায় করা উচিৎ নয়; কিছু দিয়ে বা জানিয়ে বিদায় করতে হবে এবং না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করতে হবে। তবে কোন যাচঞাকারী নাছোড় বান্দা হয়ে গেলে প্রয়োজনে তাকে ধমক দেয়াও জায়েজ।

নিত্য ব্যবহার্য জিনিস-যেগুলো স্বভাবত পরস্পর একে অপরকে ধার দিয়ে থাকে এবং অন্যের থেকে নিয়ে থাকে এরূপ জিনিস যাচঞাকারীকে

যারা ব্যর্থ মনোরথ করে ফিরিয়ে দেয়, তাদের সম্পর্কে সূরা মাউনে নিন্দা জ্ঞাপন ও দূর্ভোগের কঠোর বাণী বিধৃত হয়েছে এবং এটাকে অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির কাজ হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ বিষয়টি দেখে নেয়া যেতে পারে। অবশ্য এর অন্যরকম ব্যাখ্যা-ও রয়েছে।

রাসূল (সা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا.

অর্থাৎ, কখনও এরূপ হয়নি যে, নবী (সা.)-এর কাছে কিছু যাচঞা করা হয়েছে। আর তিনি 'না' বলেছেন। (মুসলিম : ২য় খণ্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

(খ) সাক্ষাৎ প্রার্থীর সাথে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি না জানানো

মুআশারার নীতিতে এক দিকে যেমন সাক্ষাৎ প্রার্থীর বেলায় এই নীতি দেয়া হয়েছে যে, সে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত হুট করে কারও গৃহে প্রবেশ করবে না, অন্য দিকে যার কাছে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি চাওয়া হয় তার বেলায়ও এই নীতি প্রদান করা হয়েছে যে, সে যেন গুরুত্বর অসুবিধা বা নিতান্ত ওযর ছাড়া সাক্ষাৎ প্রদান করতে অস্বীকার না করে। এরূপ অস্বীকৃতি সাক্ষাৎ প্রার্থীকে আহত করবে এবং তার মানসিক কষ্টের কারণ হবে। হাদীছে বলা হয়েছে,

اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

অর্থাৎ, সাক্ষাৎ প্রার্থী ব্যক্তিরও তোমার উপর হক রয়েছে।

তবে কোন ওযর বশত যদি কেউ ফিরে যেতে বলে এবং সাক্ষাৎ প্রদান না করে, তাহলে মনঃকষ্ট নেয়া উচিৎ নয় বরং হৃষ্ট চিত্তে ফিরে আসা উচিৎ। নিম্নোক্ত আয়াতে একথা বলা হয়েছে,

وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ.

অর্থাৎ, যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা রয়েছে। (সূরা নুর : ২৮)

প্রয়োজনে ফিরিয়ে দেয়ার এই নীতি যদি না থাকত তাহলে সাক্ষাৎ প্রার্থীর জন্য সুবিধার হলেও অপর পক্ষের জন্য তা কষ্টের কারণ হত। ইসলামের নীতিগুলো কতখানি ভারসাম্যতাপূর্ণ তা লক্ষণীয়।

(গ) সামর্থবান ঋণ দিতে অস্বীকার করবে না

যদি কেউ কারও কাছে ঋণ চায় তাহলে সঙ্গতি থাকলে ঋণ দেয়া উচিৎ। এতে ঋণ গ্রহীতার মনে ঋণদাতার প্রতি স্নেহ-ভালবাসা সৃষ্টি হবে এবং পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও হামদর্দীর প্রবৃদ্ধি ঘটবে। তদুপরি ছওয়াব লাবের দিকটিতো রয়েছেই। হাদীছে দান-সদকার তুলনায় ঋণ প্রদানের ছওয়াব দ্বিগুণ হওয়ার কথা উল্লেখ করে ঋণ প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও অন্যকে ঋণ প্রদানের প্রতি উৎসাহিত না হওয়ার অর্থ হল অন্যের প্রতি মনস্তাত্ত্বিক সহানুভূতিকে উপেক্ষা করা। এভাবে মনস্তাত্ত্বিক কমনীয়তা পাষন্ডতায় রূপ নিতে থাকে।

হাদীছে এসেছে,

اِنِ اسْتَقْرَضَكَ اَقْرَضْتَهُ وَاِنِ اسْتَعَانَكَ اَعَنْتَهُ.

অর্থাৎ, যদি সে (প্রতিবেশী) তোমার কাছে ঋণ চায় তাহলে তাকে ঋণ দিবে এবং সহযোগিতা কামনা করলে তাকে সহযোগিতা করবে। (ফাতহুল মুল্‌হিম : ১ম খণ্ড)

(ঘ) সুপারিশ প্রসঙ্গ

ভাল কাজে যথারীতি সুপারিশের জন্য কেউ দাবী জানালে তা করা ইসলামী মুআশারাতে নিষিদ্ধ নয় বরং উত্তম।

সুপারিশ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا.

অর্থাৎ, কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতেও তার অংশ থাকবে। (সূরা নিসা : ৮৫)

সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা না করা হলে সুপারিশ তলবকারী আশাহত হবেন, মনস্তাত্ত্বিক নীতিতে যা গর্হিত। এ দিকটি যেমন বিবেচ্য, তদ্রূপ এমন লোককে সুপারিশ করা উচিৎ নয়, যেখানে সুপারিশ মূলতঃ সুপারিশ থাকবে না বরং নির্দেশ হয়ে যাবে, অন্য কথায় সুপারিশ যেখানে মানসিক চাপ হয়ে দাঁড়াবে। যেমনঃ যেখানে সুপারিশকারীকে অমান্য করলে কোন ক্ষতির আশংক রয়েছে এরূপ হলে মানসিকভাবে বাধ্য করেই তার থেকে কাজ আদায় করে নেয়া হবে। ফলে এক কূল রক্ষা

করতে গিয়ে আরেক কূল ভাঙ্গা হবে, একজনের মনঃস্তুষ্টি কল্পে আরেকজ-নকে মানসিক কষ্ট দেয়া হবে, এটাও সমর্থিত নয়। যাকে সুপারিশ করলে স্বাধীনভাবে সে সুপারিশ গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করতে পারে-এমন লোকের নিকটই একমাত্র সুপারিশ করা বৈধ এবং সুপারিশ প্রসঙ্গটিও হতে হবে ভাল যা পূর্বোক্ত আয়াত হতে প্রমাণিত।

সুপারিশ ও সুপারিশ রূপ নির্দেশের এই পার্থক্য একটি হাদীছ থেকে প্রমাণিত। হযরত বারীরাহ (রা.) দাসী ছিলেন। স্বামী ছিলো হযরত মুগীছ (রা.)। বারীরাহ আযাদ হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী স্বামী মুগীছের বিবাহ বন্ধনে থাকা বা না থাকার ইখতিয়ার ছিল বারীরার হাতে। সে মতে তিনি স্বামী মুগীছের বিবাহ বন্ধনে না থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার প্রতি মুগীছের ভালবাসা ছিল প্রবল। বিচ্ছেদের ফলে তিনি মদীনার অলিগলিতে পাগলপ্রায় হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলেন। মুগীছের এ অবস্থা দেখে ও মুগীছের আবেদনক্রমে রাসূল (সা.) বারীরাহকে সুপারিশ করলেন যাতে সে মুগীছকে আবার বিবাহ করে নেয়। হযরত বারীরাহ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আপনার আদেশ কি? (প্রশ্ন ছিল অত্যন্ত গভীর; যা থেকে আদেশ ও সুপারিশের পার্থক্য নিরূপিত হয়) রাসূল (সা.) বললেন, সুপারিশ। তখন হযরত বারীরাহ (রা.) বললেনঃ তাকে আমার প্রয়োজন নেই। (বোখারী : ২য় খণ্ড, ৭৯৫ পৃষ্ঠা)

(আট) মনের সংকীর্ণতা পরিহার ও মনকে উদার করণ

সব ধরনের সংকীর্ণতা থেকে মনকে মুক্ত করতে হবে এবং মনকে করতে হবে উদার। মনের সংকীর্ণতা যেসব মানসিক ব্যাধির জন্ম দেয় সেগুলো তাই ইসলামে নিষিদ্ধ। অন্যের ভাল দেখে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, অন্যের অপকার চিন্তা, প্রতিহিংসা পরায়ণতা, জীঘাংসা মনোবৃত্তি ইত্যাদি মনের সংকীর্ণতা থেকেই উৎসারিত হয়ে থাকে। তদ্রূপ ক্ষমা করতে না পারাও মনের একরূপ সংকীর্ণতা। এগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ইসলামী মুআশারায় তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে আরও যেসব নীতি দেয়া হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোন কিছুকে ব্যক্তিগত রুচি থেকে উদারতা আখ্যা দিলেই তা উদারতা এবং তার বিপরীতটা সংকীর্ণতা বলে স্বীকৃতি পাবে না, যতক্ষণ না তা ইসলামী শিক্ষার আলোকে যাচাই বাছাই করা হবে। পর পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা, নৈতিক চরিত্রের লাগামহীনতা ইত্যাদি উদারতা আখ্যা

পাবে কি-না তা এরই আলোকে নির্ণিত হবে। এখানে একটা নীতি কথার উল্লেখ সঙ্গত মনে করছি, শরীআতের যাবতীয় ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। তা হল-নির্দিষ্টভাবে কোন বিষয়ের দলীল পৃথকভাবে বর্ণিত হলে সেক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থবোধক কোন দলীল প্রয়োগ করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ হাদীছে আছে- তোমার চক্ষুর তোমার উপর হক আছে, তোমার দেহের তোমার উপর হক আছে। অর্থাৎ, শরীরের আরাম বিশ্রামেরও প্রয়োজন রয়েছে। এ দলীলটিকে যদি কেউ তাহাজ্জুদ না পড়ার পক্ষে ব্যবহার করতে যান এই বলে যে, তাহাজ্জুদ পড়তে গেলে নিদ্রা বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে, তাহলে তা ঠিক হবে না। কেননা তাহাজ্জুদের ব্যাপারে নির্দিষ্ট দলীল রয়েছে। যাহোক আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি। সংকীর্ণতা বর্জন ও উদারতা অর্জনের পর্যায়ে ইসলাম প্রদত্ত নীতিমালার কতিপয় নিম্নরূপ–

(ক) যোগ্যতার মূল্যায়ন করা

যোগ্য লোকের যোগ্যতা, গুণী মানুষের গুণ গরিমা ও জ্ঞানী জনের জ্ঞানের মূল্যায়ন করতে না পারা মনের উদারতার পরিচায়ক নয়। অন্যের মূল্যায়ন হলে আমি ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন হব-এরূপ একটি সংকীর্ণ মানসিকতা থেকেই এর জন্ম হয়। জ্ঞান, গুণ, যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের অকপট স্বীকৃতি এবং এসবের আরও অধিকতর উৎকর্ষ সাধনের জন্য আনুকূল্য সৃষ্টির চেতনাই হল উদারতা। হাদীছের কিতাবে উল্লেখিত "সাহাবীদের মর্যাদা" শীর্ষক অধ্যায়ের হাদীছগুলোতে আমরা দেখতে পাই রাসূল (সা.) কত উদারভাবে সাহাবীদের গুণের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। দাওয়াতের অধ্যায়ে "মাদউর যোগ্যতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি" শীর্ষক পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে কিছু নমূনাও পেশ করা হয়েছে। মুসনাদে দায়লামীতে উল্লেখিত একটা হাদীছে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

اِنَّمَا يَعْرِفُ الْفَضْلَ لِذَوِى الْفَضْلِ اَهْلُ الْفَضْلِ،

অর্থাৎ, গুণীলোকই গুণীজনের গুণ চিনে থাকে। (অর্থাৎ, তার মূল্যায়ন করে থাকে) [আল মাকাসিদুল হাছানাহ, ১২৫]

আল্লামা সাখাবী বলেছেন, এ হাদীছের সনদ দুর্বল হলেও এর অর্থ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। গুণীজনের গুণের মূল্যায়ন করার জন্য এতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

(খ) অন্যের সুখে-দুঃখে সহমর্মিতা ও সহানুভূতি প্রকাশ

অন্যের সুখে কাতর হওয়া বা অন্যের দুঃখে আনন্দবোধ করা সংকীর্ণ মানসিকতারই ফসল। আত্মকেন্দ্রিক মন যখন অন্যের সুখ দেখে, তখন নিজের মধ্যে সে সুখের অনুপস্থিতিতে শূন্যতাবোধ করতে থাকে এবং কাতর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অন্যের দুঃখ দেখে নিজেকে তার থেকে মুক্ত পেয়ে তৃপ্তি অনুভব করতে থাকে। অন্যের বিষয়কে আপন ভেবে নিজের মনে স্থান দেয়ার মত তার মনে প্রশস্ততা থাকে না, এটাই হল সংকীর্ণতা। এই সংকীর্ণতার ফলেই অন্যের বিষয়কে সে নিজের মত করে ভাবতে পারে না। এরূপ সংকীর্ণতা বা আত্মসর্বস্বতার মনোবৃত্তি দূর করার জন্য হাদীছে বলা হয়েছে,

اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهُ اِشْتَكٰى كُلُّهُ وَاِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهُ اِشْتَكٰى كُلُّهُ، رواه مسلم (مشكاة ص ٤٢٢)

অর্থাৎ, সমস্ত মু'মিন এক ব্যক্তির (দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) ন্যায়, তার চোখ অসুস্থ হলে তার সারা দেহ অসুস্থ হয়ে যায়, আর তার মাথা অসুস্থ হলে তার সারা দেহ অসুস্থ হয়ে যায়। (মেশকাত : ৪২২ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ, দেহের এক অংশ অসুস্থ হলে যেমন সারা দেহে সে কষ্টের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে, তদ্রূপ এক মু'মিনের দুঃখ কষ্টের অনুভূতি অন্য মু'মিনের মধ্যেও বিস্তৃত হতে হবে, কেননা সমগ্র মু'মিন সম্মিলিতভাবে একটা দেহ সদৃশ। হাদীছের প্রথম অংশটি "সমস্ত মু'মিন মুসলমান একটা দেহ সদৃশ" কথাটি সহমর্মিতা জ্ঞাপনের জন্য অত্যন্ত অর্থবোধক। সকলের দুঃখে সকলে দুঃখিত হবে, তদ্রূপ সকলের সুখে সকলে সুখী হবে, কারণ সকলেই যে এক দেহ সদৃশ। সহমর্মিতা জ্ঞাপক বা সহমর্মিতা উদ্দীপক প্রকাশভঙ্গি এর থেকে সুন্দর আর দ্বিতীয়টি হতে পারে বলে মনে হয় না।

প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে হযরত মুআয ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছের একাংশে রাসূল (সা.) বলেছেন,

وَاَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّيْتَهُ وَاَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ عَزَّيْتَهُ .... الخ

অর্থাৎ, আর যদি তার কোন কল্যাণ বা সুখকর কিছু ঘটে, তাহলে তাকে মোকারকবাদ জানাবে এবং যদি তার কোন বিপদ ঘটে তাহলে তাকে সান্ত্বনা দিবে। (ফাতহুল মুলহিম : ১ম খণ্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা)

(গ) কারও পশ্চাতে লেগে না থাকা

অন্যের পশ্চাতে লেগে থাকা বা অন্যের ছিদ্র অণ্বেষণ করে বেড়ানো কিম্বা অন্যের কথায় পড়ে কারও প্রতি কু-ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়া অথবা কারও প্রতি অমূলক বদ ধারণায় বদ্ধমূল হয়ে যাওয়া মনের সংকীর্ণতারই পরিচায়ক। যার মন উদার, যার মন প্রশস্ত, তার বহু বিষয় ভাববার থাকে, বহু বিষয় তার মনে স্থান পায়; সে অন্যের ছিদ্র অণ্বেষণ করার জন্য কারও পশ্চাতে লেগে থাকে না। যার মন উদার সে কারও কানকথায় পড়েই কারও প্রতি কু-ধারণার বশবর্তী হয়ে যায় না বরং ধীরে সুস্থে চিন্তা ভাবনা করতে ও শ্রুত সংবাদের ইতিবাচক নেতিবাচক সব দিক নিয়ে ব্যাপক পরিসরে ভেবে দেখতে পারে। কারও পশ্চাতে এরূপ লেগে থাকার বিরুদ্ধে হাদীছে ঘোষণা করা হয়েছে,

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ. وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَاتَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَافَسُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَاتَبَاغَضُوْا وَلَاتَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ اِخْوَانًا. (مسلم ج :٢ ص : ٣١٦)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত-রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কু-ধারণায় বদ্ধমূল হওয়া থেকে বিরত থাক; কেননা, কু-ধারণা (এবং তার ভিত্তিতে উক্তি করা) জাজ্বল্যমান মিথ্যা উক্তি। আর কারও কানকথায় পড় না, কারও ছিদ্র অণ্বেষণ কর না, দুনিয়া কামনার প্রতিযোগিতায় পড় না, পরস্পরে হিংসা বিদ্বেষ কর না এবং একে অপরের পশ্চাতে লেগনা। বরং হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা (এগুলো পরিত্যাগ করে) পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও। (মুসলিম : ২য় খণ্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

(ঘ) অধিকাংশ সমালোচনা মনের সংকীর্ণতারই বহিঃপ্রকাশ

সমালোচনার আভিধানিক অর্থ কারও দোষ-গুণের যথানুরূপ আলোচ-না করা। এ প্রেক্ষিতে কারও গুণের আলোচনা বা গুণ চর্চাও সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত। তবে সাধারণ পরিভাষায় সমালোচনা বলতে পশ্চাতে অন্যের দোষ চর্চাকেই বোঝায়। সংশোধন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যখন নিজেদের মধ্যে নিজেদের দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা হয়

তখন সেটাকে গঠনমূলক আলোচনাভুক্ত মনে করা হয়। মার্জিত ভাষায় হলে এরূপ আলোচনা পর্যালোচনা কারও আত্মমর্যাদায় আঘাত হানে না। আবার কারও পশ্চাতে তার দোষ-ত্রুটির উল্লেখ যদি কোন মহৎ উদ্দেশ্যে হয় তখন নিন্দনীয় হয় না; যেমন কারও অনিষ্ট থেকে অন্যকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অনিষ্টকারীর কোন দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করা হয়, এটাকে সমালোচনা নয় বরং সতর্কবাণী বলা হয়। তদ্রূপ কারও কোন দোষ-ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে যদি তার গুরুজনকে সে সম্পর্কে কিছু অবহিত করা হয় এরূপ দোষ-ত্রুটির আলোচনা করা সমালোচনা নয় বরং কল্যাণকামিত-া। এমনিভাবে বিশেষ প্রয়োজনে যদি কারও দোষ-ত্রুটির আলোচনা অন্যের সাথে করতে হয় যেমন ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য কিম্বা বিচার চাওয়ার জন্য বিচারকের দরবারে যে আরজি পেশ করা হয় এবং তখন অন্যের যেসব দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করতে হয় এটাকেও সমালোচনা নয় বরং ঘটনার বৃত্তান্ত পেশ বলা হয়। সমালোচনা একমাত্র দোষ-ত্রুটি আলোচনার সেগুলোকেই বলা হয় যা কারও পশ্চাতে তার মানহানী, মর্যাদা লাঘব এবং অন্যের সামনে তাকে ক্ষুদ্র করে দেখানো বা হেয় প্রতিপন্ন করার হীন উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে কিম্বা কোন বিশেষ প্রয়োজন বা মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়াই অবলিলায় অন্যের দোষ চর্চা করে নিজেকে তার থেকে মুক্ত বলে জাহির করার অপপ্রয়াসে হয়ে থাকে। এরূপ আলোচনাকে ইসলামের পরিভাষায় সাধারণত "গীবত" এবং কোন কোন ক্ষেত্রে "সাব্ব" দ্বারা ব্যক্ত করা হয়, যা হারাম করা হয়েছে।

এই সমালোচনার অধিকাংশই হয়ে থাকে মনের সংকীর্ণতা থেকে। অন্যের মান-মর্যাদা, সুনাম-সুখ্যাতি ও প্রভাব প্রতিপত্তিকে নিজের মনে আপন করে স্থান দেয়ার মত উদারতার অভাব থেকেই এর জন্ম হয়। আবার জিদ, প্রতিহিংসা, বিরোধ প্রভৃতি থেকেও সমালোচনার মানসিকতা জন্ম নিতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রেও বলা যায় তার মধ্যে ক্ষমা করার মত কিম্বা বিরোধ ভুলে যাওয়ার মত উদারতার অভাব রয়েছে, অন্য ভাষায় যা এক ধরনের সংকীর্ণতা।

সমালোচনার থেকে যেগুলোকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে, তার প্রত্যেক-টির ব্যতিক্রম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছ থেকে দলীল রয়েছে; গ্রন্থের কলেবর দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় তার উল্লেখ পরিত্যাগ করা হল।

(নয়) মমত্ববোধ প্রকাশ করা

স্নেহ এবং মমতার প্রয়োজনীয়তা আলোচনার অবকাশ রাখে না। স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা না থাকলে গোটা বিশ্ব চরাচর অচল হয়ে পড়ত। শিশুর প্রতি যদি মায়ের স্নেহ না থাকত, ক্ষুদ্রের প্রতি বড়র করুণা যদি না জাগত, অসহায়ের প্রতি সহায়ের যদি মমত্ববোধ না হত, তাহলে প্রকৃতির যাত্রা স্তব্ধ হয়ে যেত। কিন্তু এই মমত্ববোধ শুধু থাকা নয় বরং বহু ক্ষেত্রেই তার প্রকাশও আবশ্যক। প্রকাশবিহীন মমত্ববোধ অন্যের মনকে আপ্লুত করতে পারে না। মমত্বের প্রকাশ অন্যের মনকে আপ্লুত করে, এর মাধ্যমে হৃদ্যতার বিনিময় ঘটে ও পরস্পর ভালবাসা সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়ে ইসলামী মুআশারায় যে সব নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে তার কতিপয় নিম্নরূপ।

(ক) অসুস্থের শুশ্রূষা

অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত অবস্থায় মানুষের মন ভেঙ্গে যায় এবং নিজেকে সে অসহায় ভাবতে থাকে। এমতাবস্থায় তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনকে শুশ্রূষার্থে কাছে পেলে এবং যত্ন পেলে মানসিকভাবে সে চাঙ্গাবোধ করতে থাকে। ইসলাম রোগীর শুশ্রূষাকে সুন্নাত ও মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকার বলে সাব্যস্ত করেছে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ. قِيْلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهٗ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ.

অর্থাৎ, রাসূল (সা.) বলেন, মুসলমানের ওপর মুসলমানের হক ছয়টি। জিজ্ঞেস করা হল সেগুলো কি? তিনি বললেন, তার সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম দিবে, তোমাকে দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করবে, তোমার কাছে উপদেশ চাইলে তাকে উপদেশ দিবে, হাঁছি দিয়ে আল-হামদুলিল্লাহ পড়লে (ইয়ারহামুকা-ল্লাহ বলে) তার উত্তর দিবে এবং অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করবে আর মৃত্যুর পর তার (জানাযায়) পিছে পিছে যাবে। (মুসলিম, ২য় খণ্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা)

অনেকে বিশেষ বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে রোগ নিজের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে রোগীর ধারে কাছেও যায় না, যদিও ইসলামী চিন্তাধারায় রোগের মধ্যে সংক্রমণের নিজস্ব ক্ষমতা নেই। আল্লাহর ফয়সালা হলেই একমাত্র কেউ আক্রান্ত হতে পারে। কোন কোন রোগীর সংস্পর্শ থেকে দূরে

সরে যাওয়ার যে নির্দেশ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে সে ক্ষেত্রেও একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে, তা হল- রোগীর সংস্পর্শে আসার পর আল্লাহ্র ফয়সালা হওয়ার কারণেই কেউ আক্রান্ত হলে সে মনে করতে পারে যে, রোগীর সংস্পর্শে যাওয়ার কারণেই রোগ তার মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। এভাবে তার আকীদা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তা যেন হতে না পারে, সে জন্যেই অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা এসেছে। বস্তুত আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া কেউ কোন রোগে আক্রান্ত হয় না। তাছাড়া এটাও বাস্তবে প্রমাণিত যে, অনেক ক্ষেত্রেই কিছুই হয় না। অতএব একটা সম্ভাবনাময় আশংকার ভিত্তিতে কোন রোগীর সংস্পর্শ ত্যাগ করলে তার মানসিক অবস্থা কি হয় তাও ভেবে দেখার প্রয়োজন। এরূপ হলে রোগী তখন নিজেকে কতটা অসহায় এবং অপাংক্তেয় মনে করতে থাকে তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। তদুপরি একাকী ফেলে রাখার দরুণ তার প্রয়োজনাদি পূর্ণ না হলে ভোগান্তির দিকটিতো রয়েছেই। রোগীর শুশ্রূষা না হলে তাই দু'পক্ষের মনের দূরত্ব বাড়তে থাকে, যা সমাজের পারস্পরিক বন্ধনকে দুর্বল থেকে দুর্বলতম করতে করতে সমাজ জীবনের ভালবাসার বন্ধনকে একেবারেই দুর্বল করে দিতে পারে।

রোগী অসুস্থ অবস্থায় অনেক সময়ই মন ভেঙ্গে ফেলে এবং জীবনের আশা ত্যাগ করে দেয়, তাই শুশ্রূষার সময় তার মনে সাহস যোগানোর শিক্ষা দেয়া হয়েছে। হায়রে কী মারাত্মক অবস্থা! আহা এখন কী উপায় হবে! এ জাতীয় কথা বলে তার মন আরও ভেঙ্গে দেয়া উচিৎ নয়। দরদ বা সমবেদনা প্রকাশের ভাষাও এমন হওয়া উচিৎ যা রোগীর মধ্যে বিরূপ মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে। বোখারী ও মুসলিম শরীফে রোগীর সামনে এরূপ বলার কথা বর্ণিত আছে। রাসূল (সা.) রোগীর শুশ্রূষা করতে গেলে বলতেন,

لَابَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ.
(بخارى ج : ٢ ص : ٨٤٥)

অর্থাৎ, কোন অসুবিধে নেই, ইনশাআল্লাহ ভাল হয়ে যাবে। (বোখারী : ২য় খণ্ড, ৮৪৫ পৃষ্ঠা ও মেশকাত : ১ম খণ্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

অসুস্থ অবস্থায় মানুষের মনে মৃত্যুর আশংকা জাগার ফলে সে তখন নিজের জীবনের অন্যায় সমূহের চিন্তা করে মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে এবং পরকালে তার উপায় কি হবে এসব ভেবে তার হতাশা বৃদ্ধি পায় কিম্বা জাতির জন্য, মানুষের জন্য, উত্তরাধিকারীদের জন্য সে তেমন কিছু করে যেতে পারল না ভেবে নিজের প্রতি ধিক্কার জাগে; এসব মনস্তাত্ত্বিক দিকগু-

লার প্রেক্ষিতেই খুব অসুস্থ বা মুমূর্ষ ব্যক্তির শুশ্রুষার প্রাক্কালে তার জীবনের কৃত ভাল দিকগুলোর উল্লেখ পূর্বক তার মনের ভয়-ভীতি দূর করার ও তার মনকে চাঙ্গা করার নীতি রয়েছে। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে– হযরত ওমর (রা.) যখন আবূ লু'লুআ কর্তৃক আহত হয়ে কাতরাতে থাকেন (এবং নিজের সম্পর্কে শংকায় পতিত হন) তখন ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর ভীতি কাটানোর জন্য বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! ওরকম হবে না, আপনি উত্তমভাবে রাসূল (সা.)-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত রাসূল (সা.) আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর আবূ বকরের সাহচর্যে কাটিয়েছেন এবং তাও উত্তমভাবে সম্পন্ন করেছেন আর শেষ পর্যন্ত তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। (বোখারী : ১ম খণ্ড, ৫২১ পৃষ্ঠা)

এরূপ হযরত আলী (রা.), হযরত আমর ইবনুল আস (রা.), হযরত আয়েশা (রা.) প্রমুখের মৃত্যুর পূর্বে বিভিন্ন সাহাবী কর্তৃক তাঁদের জীবনের ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করতঃ তাঁদের মনকে শান্ত ও চাঙ্গা করার প্রমাণ রয়েছে। "চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান" অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অসুস্থ অবস্থায় মেজায খুব নাজুক থাকে এবং প্রয়োজনও বিভিন্ন রকম দেখা দেয়, অতএব খুব দীর্ঘ সময় তার কাছে থাকলেও তার মেজায বিগড়ে যেতে পারে এবং এরূপ শুশ্রুষা তার দৈহিক ও মানসিক যুগপৎ কষ্টের কারণ হতে পারে। তাই হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে,

مَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا فَلْيُخَفِّفْ جُلُوْسَهُ.

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ রোগীর শুশ্রুষা করতে গেলে অবস্থান সংক্ষেপ করবে। (আদাবুল মুআশারাত : ২৪২ পৃষ্ঠা)

রোগীর সামনে তার জন্য আরোগ্য লাভের দু'আ করা, তার শরীরে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করা কেমন আছেন বা কেমন লাগছে? ইত্যাদি বিষয়ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এর দ্বারা রোগীর মনে শক্তি যোগায় এবং তার মন আপ্লুত হয়।

(খ) আর্তমানবতার সেবা

দুঃখী, শোকাহত এবং নিঃস্ব মানুষ-যারা নিজেদেরকে অসহায় বোধ করতে থাকে-তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে, তাদের দিকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলে তারা কতখানি আপ্লুত হয় তা এরূপ পরিস্থিতির শিকার ব্যক্তি মাত্রেই খুব সহজে উপলব্ধি করতে পারে। আর একমাত্র মমত্ববোধ

শূন্য পাষন্ড হৃদয়ের মানুষই এরূপ আর্তমানবতার আহবানকে উপেক্ষা করতে পারে। দীন-দুঃখী, বিধবা ও নিঃস্ব মানুষের সহযোগিতাকে তাই উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন,

اَلسَّاعِيْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَـالْـمُـجَاهِدِ فِـىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. (بخارى ج : ٢ ص : ٨٨٨)

অর্থাৎ, বিধবা ও নিঃস্ব মানুষের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থাকারী আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদকারীর সমতুল্য। (বোখারী : ২য় খণ্ড, ৮৮৮ পৃষ্ঠা)

এতীমের লালন-পালনকারী সম্বন্ধে রাসূল (সা.) বলেন,

اَنَا وَكَافِلُ الْـيَـتِـيْمِ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَقَالَ بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى. (بخارى ج : ٢ ص : ٨٨٨)

অর্থাৎ, রাসূল (সা.) হাতের মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলি যুক্ত করে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, আমি ও এতীমের লালন-পালন-কারী জান্নাতে এরকম (অর্থাৎ, এক সাথে) থাকব। (বোখারী : ২য় খণ্ড, ৮৮৮ পৃষ্ঠা)

(গ) মৃতের পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান

মৃতের পরিবারকে তা'যিয়া (تَعْزِيَةٌ) করা মুস্তাহাব। তা'যিয়া অর্থ দুঃখ ও কষ্টবোধ লাঘব করার উদ্দেশ্যে মৃতের পরিবারকে সান্ত্বনামূলক কথা বলা। এর দ্বারা একদিকে যেমন মমত্ববোধ ও সমবেদনা প্রকাশ পায়, যার দরুণ মৃতের পরিবারের দুঃখবোধ লাঘব হয়; কেননা, মানুষ একই কষ্টে যখন অনেককে শরীক দেখতে পায় তখন তার নিজের কষ্টবোধ লাঘব হয়-অপর দিকে মৃতের পরিবার আপনজন হারানোর শোকে মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলে, ফলে নিজেকে সান্ত্বনা প্রদানের ভাষা বা পন্থা তারা খুঁজে পায় না- এমতাবস্থায় অন্যের সান্ত্বনা বাণী তদের মনকে শান্ত করতে পারে।

শুধু মৃত্যুজনিত শোক-দুঃখে নয়, ইসলামী মুআশারায় যে কোন বিপদ-মুসীবত ও শোক-দুঃখে সান্ত্বনা প্রদানের নীতিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইবনে মাজা ও বায়হাকী গ্রন্থে উত্তম সনদে হযরত আমর ইবনে হায্‌ম (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছে নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন,

مَا مِنْ مُّؤْمِنٍ يُعَزِّيْ اَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ اِلَّا كَسَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থাৎ, কোন মু'মিন তার ভাইকে বিপদ মুসীবতের সময় সান্ত্বনা প্রদান করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মানের এক জোড়া পোষাক পরিধান করাবেন। (কিতাবুল আযকার : ১৩৫ পৃষ্ঠা)

যারা মৃতের শহর থেকে অন্যত্র কিম্বা প্রবাসে থাকেন তাদের ব্যাপার স্বতন্ত্র, তবে স্থানীয় লোকদের জন্য এই তা'যিয়া বা মৃতের পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান মোটামুটি তিন দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে। কেননা, সাধারণতঃ তিন দিনের মধ্যে অন্তরের শোক স্তিমিত হয়ে যেতে পারে, এমতাবস্থায় এর পরেও সান্ত্বনা প্রদান করতে গেলে শোকাহত মানুষের প্রায় ভুলে যাওয়া পুরাতন শোক আবার তাজা হয়ে যেতে পারে যা সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যেরই পরিপন্থী।

তদ্রূপ সান্ত্বনা প্রদানের ভাষাও এমন হবে, যাতে বিপদগ্রস্ত ও শোকাহত মানুষের শোক দুঃখ লাঘব হয় এবং তার বৃদ্ধি না ঘটে। যদিও সান্ত্বনা প্রদানের ভাষা ইসলাম নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ করে দেয়নি, তবুও বিষয়টি লক্ষ্য রাখা জরুরী, অন্যথায় তা'যিয়ার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। উদাহরণ স্বরূপ যদি বলা হয় আহা, যুবক ছেলে; এই বয়সেই মৃত্যু হয়ে গেল, কী আর তেমন বয়স হয়েছে! কিংবা আহা! কী যন্ত্রণা পেয়ে মারা গেল ইত্যাদি। এ জাতীয় কথা শোকের ক্ষতে লবণের ছিটার সংযোগ করবে নিঃসন্দেহে। অনেক মহিলা বা মহিলা স্বভাব পুরুষকে দেখা যায় শোকাহত পরিবারের সদস্যদের গলা জড়িয়ে ধরে সুরে সুর মিলিয়ে কিংবা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদা জুড়ে দেয়। আবার অনেকে মৃত্যু যন্ত্রণা বা মৃত্য-রোগের আদ্যপান্ত জিজ্ঞাসা শুরু করে দেয়। এসব পন্থায় শোকাহত পরিবারের সান্ত্বনা হয় না বরং উল্টো হয় বিধায় এগুলো তা'যিয়ার সমর্থিত পন্থা নয়। হাদীছে বর্ণিত রাসূল (সা.)-এর তা'যিয়া বা সান্ত্বনা প্রদানের ভাষা এবং বুযুর্গানে দ্বীনের আমল থেকে বোঝা যায় নিম্নে বর্ণিত এ জাতীয় ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে; যেমনঃ ভাই! সকলেরই চলে যেতে হবে, যার যাওয়ার ছিল সে চলে গেছে, আমরা কাঁদলে তো আর সে ফিরে আসবে না! আমরা সবর ও ধৈর্য ধারণ করলে ছওয়াব লাভ করতে পারব। কিম্বা আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন বা আল্লাহ্র সম্পদ আল্লাহ নিয়ে গেছেন, সব কিছুরইতো সময় তিনি নির্ধারিত করে রেখেছেন,

এখন যে চলে গেছে তার উপকারের চিন্তা করতে হবে, তার জন্য ছওয়াব রেছানী করতে হবে, তার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে হবে ইত্যাদি। রাসূল (সা.) কর্তৃক সান্ত্বনা বাক্যে ব্যবহৃত একটি ভাষ্য নিম্নরূপ,

اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَيْئٍ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَ لْتَحْتَسِبْ. (بخاري ج : ٢ ص : ٨٤٤)

অর্থাৎ, যা কিছু আল্লাহ নিয়ে যান এবং যা কিছু দান করেন সবকিছুর তিনিই মালিক। তাঁর নিকট সব কিছুর সময় নির্ধারিত রয়েছে। সে (শোকাহত পরিবার) যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং (এটাকে) ছওয়াব মনে করে। (বোখারী : ২য় খণ্ড, ৮৪৪ পৃষ্ঠা)

মৃতের গৃহে খাদ্য প্রেরণ, পরোপকার প্রভৃতি নীতি ইসলামী মুআশারায় রয়েছে যার দ্বারা মমত্ব প্রকাশ পেয়ে থাকে। এখানে নমূনা স্বরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হল মাত্র।

(দশ) মানসিক অবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যতা বিধান

মানুষের মনের আবেগ, আকুতি, স্পৃহা প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে তার জন্য তাকে অনেক খেসারত দিতে হয়। এসব মানসিক অবস্থার ভাল-মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক উভয় দিক ও উভয় রকম পরিণতি রয়েছে। ভাল ও ইতিবাচক পরিণতি লাভের জন্য প্রয়োজন এগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যতা বিধান করা। আর এই নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যতা বিধান সম্ভব নয় যদি না মনের শক্তি অর্জন করা যায়। এ পর্যায়ভুক্ত কয়েকটি নীতিমালা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি।

(ক) গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে না যাওয়া

ভাল ব্যবহার পেলে, উপকার পেলে মন আপ্লুত হয় এবং প্রতিদানে ভাল ব্যবহার ও প্রত্যুপকার করতে সহজে মনের সাড়া পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে কারও থেকে ভাল ব্যবহার না পেলে বা দুর্ব্যবহার পেলে কিংবা কার কর্তৃক ক্ষতির সম্মুখীন হলে মন সংকুচিত হয়ে যায়, মনে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগে, জীঘাংসা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। বিরূপ আচরণের ফলে মনে এই যে বিরূপ মানসিকতার আহ্বান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়, এর পশ্চাতে অন্ধের ন্যায় সাড়া দেয়া হল গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়া। ভাল-মন্দ বিচার-বিবেচনা না করেই মনের আহ্বানে এরূপ অন্ধ অনুগমন দ্বারা সমাজ

জীবনে বহু অনাসৃষ্টি জন্ম নিতে পারে। উভয় পক্ষের তীক্ততা বৃদ্ধি পেতে পারে, সংঘর্ষ ব্যাপকতর হতে পারে, উভয়ের মধ্যে বিরোধ বিস্তৃত হতে পারে, দূরত্ব ও ব্যবধান বাড়তে পারে। পক্ষান্তরে মনকে নিয়ন্ত্রণ করে মন্দ ব্যবহারের পরিবর্তে অন্ততঃ মন্দ ব্যবহার থেকে যদি বিরত থাকা যায় কিম্বা মনকে শক্ত করে মন্দের পরিবর্তে যদি ভাল ব্যবহার করা যায়,তাহলে প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে বিনীত করা সম্ভব হয়। ইসলামে সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণের নীতি বৈধ হলেও ক্ষমা বা তারও উর্ধে মন্দকে ভাল দ্বারা জয় করার নীতিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে না যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

لَا تَكُوْنُوْا إِمَّعَةً، تَقُوْلُوْنَ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا، وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوْا، وَإِنْ أَسَائُوْا فَلَا تَظْلِمُوْا . (ترمذي ج ٢ ص ٢١)

অর্থাৎ, তোমরা মানুষ ভাল ব্যবহার করলে আমরা ভাল ব্যবহার করব আর মন্দ ব্যবহার করলে আমরা মন্দ ব্যবহার করব-এরূপ বলে গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে যেওনা। বরং নিজেদের মনকে দৃঢ় কর এই মর্মে যে, মানুষে ভাল ব্যবহার করলে তোমরা ভাল ব্যবহার করবে এবং মন্দ ব্যবহার করলে মন্দ ব্যবহার করবে না। (তিরমিযী : ২য় খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা)

আত্মীয়-স্বজন সুসম্পর্ক বজায় রাখলে আমিও অনুরূপ প্রতিবিধান করব অর্থাৎ, আত্মীয়তার সু-সম্পর্ক বজায় রাখব, আর তারা আত্মীয়তার সু-সম্পর্ক ছিন্ন করলে আমি ছিন্ন করে দেব-এরূপ মানসিকতাও উপরোক্ত নীতির আলোকে বিবেচিত হবে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মানুষ প্রকৃত পক্ষে আত্মীয়তার সু-সম্পর্ক বহালকারী নয় বরং তাকে কেবল প্রতিবিধানকারী বলা যায়। প্রতিপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন করলে তা পুনঃবহালকারীকেই মূলতঃ সু-সম্পর্ক বহালকারী বলা যায়। আর এরূপ করতে হলে প্রয়োজন গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসানোর মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করা এবং মনকে নিয়ন্ত্রণ ও দৃঢ় করা। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন,

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيْ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ اِذَا

অর্থাৎ, যে শুধু প্রতিবিধান করে সে আত্মীয়তার সু-সম্পর্ক বহালকারী নয়, বরং আত্মীয়তার সু-সম্পর্ক যখন ছিন্ন করা হয় তখন যে তা জুড়ে রাখে

قُطِعَتْ رِحْمُه وَصَلَهَا. (بخاري ج : ٢ ص : ٨٨٦)

সে-ই প্রকৃত আত্মীয়তার সু-সম্পর্ক বহালকারী। (বোখারী : ২য় খণ্ড, ৮৮৬ পৃষ্ঠা)

(খ) ভাল দ্বারা মন্দকে জয় করা

মনস্তাত্বিকভাবে মানুষ নিজেকে সব সময় জয়ী করতে এবং জয়ী ভাবতে চায়। মন্দের উত্তর মন্দ দ্বারা দেয়া হলে প্রতিপক্ষ নিজেকে জয়ী করার জন্য আরও মন্দের দিকে অগ্রসর হবে, গালির জওয়াবে গালি দিলে প্রতিপক্ষ পূর্বের তুলনায় আরও শক্ত গালি দিতে উদ্বুদ্ধ হবে। এরূপে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকবে। পক্ষান্তরে মন্দের জওয়াব ভাল দ্বারা দেয়া হলে প্রতিপক্ষ আর অগ্রসর হবে না, প্রতিপক্ষের মনের ক্ষোভ উদ্বেলিত হওয়ার কোন উস্কানি থাকবে না, ফলে তার মন শান্ত হবে, শান্ত মনে নিজের আচরণ সম্পর্কে সে চিন্তা করতে পারবে এবং নিজের ভুল বুঝতে পারবে ও প্রতিপক্ষের আচরণের উৎকর্ষে সে মুগ্ধ হবে। এভাবে একজন বৈরী শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে। তবে এর জন্য প্রয়োজন মনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। নিয়ন্ত্রণহীনভাবে স্পৃহার উচ্ছাসে যারা ভেসে যায় তারা মনস্তাত্বিক এই প্রক্রিয়ায় শত্রুকে জয় করতে পারে না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَ لَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ وَ مَا يُلَقّٰهَاۤ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا. الاية.

অর্থাৎ, ভাল ও মন্দ সমান নয়। ভাল দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর। তখন দেখবে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এটা তারাই লাভ করতে পারে যারা সবর (অর্থাৎ, মনকে নিয়ন্ত্রণ) করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতের নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, তার মোকাবিলায় তুমি সবর কর, যে তোমার প্রতি মূর্খতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন কর এবং যে তোমাকে জ্বালাতন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর (মাযহারী)। এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)কে জনৈক ব্যক্তি গালি দিল অথবা মন্দ বলল। তিনি জওয়াবে বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও এবং আমি অপরাধী ও মন্দ হই, তবে আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। পক্ষান্তরে যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক তবে আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাকে ক্ষমা করেন। (কুরতুবী)

বস্তুতঃ বাস্তব অভিজ্ঞতায়ও আমরা দেখতে পাই একজন ক্রোধোন্মত্ত, প্রতিশোধ স্পৃহায় উদ্বেলিত ব্যক্তিকে সদাচার ও হাসি মুখ দ্বারা যত সহজে ঘায়েল করা যায়, পাল্টা আচরণ দ্বারা তার কিছুই সম্ভব হয় না।

বি. দ্র. বিভিন্ন মানসিক প্রতিকূল অবস্থায় মনকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি সম্পর্কে 'চরিত্র মনোবিজ্ঞান' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দুটি ক্ষেত্রে মন নিয়ন্ত্রণের বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে।

(গ) ক্রোধ এর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল-প্রতিশোধ গ্রহণ, পেশীশক্তি প্রদর্শন প্রভৃতি দৈহিক শক্তি চরিতার্থ করা দ্বারা যে কাজ সম্ভবপর নয়, মনের নিয়ন্ত্রণ বা মনের শক্তি দ্বারা তা সম্ভব। বস্তুত মনের শক্তির সামনে দৈহিক শক্তি পরাজিত হয়। মনের শক্তিই প্রকৃত শক্তি। ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ ও পেশীশক্তি দমন করতেও প্রয়োজন এই শক্তির। যে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম সে দৈহিকভাবে দুর্বল হলেও একজন পাহলোয়ান থেকেও অধিকতর শক্তিশালী। একজন পাহলোয়ান যাকে বশ মানাতে না পারে; ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ, পেশীশক্তি দমন, ক্ষমা গুণ প্রভৃতি মানসিক শক্তির সাহায্যে একজন ক্ষীণকায় ব্যক্তিও তাকে বশে আনতে সক্ষম। হাদীছে তাই ইরশাদ হয়েছে, নবী কারীম (সা.) বলেন,

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ. (مسلم ج : ٢ ص : ٣٢٦)

অর্থাৎ, অন্যকে আছাড় দিতে পারঙ্গম ব্যক্তি পাহলোয়ান নয়। প্রকৃত পাহলোয়ান সেই, যে ক্রোধের সময় নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (মুসলিম : ২য় খণ্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

(ঘ) ভালবাসা ও শত্রুতার ক্ষেত্রে মনের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা

মানুষের অন্তরের অবস্থা স্বভাবতঃই পরিবর্তনশীল। আরবীতে অন্তরকে তাই বলা হয় "ক্বলব" যার ধাতুগত অর্থ পরিবর্তনশীল। এই মুহূর্তে অন্তরের বা মনের যে অবস্থা, পরবর্তী মুহূর্তেই তার ব্যাপারে মনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। যার সাথে আজ সখ্যতা ও আন্তরিকতা রয়েছে কাল তার পরিবর্তন ঘটতে পারে। আবার আজ যার সাথে ঘোর শত্রুতা, বিচিত্র নয় যে কালই সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। সুতরাং বন্ধুত্বে

ভালবাসা, শত্রুতা, বৈরিতা কোন মানসিক অবস্থাতেই আবেগের উচ্ছাসে লাগামহীন হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। আজ ভালবাসার উচ্ছাসে লাগামহীন হয়ে বন্ধুর কাছে নিজের ব্যক্তিত্ব বা একান্ত গোপনীয়তা আবরণ মুক্ত করে দিলে একদিন সেই বন্ধুই শত্রু হয়ে পড়লে আমার জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে শত্রুতা চরিতার্থ বেপরোয়া হলে কাল যখন এই শত্রুই বন্ধুতে রূপ নেবে তখন বিবেকের দংশন ও শরমের অন্ত থাকবে না। ভালবাসা, শত্রুতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাই মনের আবেগ উচ্ছাসের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। হাদীছে কত সুন্দরভাবে নবী কারীম (সা.) এ কথাটিই ইরশাদ করেছেন,

أَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَّا، عَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَّا، وَأَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَّا عَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَّا.

অর্থাৎ, তোমার বন্ধুকে তুমি ভালবাস ভারসাম্যতা রক্ষা করে; হতে পারে কোন দিন সে তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তোমার শত্রুর সাথে শত্রুতা পোষণেও ভারসাম্যতা রক্ষা কর; হতে পারে একদিন সে তোমার বন্ধুতে পরিণত হবে। (তিরমিযী : ২য় খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা)

(এগার) অন্যের মন থেকে দূরত্ববোধ কাটানোর পদ্ধতি

যার নিকট কেউ আগমন করে কিম্বা সে যার নিকট গমন করে উভয় ক্ষেত্রেই পরস্পরের মধ্যে দূরত্ববোধ থাকতে পারে। এ সাক্ষাৎ যদি দু'জন অপরিচিতের মধ্যে ঘটে তাহলে তো থাকবেই বলা চলে। সাক্ষাৎকালে মনের এই দূরত্ববোধ কাটিয়ে ওঠার এবং একে অপরের মনের কাছে আসার বেশ কতকগুলো মনস্তাত্ত্বিক নীতি রয়েছে। যেমন,

(ক) আগন্তুককে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

কোন সম্মানিত আগন্তুককে দূর থেকেই অভ্যর্থনা করে নিজের স্থানে নিয়ে আসা কিংবা সাধারণভাবে এবং সাধারণ ক্ষেত্রে নিজের স্থানে থেকেই আগন্তুককে বাচনিক অভ্যর্থনা জানানো উভয় প্রকার নীতি ইসলামী মুআশ-ারায় রয়েছে। এর দ্বারা আগন্তুক বুঝতে পারেন যে, আমাকে সাদরে গ্রহণ করা হচ্ছে, আমার আগমনে প্রতিপক্ষ আনন্দবোধ করছেন, কোনরূপ সংকীর্ণতা, বিরক্তি বা অসুবিধাবোধ করছেন না। এতে আগন্তুকের মন থেকে দূরত্ববোধ দূরীভূত হয়, প্রতিপক্ষকে নিজের আপনজন বোধ করতে থাকে এবং খুব অল্পতেই আগন্তুক সহজ হয়ে যেতে পারে। পিতা হযরত

ইয়াকূব (আ.) থেকে পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর যখন পুত্রের সাক্ষাতের জন্য হযরত ইয়াকূব (আ.) তাঁর গোটা পরিবার ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে নিয়ে কেনান থেকে মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন মিসর পৌঁছার সময় নিকটবর্তী হলে হযরত ইউসুফ (আ.) শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য শহরের দ্বারপ্রান্তে গমন করেন এবং অভিনন্দন জানান। সূরা ইউসুফের আয়াত–

اُدْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ.

অর্থাৎ, আল্লাহ্ চাহেতো আপনারা প্রশান্ত চিত্তে মিসরে প্রবেশ করুন। (সূরা ইউসুফ : ৯৯)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরের কিতাবে অভ্যর্থনার উক্ত কাহিনী উল্লেখ ও উক্ত নীতি প্রমাণিত করা হয়েছে।

নবী কারীম (সা.)-এর নিকট আব্দুল কায়ছ গোত্রের প্রতিনিধি দল আগমন করলে তিনি তাদেরকে "মারহাবা" (অর্থাৎ, আপনাদের আগমনে আমরা প্রফুল্ল, শুভাগমন) বলে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। (বোখারী : ২য় খণ্ড, ৯১২ পৃষ্ঠা) রাসূল (সা.) তাঁর আপনজন যেমন চাচাতো বোন উম্মে হানী এবং কন্যা ফাতেমাকেও 'মারহাবা' বলে অভ্যর্থনা করেছেন বলে জানা যায়। (প্রাগুক্ত)

মে'রাজে যখন রাসূল (সা.) বিভিন্ন আসমানে গমন করেন তখন প্রত্যেক আসমানে অবস্থিত হযরত আদম, ঈসা, ইউসুফ, ইদরীস, হারূন, মূসা, ইবরাহীম (আ.) প্রমুখ নবী রাসূলগণ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)কে "মারহাবা" (আপনার আগমন শুভ হোক) বলে অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা জানান। সিহাহে সিত্তায় বহু স্থানে এ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

(খ) হাসিমুখে সাক্ষাৎ

কারও সাথে আপনার সাক্ষাৎ হলে যদি তিনি গোমড়া মুখ করে থাকেন, তাহলে আপনার মনে হবে লোকটা আমাকে কোন পাত্তাই দিল না কিম্বা তিনি আমাকে আপন বলে মেনে নিতে পারেননি অথবা আমার আগমনে তিনি বিরক্তি বা সংকীর্ণতাবোধ করছেন বা তিনি আমার সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করেন না। ইত্যাকার ধারণা আপনাকে তার থেকে পূর্বের চেয়ে আরও দূরে নিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সাক্ষাৎকালে প্রতিপক্ষের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, একটু মুচকি হাসি, বিকশিত মুখ আপনাকে পূর্বের তুলনায় আরও কাছে টেনে নিবে কিম্বা পূর্বের দূরত্ববোধ কেটে যাবে। নবী কারীম (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতকারী মাত্রই পেতেন তাঁর থেকে মুচকি

হাসির এক ঝলক উপহার। হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন,

مَا حَجَبَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلَارَاٰنِيْ اِلَّا تَبَسَّمَ.

অর্থাৎ, আমার ইসলাম গ্রহণের কাল থেকে রাসূল (সা.) আমার কোন চাওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেননি এবং আমার সাথে সাক্ষাৎ হলেই তিনি মুচকি হেসে দিতেন। (শামায়েলে তিরমিযী : ১৫ পৃষ্ঠা)

হাসিমুখে সাক্ষাতকে নেক কাজ ও ছওয়াব বলে গণ্য করা হয়েছে এবং মুআশারার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব এত অধিক যে, এটাকে ক্ষুদ্র মনে করা উচিৎ নয়। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

لَاتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

অর্থাৎ, কোন নেক কাজকেই তুচ্ছ জ্ঞান করোনা, এমনকি হাসিমুখে তোমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতকেও। (মুসলিম : ২য় খণ্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা)

ইসলামী মুআশারার নীতিতে আপন-পর, শত্রু-মিত্র, স্বধর্মী-বিধর্মী নির্বিশেষে সকলেরই সাথে সামাজিকতার আচরণে এই ঔদার্য রক্ষার নীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মনের ক্ষোভ বিতৃষ্ণা প্রভৃতি চাপা দিয়ে হলেও বিকশিত মুখে সকলের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, আমরা এমন লোকদের সামনেও মুচকি হাসি দিয়ে থাকি, যাদেরকে আমাদের মন অভিশাপ দেয়। (বোখারী : ২য় খণ্ড, ৯০৫ পৃষ্ঠা)

(গ) সালাম, মোসাফাহা ও মুআনাকা

সালাম, মোসাফাহা, মুআনাকা প্রভৃতিও মনের দূরত্বকে দূরীভূত করে থাকে। যখন কারও সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন মনে নানা প্রকার চিন্তা জাগে- তিনি কোন অসদুদ্দেশ্যে আসেননি তো? তার কোন মন্দ অভিপ্রায় নেইতো? কিম্বা আমার কোন অকল্যাণ চিন্তায় এসেছেন কি? ইত্যবসরে যখন আগন্তুক সালাম পেশ করেন- যার অর্থ হল আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক অর্থাৎ, আমি আপনার শান্তি কামনা করি- তখন মনের দুশ্চিন্তা-র সব ঘোর কেটে যায় এবং আগন্তুককে নিজের একজন শান্তিকামী মানুষ হিসেবে মনে হতে থাকে। যদিও সালামের অর্থের প্রতি লক্ষ্য না দেয়ার কারণে আমাদের মনে সালাম তেমন প্রতিক্রিয়া করে না, তবে সালামের

এই আঙ্গিকটি যে অত্যন্ত মননশীল তা বোধ করি আর বেশী ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সালামের পর মোসাফাহা এই নৈকট্যবোধকে আরও জোরালো করে। আর দীর্ঘকাল অদেখা বা দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর-যখন দূরত্ব বেশী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, তখন- সাক্ষাতকালে নৈকট্যবোধকে বেশী শক্তিশালী করার প্রয়োজনে নীতি রাখা হয়েছে মুআনাকার। বুকের সাথে বুকের সংযোগ, দেহের সাথে দেহের মিলন আত্মার সাথে আত্মার ও মনের সাথে মনের অভিন্নতাই প্রকাশ করে দিবে। সালাম, মোসাফাহা, মুআনাকা যে মনের দূরত্ববোধ দূর করে থাকে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল যার সাথে মনের কষাকষি বা মনের দূরত্ব চলতে থাকে তাকে সালাম দিতে ইচ্ছা হয় না। মোসাফাহা মুআনাকা তো নয়ই। তখন মনে হতে থাকে সালাম দিলে যে প্রকাশ হয়ে গেল আমি দূরত্ব কাটিয়ে দিলাম অথচ প্রতিপক্ষ ঠিকই তার পূর্ব স্থানে থেকে গেল। এতে যে আমারই পরাজয় হচ্ছে, এতে যে প্রকাশ পাবে আমিই তার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চাই, এতে যে আমারই মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ পাবে? পক্ষান্তরে এরূপ পরিস্থিতিতে সালাম দেয়া হলে প্রতিপক্ষের মনের বরফও গলতে থাকে এভাবে ধীরে ধীরে উভয়ের মনের দূরত্ব কাটতে থাকে। হাদীছে তাই দু'জনের মধ্যে সালাম-কালাম বন্ধ থাকলে তাদের মধ্যে প্রথম যে সালামের সূচনা করবে তাকে উত্তম বলা হয়েছে। কেননা, সেই হবে দু'জনের মধ্যে দূরত্ব মোচন ও সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের সূচনাকারী। ইরশাদ হয়েছে,

لَايَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَيَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰذَا وَيَعْرِضُ هٰذَا وَ خَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. (بخارى ج : ٢ ص : ٨٩٧)

অর্থাৎ, কারও জন্য বৈধ নয় তার ভাইকে তিন দিনের অধিক ত্যাগ করে রাখা, যার ফলে দু'জনের সাক্ষাৎ হলে এ ওর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং ও এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আর তন্মধ্যে যে সালামের সূচনা করবে সেই শ্রেষ্ঠ। (বোখারী : ২য় খণ্ড, ৮৯৭ পৃষ্ঠা)

অধিকাংশ মুহাদ্দিছ এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, দু'জনের মধ্যে সালাম-কালাম বন্ধ থাকলে যে প্রথমে সালাম দিবে সে সম্পর্ক ত্যাগের পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে। (বোখারী : ২য় খন্ড, ৮৯৭) কেননা সালাম সম্পর্ক পুনঃস্থাপন ও দূরত্ব মোচনের অর্থব্যঞ্জক এবং সালাম দ্বারাই যে দু'জনের দূরত্ববোধ কেটে আবার দু'জন একাত্ম হতে পারবে, অন্য ভাষায়

সালামই যে দূরত্ববোধ মোচনের একটা পদ্ধতি এ হাদীছে সে দিকেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

সালাম দ্বারা একাত্মতা ও ভালবাসা প্রকাশ পায় বিধায় পুরুষ কর্তৃক বেগানা নারীকে এবং নারী কর্তৃক বেগানা পুরুষকে সালাম দেয়া নিষিদ্ধ। কারণ এতে অপর পক্ষ ভালবাসার উস্কানিবোধ করবে, যা গোনাহের পথে অগ্রসর করতে পারে। তবে যে ক্ষেত্রে এরূপ অনাসৃষ্টির সম্ভাবনা নেই সে ক্ষেত্রেই সালাম দেয়া জায়েয। যেমন বৃদ্ধা নারী পুরুষকে সালাম দিতে পারে কিম্বা মহিলাদের এক জামাআত হলে পুরুষ তাদেরকে কিম্বা পুরুষ এক দল হলে মহিলা তাদেরকে সালাম দিতে পারে যদি উক্ত ফিতনার আশংকা না থাকে। (কিতাবুল আযকার : ২২৫ পৃষ্ঠা)

সালাম দ্বারা একাত্মতা প্রকাশ পায় বিধায় ইমাম বোখারী প্রমুখ উলামায়ে কেরাম বিদআতী ও মহাপাপীকে তওবার আগ পর্যন্ত সালাম প্রদান বা তার সালামের জওয়াব প্রদান থেকে বিরত থাকা সঙ্গত বলে মত পোষণ করেছেন। কারণ, কোন বিদআতী বা মহাপাপীর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ সমীচীন নয়। (দ্র. বোখারী : ২য় খ, ৯২৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রা.) বলতেন,

لَاتُسَلِّمُوْا عَلٰى شَرَبَةِ الْخَمْرِ:

অর্থাৎ, তোমরা শরাব পানকারীদেরকে সালাম দিও না। (বোখারী : ২য় খণ্ড, ৯২৫ পৃ.)

কোন অমুসলিমকে সালাম প্রদান নিষিদ্ধ। কেননা, অমুসলিমের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা যায় না। যদি কখনও মুসলমান ভেবে কোন অমুসলিমকে সালাম প্রদান করা হয় এবং পরক্ষণেই প্রকাশ পায় যে, সে মুসলমান নয় তাহলে তাকে বলতে হবে তুমি আমার সালাম ফিরিয়ে দাও। আল্লামা নববী বলেন,

وَالْغَرْضُ مِنْ ذَالِكَ اَنْ يُوَحِّشَهٗ وَيُظْهِرَ لَهٗ اَنَّهٗ لَيْسَ بَيْنَهُمَا اُلْفَةٌ. (كتاب الاذكار صـ ٢٢٨)

অর্থাৎ, এরূপ করার উদ্দেশ্য হল উক্ত অমুসলিমকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, তার সাথে সে একাত্ম নয় এবং একথা প্রকাশ করে দেয়া যে, তাদের মধ্যে ভালবাসা নেই। (কিতাবুল আযকার : ২২৮ পৃ.)

উল্লেখ্য যে, অমুসলিম থেকে কোন কাজ উদ্ধার করার জন্য কিম্বা বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাকে আপন করে তোলার আবশ্যকতা দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে তাকে ‘গুড মর্নিং’, ‘গুড ইভিনিং’ বা এ জাতীয় কিছু বলে

অভিনন্দন করে প্রয়োজন সম্পন্ন করা যেতে পারে বা কোন অমুসলিম মুসলমানকে সালাম দিলে তার উত্তরে মুসলিম শুধু "ওয়া আলাইকুম" বলতে পারে। এ পদ্ধতিতে মনস্তাত্ত্বিক আনুকূল্য অর্জনও হবে আবার অমুসলিমের প্রতি একাত্মতা ও হৃদ্যতা প্রকাশের নিষেধাজ্ঞা থেকেও বিরত থাকা হবে। এ কথাগুলিকেই আল্লামা নববী (রহ.) তার ভাষায় এভাবে বলেছেন,

قال العلامة النووى قال ابو سعد : لو اراد تحية ذمى فعلها بغير سلام بان يقول هداك الله او انعم الله صباحك. قلت هذا الذي قاله ابو سعد لاباس به اذا احتاج اليه فيقول صبحت بالخير او بالسعادة او بالعافية او صبحك الله بالسرور .... او ما اشبه ذالك. (كتاب الاذكار صـ : ٢٢٨)

সালামের ন্যায় মোসাফাহা মুআনাকা দ্বারাও মনের কালিমা বিদূরিত হয়ে থাকে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

تَصَافَحُوْا يُذْهِلِ الْغِلَّ.

অর্থাৎ, তোমরা মোসাফাহা কর, মনের কালিমা দ্বেষ দূর হয়ে যাবে। (জামউল ফাওয়াইদ : ২য় খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

(ঘ) সম্মানিত আগন্তুকের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ানো বা সরে বসে তার জন্য জায়গা করে দেয়া

যখন কোন সম্মানিত লোকের আগমন ঘটে, তখন স্বস্থানে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে বসে থাকলে আগন্তুক মনে করবেন তার আগমনে প্রতিপক্ষ হয়ত সংকীর্ণতাবোধ করছেন কিম্বা তারা উৎফুল্লবোধ করছেন না। এরূপ অনুভূতি মানসিকভাবে তাকে আহত করবে এবং তাকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে। ইসলামী মুআশারার নীতিতে তাই সম্মানিত আগন্তুকের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করার কিম্বা অন্ততঃ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নড়ে চড়ে বসে তার জন্য বসার স্থান করে দিয়ে উদারতা প্রকাশের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। একদা হযরত সা'আদ ইবনে মুআয্ (রা.)-এর আগমনকালে উপস্থিত লোকদেরকে রাসূল (সা.) নির্দেশ দেন যে,

قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ.

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের নেতার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাও। (বোখারী : ২য় খণ্ড, ৯২৬ পৃষ্ঠা)

অন্য এক হাদীছে এরূপ দাঁড়ানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে; তার উদ্দেশ্য হল- নেতা বসে থাকবেন আর অন্যরা দন্ডায়মান হয়ে থাকবে এরূপ করা নিষেধ; যেমন সম্রাটদের দরবারে হয়ে থাকত। শুধু সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মানপূর্বক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও পরক্ষণে স্বাভাবিকভাবে বসে যাওয়ার কথাই উপরোক্ত হাদীছে বলা হয়েছে। এতে সম্মানিত লোকদের সম্মান প্রকাশ পায়। ইবনে মাজার এক হাদীছে বলা হয়েছে,

اِذَا اَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَاَكْرِمُوْهُ.

(وسنده ضعيف الا له طرق فصار حسنا. راجع المقاصد الحسنة ص : ٥٥)

অর্থ: যখন তোমাদের নিকট সমাজের কোন সম্মানিত লোক আগমন করেন, তখন তাকে সম্মান কর। (ইবনে মাজা : ২৭২ পৃষ্ঠা)

(ঙ) আগন্তুকের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা

এ বিষয়টিও অত্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক। বস্তুত কোন আগন্তুকের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ না করলে তার মনের দূরত্ববোধ কাটে না এবং তিনি ভাবতে থাকেন আমাকে পর পর ভাবা হচ্ছে, আমাকে গুরুত্বই দেয়া হচ্ছে না। এমনকি বক্তার থেকে মুখমন্ডল অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখে তার কথা শুনতে থাকলেও তিনি ভাবতে পারেন আমার বিষয়টি গুরুত্বহীন মনে করা হচ্ছে। রাসূল (সা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

اِذَا الْتَفَتَ اِلْتَفَتَ مَعًا.

অর্থাৎ, যখন তিনি কারও (বক্তব্য শ্রবণের জন্য তার) দিকে ফিরতেন তখন পুরোপুরি ফিরতেন। (শামায়েলে তিরমিযী : ১ম পৃষ্ঠা)

রাসূল (সা.) এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ও লক্ষ্য রাখতেন বিধায় একজন ঘোর বিরোধীও যখন তার সংস্পর্শে আসত, তখন তার মনের সব দূরত্ববে-াধ কেটে যেত এবং রাসূলকে সে মনের দিক থেকে খুব আপন ভাবতে উদ্বেলিত হত। সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে- তারা প্রত্যেকে ভাবতেন রাসূল (সা.) আমাকেই অধিক সম্মান করেন এবং আমার

বিষয়কেই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। রাসূলের দরবারে আগমনকারী প্রত্যেকেই এরূপ ভাবতেন। (দ্র. মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ৮ম খণ্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

(বার) মন জয় করা তথা ভালবাসা সৃষ্টির পদ্ধতি

পূর্বোক্ত একাদশ পরিচ্ছেদে অন্যের মন থেকে দূরত্ববোধ কাটিয়ে তোলার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যের মন থেকে দুরত্ববোধ মোচন করতে পারাই তার মন জয় করার নামান্তর। তদুপরি অন্যের মন জয় করার নিমিত্তে আরও কতকগুলো আকর্ষণীয় মনস্তাত্ত্বিক নীতি রয়েছে। যেমন

(ক) প্রশংসা ও যোগ্যতার মূল্যায়ন

প্রশংসা ও যোগ্যতার মূল্যায়ন দ্বারা ব্যক্তি আপ্লুত হয়ে থাকে এবং প্রশংসাকারীও মূল্যায়নকারীর প্রতি সে প্রীত হয়ে পড়ে। ‘দাওয়াত মনোবিজ্ঞান’ অধ্যায়ে “মাদউর যোগ্যতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি” ও আলোচ্য অধ্যায়ের “যোগ্যতার মূল্যায়ন” শিরোনামে দুটি পরিচ্ছেদে এ বিষয় সম্পর্কে কুরআন হাদীছের প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ স্বভাবগতভাবেই নিজের শ্রেষ্ঠত্বের মনোবৃত্তি পোষণ করে, যার ফলে কারও থেকে নিজের প্রশংসা বা যোগ্যতার স্বীকৃতি পেলে তাকে সে নিজের মনের অনুকূল পেয়ে তার প্রতি প্রীত হয়ে পড়ে। প্রশংসা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি দ্বারা তাই অন্যের মন জয় করা খুব সহজ। তবে অনেক প্রশংসা বা যোগ্যতার স্বীকৃতি অশুভ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করতে পারে। প্রশংসার ক্ষেত্রে যদি অতিরঞ্জন হয়ে যায় তাহলে যার প্রশংসা করা হয় তার মধ্যে নিজের সম্পর্কে বাহুল্য ধারণার জন্ম নিবে এবং নিজেকে সে বাস্তবের চেয়ে অধিক কিছু ভেবে বসবে। আর এটা তার জীবনের সম্ভাব্য অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারে। কিংবা যার প্রশংসা করা হবে তার ধারণ ক্ষমতা দুর্বল হলে নিজের প্রশংসা শুনে নিজের প্রতি সে অহেতুক দুর্বল হয়ে পড়বে এবং অন্যকে তুচ্ছ ভাবতে আরম্ভ করবে, যা তার মধ্যে আত্মগরিমা বা ঔদ্ধত্যের জন্ম দিবে। ইসলাম তাই প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন নিষিদ্ধ করেছে এবং যার ক্ষেত্রে প্রশংসা অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে বলে আশংকা হয় তার প্রশংসা থেকে বিরত থাকতে বলেছে। প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى (الْاَشْعَرِيِّ) قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِيْ عَلٰى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فِى الْمِدْحَةِ فَقَالَ اَهْلَكْتُمْ اَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ. (بخارى : ٢ ص : ٨٩٥)

অর্থাৎ, হযরত আবূ মূসা আশআরী (আ.) বলেন, রাসূল (সা.) শুনতে পেলেন এক ব্যক্তি অন্য একজনের প্রশংসা করছে এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন করছে। তখন নবী (সা.) বললেন, তোমরা লোকটাকে ধ্বংস করে দিলে। (বোখারী : ২য় খণ্ড, ৮৯৫ পৃষ্ঠা)

আল্লামা নববী বলেন, বোখারী ও মুসলিম শরীফে বহু হাদীছ সম্মুখে প্রশংসার অনুকূলে রয়েছে। পক্ষান্তরে অনেক হাদীছ থেকে নিষেধাজ্ঞাও বোঝা যায়। এতদুভয় প্রকারের মধ্যে সমন্বয় এভাবে করা হয়েছে যে, প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন হলে কিম্বা যার প্রশংসা হবে তার মধ্যে প্রশংসা দ্বারা অশুভ প্রতিক্রিয়া যেমন: আত্মগরিমা ঔদ্ধত্য প্রভৃতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সে ক্ষেত্রে প্রশংসা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে এরূপ না হলে তা নিষিদ্ধ নয় বরং উৎসাহ সৃষ্টি, উৎসাহ বৃদ্ধি, দৃঢ়তা প্রভৃতি উপকারিতার দিকগুলোর প্রেক্ষিতে তা উত্তম। (মুসলিম : ২য় খণ্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা-এর টীকা দ্র.)

(খ) হাদিয়া উপঢৌকন বিনিময়

কাউকে হাদিয়া উপঢৌকন প্রদান করলে তার মন জয় হয়ে থাকে। একজন ঘোর শত্রুকেও যদি হাদিয়া উপঢৌকন গ্রহণ করানো যায় তাহলে তার মনের শত্রুতা, কালিমা দূরীভূত হতে থাকবে। শত্রুর পক্ষ থেকে হাদিয়া উপঢৌকন তাই কেউ গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। কারণ, সে উপলব্ধি করতে থাকে আমি মানসিকভাবে পরাজিত এবং প্রতিপক্ষ জয়ী হয়ে যাচ্ছে, আর নিজের পরাজয় কেউ সহজে মেনে নিতে চায় না। হাদিয়া উপঢৌকন যিনি গ্রহণ করেন প্রদানকারীর প্রতি তার মন আপ্লুত হয়, পূর্বের কোন কালিমা থাকলে তা দূরীভূত হয় এবং তার প্রতি মন দূর্বল হতে থাকে। হাদিয়া প্রদানকারীর মনে ভালবাসার বৃদ্ধি নাও ঘটতে পারে। ইসলামী মুআশারার নীতিতে সে জন্য শুধু হাদিয়া গ্রহণ নয় বরং হাদিয়া প্রদানকারীকেও প্রতিহাদিয়া দেয়ার নীতি রাখা হয়েছে, যাতে উভয় পক্ষেরই মনে ভালবাসার বৃদ্ধি ঘটে। মুয়াত্তা মালিকে বর্ণিত হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

تَهَادَوْا تَحَابُّوْا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ.

অর্থাৎ, তোমরা পরস্পর হাদিয়া বিনিময় কর, তাহলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে এবং মনের শত্রুতা ও কালিমা দূরীভূত হবে। (জামউল ফাওয়াইদ : ২য় খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

অন্য এক হাদীছে এরশাদ হয়েছে,

تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصُّدُوْرِ.

অর্থাৎ, তোমরা পরস্পর হাদিয়া বিনিময় কর। কেননা, হাদিয়া অন্তরের গ্লানিকে দূরীভূত করে।

উপরোক্ত উভয় হাদীছেই পরস্পর হাদিয়া বিনিময়ের কথা বলা হয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় কাউকে হাদিয়া প্রদান করা হলে তার উচিৎ হাদিয়া প্রদানকারীকেও কিছু প্রদান করা। সম্ভব না হলে অন্তত বাচনিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ اُعْطِىَ عَطَاءً فَلْيَجْزِ بِهٖ اِنْ وَجَدَ وَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهٖ فَاِنَّ مَنْ اَثْنٰى بِهٖ فَقَدْ شَكَرَ ... الخ (جمع الفوائد نقلا عن ابى داؤد والترمذى)

অর্থাৎ, কাউকে কিছু দান করা হলে সম্ভব হলে প্রত্যুত্তরে সেও তাকে কিছু দান করবে। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে তার প্রশংসা করে দিবে। যে তার প্রশংসা করল সে কৃতজ্ঞতা আদায় করল। (জামউল ফাওয়াইদ : ২য় খণ্ড, ১৫০ পৃ.)

এই বাচনিক কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসার ভাষা কি হবে সে সম্পর্কেও এক হাদীছে শিক্ষা দেয়া হয়েছে,

مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهٖ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَقَدْ اَبْلَغَ فِى الثَّنَاءِ. (جمع الفوائد نقلا عن الترمذى)

অর্থাৎ, কারও প্রতি ভাল কিছু করা হলে সে যদি কর্তার উদ্দেশ্যে বলে, জাযাকাল্লাহু খায়রান (অর্থাৎ, আল্লাহ আপনাকে বিনিময়ে কল্যাণ দান করেন) তাহলে সে প্রশংসার হক পুরোপুরি আদায় করল। (জামউল ফাওয়াইদ : ২য় খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা)

হাদিয়া প্রদানকারীর প্রতি হাদিয়া গ্রহণকারীর মনে প্রীতি ও দূর্বলতা সৃষ্টি হয় বিধায় বিচারকের পক্ষে বাদী বিবাদী কোন পক্ষের তরফ থেকে

হাদিয়া উপঢৌকন বা কোন রূপ আপ্যায়ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। কেননা এতে হাদিয়া প্রদানকারী পক্ষের প্রতি বিচারকের মনে দূর্বলতা এসে বিচারের নিরপেক্ষতাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। তদ্রূপ কারও নিকট থেকে কোন কার্যোদ্ধারের প্রাক্কালে হাদিয়ার নামে তাকে কিছু প্রদান করা হলেও সেটা ঘুষের সম্ভাবনা মুক্ত হবে না। কেননা হাদিয়া গ্রহণের ফলে সৃষ্ট মনের দূর্বলতার কারণে প্রদানকারী পক্ষের অন্যায় দাবী পূরণেও সে প্রবৃত্ত হয়ে যেতে পারে।

হাদিয়া প্রদানের উদ্দেশ্য থাকতে হবে একমাত্র মন জয় ও প্রীতি বিস্তার। এক্ষেত্রে অন্য কোন উদ্দেশ্য মিশ্রিত থাকলে হাদিয়ার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। বর্তমান বিবাহ-শাদী প্রভৃতি অনুষ্ঠান ও পর্বে যে হাদিয়া প্রদান হয়ে থাকে, সেখানে হাদিয়া প্রদান ও গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুপস্থিত থাকে। যিনি প্রদান করেন তিনি চিন্তা করেন আমার অমুক অনুষ্ঠানে অমুকে এই এই জিনিস প্রদান করেছিলেন। অতএব আজ তার অনুষ্ঠানে অন্ততঃ সে পর্যায়ের কিছু না দেয়া হলে কিম্বা সকলে দিচ্ছেন আমি না দিলে সামাজিকভাবে আমি ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন হব। আর গ্রহণকারী পক্ষও এই মনে করে গ্রহণ করেন যে, ভবিষ্যতে আমাকেও এর প্রতিবিধান করতে হবে বা অতীতে যা দিয়েছিলাম আজ তার উসূল হচ্ছে। তাই তিনি লিখে রাখেন কিম্বা অতীতে তার প্রদানের রেকর্ড বের করে দেখেন তিনি যে মানের বা যা দিয়েছিলেন আজ সে পর্যায়ের বা তদ্রূপ পেলেন কি-না। প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর ইত্যাকার উদ্দেশ্য বা মানসিক অবস্থার ফলে এরূপ হাদিয়া উপঢৌকনের দ্বারা ভালবাসার বিস্তার হয় না বরং মানসিক দ্বন্দ্ব কষাকষির সূত্রই দীর্ঘায়িত হয়।

হাদিয়া উপঢৌকন মন জয়ের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। তাই নগদ অর্থ ছাড়া অন্য কোন মাল-সরঞ্জাম ইত্যাদি হাদিয়া স্বরূপ প্রদানের ক্ষেত্রে যাকে দেয়া হবে তার প্রয়োজন, মানসিক ঝোক, মনের পছন্দ রুচি ইত্যাদি লক্ষ্য রেখেই দেয়া উচিৎ। অন্যথায় যা প্রদান করা হবে সেটা যদি তার পছন্দ বা রুচি মোতাবেক না হয় তাহলে হাদিয়ার উদ্দেশ্য অনেকাংশেই ব্যাহত হবে।

যিনি হাদিয়া প্রদান করেন তিনি এই আশায় থাকেন যে, প্রতিপক্ষ তার প্রদত্ত হাদিয়া প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হবেন। সুতরাং হাদিয়া প্রাপ্তির পর এমন কিছু বলা বা এমন কিছু করা সঙ্গত নয় যার কারণে প্রদানকারীর মনে গ্রহণকারীর সন্তুষ্টি সম্পর্কে সন্দেহ জাগতে পারে। যেমনঃ প্রদানকারীর

সম্মুখেই অন্যকে তা দান করে দেয়া কিংবা বিক্রি করে দেয়া অথবা এরূপ বলা যে, এরকম জিনিস আমার কাছে রয়েছে বা এটা তেমন উত্তম বস্তু নয় ইত্যাদি। এগুলো হাদিয়া প্রদানকারীকে মানসিকভাবে আহত করতে পারে। মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ার প্রতি স্বযত্ন খেয়াল রাখলেই ইত্যাক-ার বিষয়াদি রেয়ায়েত করে চলা সম্ভব হতে পারে।

(গ) আপ্যায়ন এবং দাওয়াত প্রদান ও গ্রহণ

হাদিয়া উপঢৌকনের ন্যায় আপ্যায়ন দ্বারাও মন জয় হয়ে থাকে। হাদিয়া প্রদান যেরূপ, দাওয়াত প্রদান পূর্বক আপ্যায়নও তদ্রূপ। উপরোক্ত আলোচনার পর এ সম্পর্কে আর বিস্তারিত আলোকপাত করার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনি। তবে একটা বিয়ষ আলোচ্য যে, যাদের মনে কার্পণ্য থাকে তারা আপ্যায়ন কর্মে অগ্রসর হতে পারে না, ফলে তারা মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হয় না। বখীল ও কৃপণ লোক তাই মানুষের মন থেকে দূরে সরে যায়। আর ছখী বা দানশীল মানুষ আপ্যায়ন পূর্বক সমাজের মন জয় করতে সক্ষম হয়, ফলে সমাজে তারা প্রিয়জন হয়ে ওঠে। তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছ নিম্নরূপ :

اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ. وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّار بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ .... الخ

অর্থাৎ, দানশীল আল্লাহর নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী ও জাহান্নাম থেকে দূরবর্তী। আর কৃপণ আল্লাহ্ থেকে দূরবর্তী, মানুষ থেকে দূরবর্তী, জান্নাত থেকে দূরবর্তী এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী।

উপরোক্ত বিষয়য়াদি ছাড়াও ভাল ব্যবহার দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করণ (যে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে) পরস্পর কল্যাণকামিতা, পরোপকার, বিপদ থেকে উদ্ধার, দান, সৌহার্দ প্রভৃতি বহু বিষয় দ্বারা অন্যের মন জয় করা যায় এবং এসব পদ্ধতিতে পরস্পর ভালবাসা গড়ে ওঠে।

বি. দ্র. আচার-ব্যবহার, সামাজিকতা ও শিষ্টাচারের সাথে সম্পর্কিত আরও বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যা ‘চরিত্র মনোবিজ্ঞান’ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে যা কিছু আলোচিত হয়েছে এর অর্থ এই নয় যে, এ পর্যন্তই শিষ্টাচার সম্পর্কিত বিষয়াদি সীমাবদ্ধ। জ্ঞানীজন এর আলোকে আরও বহু বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিবার মনোবিজ্ঞান
(Family psychology)

পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার কারণ ও তার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকার

পরিবারে বিভিন্ন অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। শুরু থেকেই যদি এ সব কারণ এড়িয়ে চলা যায়, তাহলে একটা সুখী ও আনন্দময় পরিবার গড়ে তোলা এবং সেই সুখ ও আনন্দকে ধরে রাখা সম্ভব। সাধারণত যে সব কারণে পরিবারে অশান্তি দেখা দিয়ে থাকে নিম্নে সেগুলো মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকার-ব্যবস্থাসহ উল্লেখ করা হল।

১. শ্বশুর-শাশুড়ী ও পুত্র-বধূর মাঝে সুসম্পর্ক না থাকা

সাধারণত শ্বশুর-শাশুড়ী পুত্রের উপর অধিকার থাকার সুবাদে পুত্র-বধূর উপর কর্তৃত্ব করতে চায় এবং পুত্রের ন্যায় পুত্র-বধূকেও বাধ্যগত পেতে এবং রাখতে চায়। তারা পুত্র থেকে যে রকম আনুগত্য ও খেদমত পাওয়ার, পুত্র-বধূ থেকেও সেরকম পেতে চায়। এর ফলে পুত্র-বধূর সাথে কর্তৃত্ব সুলভ আচরণ ও ক্ষেত্র বিশেষে বাঁদী সুলভ ব্যবহ-ারও করে থাকে। অনেক সময় পুত্র-বধূ প্রফুল্ল চিত্তে না চাইলেও জবরদস্তি তার থেকে শ্বশুর-শাশুড়ী কাজ ও খেদমত নিয়ে থাকেন এবং জবরদস্তি পুত্র-বধূকে একান্নভুক্ত রাখা হয়। এসব কারণে পুত্র-বধূর স্বাধীন চেতনা আঘাতগ্রস্ত হয়, কখনও কখনও সে আত্মমর্যাদায় আঘাতবোধ করে এবং এ সংসারকে সে আপন বলে মেনে নিতে পারে না। ফলে শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে শুরু হয় তার মনকষাকষি এবং তখনই পুত্র-বধূ তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায়। পুত্র-বধূর আপনজন ও আত্মীয়- স্বজনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা এবং তাদের আতিথেয়তা ও আপ্যায়নকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণেও অনেক সময় শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি পুত্র-বধূ ক্ষিপ্ত এবং মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

এর প্রতিকারের জন্য মনে রাখা দরকার শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করা মৌলিকভাবে পুত্র-বধূর দায়িত্ব নয়, করলে সেটা তার অনুগ্রহ। বরং এ

খেদমতের দায়িত্ব তাদের পুত্রের উপর বর্তায়। পুত্রের পক্ষ থেকে তার বধূ যদি সে খেদমতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়, তাহলে সেটা তার অনুগ্রহ। শ্বশুর-শাশুড়ী যদি পুত্র-বধূর খেদমতকে এ দৃষ্টিভঙ্গীতে মূল্যায়ন করেন, তাহলে পুত্র-বধূর প্রতি তারা প্রীত হবেন এবং তার প্রতি তাদের বাঁদী সুলভ মনোভাব সৃষ্টি হবে না।

২. যৌথ পরিবার থাকা

অনেক সময় একান্নভুক্ত পরিবার থাকার কারণেও সংসারের শান্তি বিনষ্ট হয়। বিশেষভাবে যদি স্ত্রীর জন্য থাকার ঘরও পৃথক করে দেয়া না হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক নারীই এ কামনা করবে যে, স্বামীকে নিয়ে সে স্বাধীনভাবে নিজের মত করে একটা সংসার গড়ে তুলবে, তার থাকার জন্য একটা ভিন্ন ঘর থাকবে; সেখানে সে তার মাল-সামান সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করতে পারবে, যেখানে সে স্বাধীনভাবে স্বামীর সাথে বিনোদন করতে পারবে। যৌথ পরিবার ও একান্নভুক্ত সংসার অনেক ক্ষেত্রেই এ কামনায় বাধা সৃষ্টি করে। ফলে শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ, দেবর প্রমুখদের সাথে পুত্র-বধূর বনিবনা হয়ে ওঠে না। কারণ, তাদেরকেই সে তার কামনা পূর্ণ হওয়ার পথে অন্তরায় মনে করে। তাই শুরু থেকেই সুসম্পর্ক নষ্ট হওয়ার পূর্বেই সংসার ভিন্ন করে দেয়া উচিৎ।

অনেক পিতা-মাতাই মনে করে থাকেন-তাদের পুত্রের ভিন্ন সংসার গড়ে উঠলে তারা অবহেলিত হবেন, তারা বঞ্চিত হবেন। কিন্তু পুত্রকে যদি তারা যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে পুত্রের সংসার ভিন্ন হলেও পুত্র তাদের অধিকার ও খেদমতে ত্রুটি করবে না-এটাও বাস্তব সত্য। তদুপরি জোর জবরদস্তি কিছুদিন একান্নভুক্ত রাখা হলেও চরম অ-বনিবনা সৃষ্টি হওয়ার পর এক সময়তো পৃথক হতেই হবে। সে পৃথক হওয়াটা আগেভাগে করে ফেললেইতো ভাল। নতুবা সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার পর সংসারও ছিন্ন হবে মনের বন্ধনও ছিন্ন হবে।

৩. আয়-ব্যয়ের মাঝে ভারসাম্যতা না থাকা

প্রত্যেক মানুষেরই উচিত তার আয় অনুযায়ী ব্যয় করা। অনেকেই সংসার জীবনের প্রথম দিকে আবেগের বশবর্তী হয়ে সাধ্যের বাইরেও অনেক বেশী ব্যয় করে থাকে। সব ক্ষেত্রেই সে তার স্ট্যাণ্ডার্ড ছাড়িয়ে চলে যায়। এভাবে তার স্ত্রী ও সন্তানাদির স্ট্যাণ্ডার্ড বেড়ে যায় এবং এভাবে

চলতে চলতে এক সময় সে ঋণী হয়ে পড়ে কিংবা এভাবে চলা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন পূর্বের স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখার জন্য তাকে অবৈধ আয়ের পথে পা বাড়াতে হয় কিংবা স্ত্রী পুত্র পরিজনের কাছে হেয় হতে হয়, তাদের মন রক্ষা হয় না, ফলে মানসিক শান্তি বিনষ্ট হয়।

কুরআনে কারীমে এক দিকে যেমন কার্পণ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে, অপর দিকে এত বেশী হাত খোলা হতেও নিষেধ করা হয়েছে, যাতে পরবর্তীতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে হয় এবং হেয় হতে হয়। ইরশাদ হয়েছে,

وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا.

অর্থাৎ, তুমি একেবারে ব্যয়-কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। (সূরা বানী ইসরাঈল : ২৯)

সুতরাং আয় ব্যায়ের মধ্যে ভারসাম্যতা রক্ষা করে চলা উচিত। বিশৃংখল ব্যয় করা নিষিদ্ধ। বিশৃংখল ব্যয় করা বলতে বোঝায়-যা কিছু হাতে আছে তৎক্ষণাৎ তা ব্যয় করে ফেলা এবং ভবিষ্যতে শরীআত সম্মত প্রয়োজন দেখা দিলে তা পূরণ করতে বা পরিবার পরিজনের হক আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়া। (কুরতুবী ও মাযহারী) এতে বোঝা গেল- কিছুটা সঞ্চয়ের নীতিতে এবং আয়ের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলার নীতিতে সংসার পরিচালনা করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে মানসিক শান্তি বিনষ্ট না হয়।

৪. স্ত্রীকে সংসার চালানো শিখিয়ে না দেয়া

স্ত্রীকে সংসার চালানো শিখিয়ে দেয়া উচিত, যাতে পুরুষের আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে সংসার পরিচালনায় সে সহযোগিতা করতে পারে এবং যাতে স্বামীর আয়ের সাথে সঙ্গতিহীনভাবে সংসার চালিয়ে তাকে বিব্রতকর অবস্থায় না ফেলে। স্ত্রীর মধ্যে স্ট্যাণ্ডার্ড বৃদ্ধি করার এবং আরও জাঁকজমকের সাথে চলার মনোবৃত্তি যেন সৃষ্টি হতে না পারে, সে জন্য নিজের চেয়ে ধনবান পরিবারের বাড়িতে স্ত্রীকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার বা পাঠানোর এবং তাদের সাথে উঠা-বসার ব্যাপারে সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু স্ত্রী নয় সংসারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতিও এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। মনে রাখা দরকার- যে পরিবেশে এবং

যাদের মাঝে উঠা-বসা এবং চলা-ফেরা হয় তাদের ন্যায় স্টাণ্ডার্ড গ্রহণ করার মনোভাব জাগ্রত হতে থাকে।

এতসব সতর্ক পদক্ষেপ নেয়ার পরও কখনও যদি স্ত্রী বা সংসারের অন্য সদস্যদের মধ্যে সাধ্যের বাইরে জাঁকজমকের সাথে ও আড়ম্বরের সাথে চলার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে দুনিয়া ত্যাগের ওয়াজ-নসীহত শুনাতে হবে, দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গ অলী আউলিয়াদের জীবনী ও কাহিনী শুনাতে হবে বা এতদসম্পর্কিত পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ করাতে হবে এবং গরীবদের সাথে উঠা-বসার ব্যবস্থা করাতে হবে। আর যে পরিবেশে যাওয়ার ফলে উক্ত মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়েছে সে পরিবেশ থেকে তাদেরকে যথা সম্ভব দূরে রাখতে হবে। মনোভাব গঠনে পরিবেশ ও সাহচর্যের প্রভাব কতখানি সে সম্পর্কে 'সমাজ মনোবিজ্ঞান' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৫. স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সন্দেহ

স্বামী স্ত্রী একে অপরের চরিত্রের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়লে এ থেকে সংসারে চরম অশান্তি দেখা দিতে পারে। এর থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রথমত উভয়কেই মনে রাখতে হবে যে, দলীল প্রমাণ ছাড়া কারও ব্যাপারে কু-ধারণা করা অন্যায় এবং পাপ। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ،

অর্থাৎ, নিশ্চয় কতক ধারণা পাপ। (সূরা হুজুরাত : ১২)

অতএব দলীল প্রমাণ ছাড়া নিছক সন্দেহ হয়ে থাকলে মন থেকে সে সন্দেহ ঝেড়ে ফেলতে হবে। যদি মন থেকে সন্দেহ না যায় তাহলে যে কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয় সে কারণ উল্লেখ করে তাকে স্পষ্ট বলতে হবে যে, এ কারণে তোমার প্রতি আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে তুমি এ থেকে বিরত হও; আর বিরত হতে না পারলে আমার জন্য দু'আ কর যেন আমার মন থেকে সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং নিজেও মন থেকে কু-ধারণা দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করতে থাকবে। এভাবে ইনশাআল্লাহ মন পরিষ্কার হয়ে যাবে। অন্যথায় মনে মনে সন্দেহ, ক্ষোভ চাপা রাখলে সেটা খারাপ পরিণতি ডেকে আনতে থাকবে।

আর বাস্তবিকই যদি দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে জানা যায় যে, স্ত্রীর চরিত্র নষ্ট হচ্ছে, তাহলে যে কারণে সেটা ঘটছে সে কারণটা প্রতিহত

করতে হবে। এর জন্য সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল স্ত্রীকে শরীআত সম্মত পর্দার মধ্যে রাখা। পর্দা ব্যবস্থাই হল চরিত্র ও সতীত্ব সংরক্ষণের সবচেয়ে নিশ্চিত ব্যবস্থা। এর দ্বারা পরপুরুষের সাথে মেলামেশা প্রভৃতি -যা সন্দেহের উৎস- সে উৎসই বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি স্বামীর চরিত্র নষ্ট হতে থাকে, তাহলে স্ত্রী যেহেতু জোরপূর্বক স্বামীকে কোন কিছু মানাতে বাধ্য করতে পারবে না এবং এজন্য বকাঝকা করলে স্বামীর জিদ বেড়ে গিয়ে আরও হিতে বিপরীত হতে পারে, তাই স্ত্রীর তখন করণীয় হল তিনটা বিষয়। যথা :

(এক) স্বামীর প্রতি ভাল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু‘আ করবে।

(দুই) যখন স্বামী নির্জনে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে থাকবে এবং ঠান্ডা মাথায় থাকবে তখন খুব নরম ভাষায় তাকে বুঝাতে থাকবে এবং

(তিন) স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য আগের চেয়ে বেশী নিজেকে নিবেদিত করবে। এভাবে হয়ত স্বামীর সংশোধন হয়ে যেতে পারে। এ না করে স্ত্রী যদি এরূপ মুহূর্তে স্বামীকে জব্দ করতে চায়, প্রকাশ্যে হেয় করতে চায় এবং স্বামীর মনোরঞ্জনে পূর্বের চেয়ে পিছিয়ে থাকে, তাহলে ইত্যবসরে স্বামী আরও বিরূপ হয়ে পড়তে পারে, আরও দূরে সরে যেতে পারে। এভাবে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী।

৬. একাধিক বিবাহ

ইসলাম বিভিন্ন প্রয়োজনের ভিত্তিতে পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ (এক সঙ্গে সর্বোচ্চ চারজন) জায়েয রেখেছে। তবে শর্ত হল পুরুষ তার সকল স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখবে। স্বামী আরও স্ত্রী ঘরে আনুক, আরও একটা বিবাহ করুক সাধারণভাবে স্ত্রীর মন তা মেনে নিতে চায় না এবং এ জন্য মনোমালিন্য ও সংসারে অশান্তি লেগে যায়। এ অশান্তির প্রতিকারের জন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই কিছু করণীয় রয়েছে। এক্ষেত্রে স্বামীর করণীয় হল– যদি একান্তই তাকে আবার বিবাহ করতে হয়, তাহলে যে কারণে আগের স্ত্রী পরবর্তী বিবাহকে মেনে নিতে পারছে না অর্থাৎ, সে আশংকা করছে যে, অন্য স্ত্রীকেই বেশী আদর সোহাগ করা হবে এবং তার আদর সোহাগ কমে যাবে, তার সন্তানাদি অবহেলিত হবে ইত্যাদি। স্বামীর কর্তব্য কার্যতঃভাবে এ আশংকাকে দূর করা অর্থাৎ, সে সকল স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণভাবে সমতা রক্ষা করবে, সকলকেই এক দৃষ্টিতে দেখবে, সকলের সাথে এক রকম আদর সোহাগের আচরণ করবে।

তাহলে আস্তে আস্তে পূর্বের স্ত্রী স্বাভাবিক হয়ে আসবে। আর স্ত্রীর করণীয় হল, প্রথমতঃ সে মনকে বোঝাবে যে, পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ যখন জায়েয, তখন আমার সেটা মেনে নিতে বাধা কোথায়? দ্বিতীয়তঃ সে জিদ ধরে স্বামীর খেদমত ও মনোরঞ্জনে ত্রুটি করবে না; তাহলে এই অবসরে পরবর্তী স্ত্রীর দিকে স্বামী বেশী ঝুঁকে পড়বে। বরং তার জন্য উচিত হল স্বামীকে আরও বেশী আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা, যাতে স্বামীকে ভারসাম্যতার পর্যায়ে রাখা যায়। তৃতীয়তঃ সতীনকে প্রকাশ্যে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া। যদি সতীনের সাথে প্রকাশ্যে শত্রুতার আচরণ করা হয়, তাহলে সেও শত্রু ভাববে। এভাবে শুরু থেকেই অমিল লেগে গেলে ভবিষ্যতে তাকে আপন করে নেয়া কঠিন হবে। মনে রাখতে হবে, নতুন সতীনকে আপন করে নিতে না পারলে সংসারে যে অশান্তি আসবে, সে অশান্তি শুধু নতুন সতীনই ভোগ করবে না, পুরাতনকেও ভোগ করতে হবে। তাই জিদ ধরা নয় বরং বুদ্ধিমত্তা হল শুরু থেকেই সতীনকে আপন করে নিয়ে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করা। আর নতুন স্ত্রীকেও মনে রাখতে হবে যে, তার স্বামীর প্রতি তার যেমন অধিকার রয়েছে পুরাতন স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে। অতএব পুরাতন স্ত্রী থেকে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের কুক্ষিগত রাখার প্রচেষ্টা অত্যন্ত অন্যায়। নতুন স্ত্রী যদি স্বামীকে সব স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে এক দিকে স্বামী অন্যায় থেকে রক্ষা পাবে, কেননা নতুন স্ত্রীর প্রতি স্বাভাবিকভাবেই সে দুর্বল থাকবে আবার তার উদারতা দেখে আরও মুগ্ধ হবে এবং তার কথা মানতে উদ্বুদ্ধ হবে। অপর দিকে আগের স্ত্রীও তাহলে নতুনের প্রতি মুগ্ধ হবে এবং সর্বোপরি সংসারের শান্তি রক্ষা হবে।

৭. তালাক সম্পর্কিত কুসংস্কার

তালাক দেয়া বা না দেয়া উভয় ক্ষেত্রেই সমাজে বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতা রয়েছে। কিছু লোক কথায় কথায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। নিতান্ত ঠেকা ছাড়াই সামান্য সামান্য কারণে রাগের মাথায় তালাক দিয়ে দেয় এবং তিন তালাক দিয়ে বসে, ফলে পরে হুশ ফিরে এলেও আর স্ত্রীকে রাখা তার জন্য জায়েয থাকে না। তখন সে নানান ভাবে পারিবারিক অশান্তিতে পড়ে যায়। মনে রাখতে হবে অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া বা নিতান্ত ঠেকা ব্যতীত তালাক দেয়া স্ত্রীর প্রতি যুলুম এবং অন্যায়। আর কখনও তালাক দিতে হলেও এক তালাক দেয়া সমীচীন, যাতে পরে সম্বিত ও হুশ

ফিরে এলে প্রয়োজন বোধে আবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায়। সারকথা, রাগের মাথায় তালাক দেয়া পরিবারে অশান্তি ডেকে আনতে পারে।

আবার কতক লোক সমাজের নিন্দা সমালোচনার ভয়ে, পরিবারের তথাকথিত ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য নিতান্ত ঠেকায় পড়েও স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না। স্ত্রীর সাথে কোনভাবেই তার বনিবনা হচ্ছে না, কোনভাবেই তারা মিলে মিশে চলতে পারছে না, দাম্পত্য জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, তবুও তালাক দিতে পারছে না। ফলে সারাটা জীবন তাদের অশান্তিতে কাটছে। এটাও এক ধরনের কুসংস্কার। অনেক কুসংস্কারই মানুষের মনে অবাঞ্ছিত ছাপ সৃষ্টি করে রাখে এবং সুষ্ঠ চেতনাকে ব্যাহত করে। হিন্দুয়ানী কুসংস্কারের প্রভাবেই তালাককে এত জঘন্য মনে করা হয়। ইসলামে তালাক দেয়াটা অত্যন্ত গর্হিত বটে, কিন্তু তা সব সময়ে এবং সব পরিস্থিতিতে নয় বরং কোন কোন পরিস্থিতিতে তালাক দেয়া ওয়াজিব ও জরূরী হয়ে পড়ে। ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, স্ত্রী যদি স্বামীকে কষ্ট দেয় বা নির্যাতন করে, কিম্বা মোটেই নামায না পড়ে, বা বোঝানো সত্ত্বেও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে উক্ত স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়াটাই মুস্তাহাব ও উত্তম। আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ব্যাপারটা যদি এমন দাঁড়ায় যে, স্বামী স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে পারে না, তাহলে স্ত্রীকে তালাক দেয়া ওয়াজিব হয়ে পড়ে। (অবশ্য যদি স্ত্রী তার অধিকার ছেড়ে দেয় তাহলে ভিন্ন কথা) অতএব কোন ক্রমেই নিন্দা সমালোচনার ভয়ে কিংবা বংশে কেউ তালাক দেয়নি কাজেই তালাক দেয়া যাবে না, এই ঐতিহ্য রক্ষা করতে গিয়ে উক্ত স্ত্রীকে রেখে জীবনকে দুর্বিষহ করার কোন অর্থ নেই। যখন পারস্পরিক অনৈক্যের কোনই সমাধান করা সম্ভব হয় না, তখন তালাক দিয়ে দেয়াই সমীচীন।

৮. অত্যধিক মহর ধার্য করা

অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্প্রীতি না থাকা সত্ত্বেও স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে না শুধু এই কারণে যে, তার ঘাড়ে চেপে আছে বিরাট অংকের মহর, যেটা পরিশোধ করার সাধ্য তার নেই। আবার এই মহরের অংক বড় থাকার সুবাদে অনেক স্ত্রীও স্বামীর অবাধ্য হওয়ার বা স্বামীকে যথাযথভাবে তোয়াক্কা না করার দুঃসাহস পায় এই ভেবে যে, সে যতই করুক স্বামী মহর পরিশোধ করার ভয়ে তাকে ছাড়ার সাহস পাবে না। সাধ্যের বাইরে অত্যধিক মহর ধার্য করলে এভাবে সেটা সংসারের

অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, মহরটাই তখন হয়ে দাঁড়ায় জীবনের জন্য কাল, অশান্তি দূর করার পথে অন্তরায়। ইসলামের দৃষ্টিতে মহর পরিশোধযোগ্য একটি ঋণ, কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً،

অর্থাৎ, তোমরা স্ত্রীদেরকে মহর দিয়ে দাও খুশী মনে। (সূরা নিসা : ৪)

আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য ঋণের ন্যায় এ ঋণও পরিশোধ করা ওয়াজিব-এই চিন্তা থাকলে কোন স্বামীই শুধু নাম শোহরতের জন্য তার সাধ্যের বাইরে মহর ধার্য করত না কিংবা করে থাকলেও ক্রমান্বয়ে তা পরিশোধ করে দিলে পরবর্তীতে তার জন্য সেটা কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। মূলতঃ সমাজ মহরকে শুধু ধার্য করার বিষয় মনে করে, এটা যে পরিশোধ করা জরূরী তা মনে করে না, যার ফলেই এটা কোন এক সময় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই অধিক নয় বরং অল্প মহর ধার্য করাই বৈবাহিক জীবনের জন্য কল্যাণকর। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, ঐ বিবাহে বেশী বরকত হয় যাতে মহর ধার্য করা হয় কম। হযরত ওমর (রা.) স্পষ্টতঃই অধিক মহর ধার্য করতে নিষেধ করতেন। (মেশকাত : ২য়)

৯. যৌতুক প্রথা

আমাদের বর্তমান সমাজে যৌতুক একটি বিরাট পারিবারিক অশান্তির কারণ। এই যৌতুকের অভিশাপে বহু নারীকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়,বহু নারীকে জীবন দিতে হয় এবং পরিবারে শান্তি বিনষ্ট হয়। যৌতুক একটি সমাজিক অভিশাপ এবং এটা সমাজের এক রকম মানসিক সংক্রামক ব্যাধি। এই ব্যাধি থেকে সমাজকে মুক্ত করা অপরিহার্য। যৌতুক চাওয়া যে অবৈধ, এটা একটা ঘৃণিত পন্থা, এটা অনধিকার চর্চা, এর কারণে যে স্ত্রীর কাছে হীন ও নীচ বলে প্রতিপন্ন হতে হয়-এসব কথাগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার হওয়া আবশ্যক, তাহলে হয়ত ধীরে ধীরে এই ব্যাধি সমাজের মন-মানসিকতা থেকে দূর করা সম্ভব হতে পারে। অগ্রিম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে যারা যৌতুক চায় বা যৌতুক পাওয়ার লালসা রাখে তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন না করাই সঙ্গত। এরূপ সামাজিক অপরাধ প্রতিহত করার জন্য কোন কঠোর আইন প্রণয়ন করা হলেও তা ইসলামের পরিপন্থী হবে না।

১০. সন্তানাদির দ্বীনদার না হওয়া

সন্তানাদি যদি পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, খারাপ পথে চলে এবং তাদের কারণে পিতা-মাতা সমাজে লাঞ্ছিত হতে থাকে, তাহলে এটা পরিবারে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক কথায় সন্তানাদি যদি দ্বীনদার ও ভাল না হয়, তাহলে সংসারে সেটা বিরাট অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর প্রতিকার হল সন্তানাদিকে দ্বীনদার বানানো। সন্তানাদিকে দ্বীনদার ও ভাল করে গড়ে তোলার পদ্ধতি সম্পর্কে দেখুন সপ্তম অধ্যায় শিরোনাম "সন্তানকে সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনদার বানানোর মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি"।

১১. পারস্পরিক অধিকার আদায় না করা

পরিবারে মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন ও ছেলে-মেয়ের মধ্যে একের প্রতি অপরের যে অধিকার তা আদায় না করলে, যার যা করণীয় তা না করলে পরস্পরে অমিল এবং এই অমিল থেকে অশান্তির সূত্রপাত ঘটতে পারে। কেউ যদি কারও দ্বারা অধিকার বঞ্চিত হয় তাহলে সেও তার অধিকার আদায় করতে উদ্বুদ্ধ হয় না। এভাবে উভয়ের মধ্যে অমিলের সূত্রপাত ঘটে।

স্ত্রী অবাধ্য হলে তাকে বাধ্য করার মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া

স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হয়ে যায় বা এমন আশংকা দেখা দেয় কিম্বা স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তাহলে সে স্ত্রীকে সংশোধনের জন্য পুরুষদেরকে যথাক্রমে পাঁচটি উপায় বলে দেয়া হয়েছে,

(১) প্রথম পর্যায়ে ধৈর্য ধারণ করবে। এতে স্ত্রী স্বামীর ধৈর্য্য ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে।

(২) তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে, উপদেশ দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করবে। হতে পারে এভাবে স্ত্রী স্বামীকে নিজের মঙ্গলকামী ভেবে তার প্রতি মুগ্ধ হবে এবং নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হবে।

(৩) তাতেও কাজ না হলে তৃতীয় পর্যায়ে স্ত্রীকে সতর্ক করার জন্য স্ত্রী থেকে ভিন্ন বিছানায় শয়ন করবে বা এক বিছানায় থেকেও ভিন্ন দিকে পাশ ফিরিয়ে শুয়ে থাকবে। এভাবে তার আত্মমর্যাদায় মৃদু আঘাত লাগলে সে সাবধান হয়ে যেতে পারে এবং পূর্বের পথ পরিহার করে মর্যাদা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়ে উঠতে পারে। এই ভদ্র জনোচিত শাস্তির পরও যদি সে তার দুষ্কর্ম থেকে এবং অবাধ্যতা থেকে ফিরে না আসে তাহলে চতুর্থ পর্যায়ে–

(৪) তাকে সাধারণভাবে হালকা মারধর করার অনুমতি রয়েছে

অর্থাৎ, এমন মারধর, যাতে তার শরীরে মারধরের প্রতিক্রিয়া বা জখম না হয়।

(৫) উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করার পরও যদি স্ত্রী কথা মানতে আরম্ভ না করে এবং মনোমালিন্য ও বিবাদ দীর্ঘায়িত হয়ে যায়-চাই তা স্ত্রীর স্বভাবের জটিলতা বা অসাবধানতার কারণে হোক বা পুরুষের অহেতুক কড়াকড়ির কারণে হোক-তাহলে পঞ্চম পর্যায়ে সরকার বা উভয় পক্ষের মুরব্বী, অভিভাবক কিংবা মুসলমানদের কোন শক্তিশালী সংস্থা তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে আপোষ করে দেয়ার জন্য দু'জন শালিস নির্ধারণ করে দিবেন-একজন পুরুষের পরিবার থেকে আর একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে। তারা যদি আন্তরিকতার সাথে সৎ নিয়তে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি ও সমস্যার সমাধান করতে আগ্রহী হয়ে কাজ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজে সহায়তা দান করবেন এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব করে দিবেন। অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করার এই প্রক্রিয়া সূরা নিসার ৩৪ ও ৩৫ নং আয়াতে বিধৃত হয়েছে।

স্ত্রীকে শাসন করার পদ্ধতি ও মনস্তত্ত্ব

বোখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী নারীগণ বক্র স্বভাবের হয়ে থাকে। তাদেরকে একেবারে ছেড়ে দিলে বক্রই থেকে যাবে, আবার অতিরিক্ত কড়া শাসন পূর্বক সম্পূর্ণ সোজা করতে চাইলে ভেঙ্গে যাবে। তাই নারীদেরকে শাসন করা বর্জনও করা যাবেনা আবার অতিরিক্ত শাসনও করা যাবেনা। বরং তাদেরকে শাসনের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। তাদেরকে সংশোধনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, তবে পূর্ণ সংশোধন হবে-এমন আশা রাখা যায় না। এরূপ মনোভাব রাখলে স্ত্রীর কিছুটা বক্রতা সত্ত্বেও তাকে মেনে নেয়া সহজবোধ হবে।

স্ত্রী অবাধ্য হলে বা যথাযথ আনুগত্য না করলে তাকে সংশোধনের জন্য পূর্বের পরিচ্ছেদে বর্ণিত ধারায় পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থাৎ, প্রথমে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে এবং উপদেশ দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। এ উদ্যোগ ব্যর্থ হলে বিছানায় তাকে ত্যাগ করতে হবে। এ পন্থায়ও সংশোধন না হলে তারপর তাকে কিছুটা হালকা মারধর করেও সংশোধ-নের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। অনেক মুফাসসিরদের মতে এ তিনটি পন্থার মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, বোঝানো এবং

উপদেশ প্রদানের পূর্বে বিছানায় ত্যাগ করা জায়েয নয় বা বোঝানো ও বিছানায় ত্যাগ করার পন্থাদ্বয় গ্রহণ না করে প্রথমেই মারধর করে সংশোধন করতে যাওয়া বৈধ নয়। কারণ প্রথমেই শক্ত পদক্ষেপ নিলে একদিকে যেমন স্ত্রী শক্ত আঘাতবোধ করবে, ফলে সে বিগড়ে যেতে পারে, আবার শক্ত পদক্ষেপে কাজ না হলে পরে নরম পদক্ষেপও আর কার্যকরী হবে না।

স্ত্রীকে মারধর করার ব্যাপারে যে অনুমতি দেয়া হয়েছে সে ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে-এ মারধর অর্থ নির্যাতন করা নয়, তাকে কষ্ট দেয়া নয় কিংবা তাকে লাঞ্ছিত করা নয় বরং তার আত্মমর্যাদায় মৃদু আঘাত দিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা। নির্যাতন বা লাঞ্ছিত করার পর্যায়ে মারধর করা হলে তাতে স্ত্রীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। এ জন্যেই ফোকাহায়ে কেরাম শর্ত করেছেন, শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়-এমনভাবে মারা যাবে না, চেহারায় মারা যাবে না। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, মারবে রুমাল বা কাপড় পেঁচিয়ে তা দ্বারা বা মেসওয়াক দ্বারা। তদুপরি এই যতটুকু মারধর করার অনুমতি দেয়া হয়েছে তাও সব ক্ষেত্রে নয় বরং ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, সাধারণভাবে চার কারণে মারা যেতে পারে।

(এক) স্বামী যৌন চাহিদা পূরণ করতে আহ্বান করার পরও স্ত্রী যদি অমান্য করে।

(দুই) শরীআত সম্মত ওযর ছাড়া স্বামীর বিনা অনুমতিতে বাড়ির থেকে বের হলে।

(তিন) স্বামীর বলা সত্ত্বেও যদি স্ত্রী সাজসজ্জা ও রূপচর্চা না করে।

(চার) শরীআতের ফরয কর্ম পরিত্যাগ করলে, যেমন নামায না পড়লে, ফরয গোসল না করলে ইত্যাদি। লক্ষ্য করলে দেখা যায়-এ কারণগুলো এমন যার ভিত্তিতে কিছুটা মারধর হলে স্ত্রী সেটাকে আক্রোশ ভেবে বিগড়ে যাবে না বরং সে এটাকে কল্যাণকামিতা ভেবে আরও মুগ্ধ হবে।

স্ত্রীকে শাসন ও সংশোধন করার জন্য বকাঝকা করা, গালমন্দ করা বা মারধর করার ক্ষেত্রে অনেকেই রাগের বশে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। যার ফলে একদিকে শাসনের ফায়দা নষ্ট হয়ে যায়, আবার পরে নিজের বাড়াবাড়ির জন্য নিজেকেই লজ্জিত হতে হয়। এর থেকে বাঁচার উপায় হল—

(এক) ঠিক রাগের মুহূর্তে কিছুই বলবে না বা কিছুই করবে না।

(দুই) কি কি শব্দ বলে তাকে গালমন্দ করতে হবে কিম্বা কিভাবে কোন স্থানে কতটুকু প্রহার করবে তা আগে চিন্তা করে স্থির করে নিবে।

(তিন) গালমন্দ বা প্রহার করার পূর্বে চিন্তা করে নিবে যে, পরে আবার তার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে কত কিছু করা হবে, তখন যেন শরম পেতে না হয়। হাদীছে বলা হয়েছে, তোমাদের কেউ যেন স্ত্রীকে দাস-দাসীর ন্যায় প্রহার না করে, পরে দিন শেষে তো আবার তার সাথে সংগম করতে যাবে। এ তিনটি পন্থা গ্রহণ করলে শাসনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

স্ত্রীকে শাসনের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে-স্বামী শাসক আর স্ত্রী শাসিত নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শাসক শাসিতের সম্পর্ক নয় বরং তাদের মধ্যে সম্পর্কটা হল ভালবাসার সম্পর্ক, প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্ক। অতএব কোন শাসনই যেন ভালবাসার চেতনা বাদ দিয়ে নিছক রাগ ও ক্ষোভ চরিতার্থ করার জন্য না হয়।

স্ত্রীর প্রতি স্বামী রাগান্বিত হলে স্ত্রীর যা যা করণীয়

কোন কারণে স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হয়ে যায় তখন স্বামীর রাগকে প্রশমিত করার জন্য এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্ত্রীর চারটা কাজ করণীয় যথা:

(১) স্ত্রীকে মনে করতে হবে যে, সে স্বামীর অধীনস্ত ও স্বামীর কর্তৃত্বাধীন এবং এই অধীনস্ত ও কর্তৃত্বাধীন থাকার মধ্যেই সাংসারিক ও পারিবারিক কল্যাণ এবং শৃংখলা নিহিত। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ীও এরকমই হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব স্বামীর রাগ সাময়িকভাবে তাকে সহ্য করে নিতে হবে। তার পক্ষেও উল্টো রাগ হওয়াটা সমীচীন হবে না। এরূপ চিন্তাভাবনা স্ত্রীকে স্বামীর কর্তৃত্বাধীন থাকার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করবে।

(২) স্বামী যদি রাগান্বিত হয় আর প্রকৃত পক্ষে স্ত্রীর কোন অন্যায় নাও থাকে, তবুও সেই মুহূর্তে স্ত্রীর চুপ থাকা বাঞ্ছনীয়; স্বামীর সাথে তর্ক জুড়ে দেয়া ঠিক নয়। তর্ক শুরু করলে স্বামীর রাগ আরও বেড়ে যেতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে; যেমন মারধরের দিকে যেতে পারে বা খোদা নাখাস্তা তালাকের দিকেও যেতে পারে। রাগের মুহূর্তেই এসব ঘটে থাকে। অতএব রাগ বৃদ্ধি না করে তা প্রশমিত করা উচিত। স্ত্রীর যদি কোন অন্যায় না থাকে আর সে স্বামীর অন্যায় রাগের

মুহূর্তেও চুপ থাকে, কথা কাটা-কাটি না করে, তাহলে পরে স্বামীর যখন রাগ ঠাণ্ডা হবে তখন সে নিজের অন্যায় রাগের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং স্ত্রীর প্রতি মুগ্ধ হবে, তার অনুগত হয়ে পড়বে, আর ভবিষ্যতে রাগ করতে গেলেও ভেবে চিন্তে রাগ করবে।

(৩) স্বামীর রাগের পেছনে স্ত্রীর অন্যায় থাকুক বা না থাকুক স্ত্রীর উচিত খোশামোদ-তোশামোদ করে হলেও স্বামীর রাগ ভাঙ্গানো। স্ত্রীর যদি অন্যায় থাকে তাহলে তো তার জিদ ধরা চরম অন্যায় হবে এবং তাহলে স্বামীর রাগ আরও বৃদ্ধি পাবে বরং সে মুহূর্তে তার ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত। যদি তার অন্যায় নাও থাকে, তবুও সে জিদ ধরলে হয়তবা স্বামীকে নত করা সম্ভব হবে না। তাহলে তার সামান্য জিদের কারণে পরিণতি খারাপ হয়ে পড়তে পারে। স্ত্রীর একথা মনে করা উচিত নয় যে, আমার অন্যায় নেই, অতএব খোশামোদ করতে যাওয়া আমার জন্য অপমানজনক বরং এই খোশামোদের ফলে স্বামীকে স্বাভাবিক করতে পারলে পরে স্বামীর হুশ ফিরে আসার পর সে উক্ত স্ত্রীর প্রতি মুগ্ধ এবং তার অনুগত হয়ে যাবে। এভাবেই স্ত্রী বিজয়ীনী হবে।

(৪) চুপ থেকে, তর্ক না করে, খোশামোদ-তোশামোদ করেও যদি রাগ ভাঙ্গানো না যায়, তাহলে নির্জনে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে তার কাছে সত্যিকার অবস্থা তুলে ধরবে এবং নিজের অন্যায় থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিবে। ইনশাআ-ল্লাহ স্বামীর রাগ প্রশমিত হবে। নির্জন ঘনিষ্ঠ মুহর্ত স্বামীর দূর্বলতার মুহূর্ত, এ সময় তার মানসিকতাকে অনুকূলে আনা খুবই সহজ।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর রাগ এসে গেলে স্বামীর যা যা করণীয়

কোন দোষ-ত্রুটির কারণে স্ত্রীর প্রতি রাগ এসে গেলে তখন স্বামীর করণীয় হল

(১) স্বামীর চিন্তা করা উচিত যে, প্রাকৃতিক নিয়মে এবং আইন-গতভাবে স্ত্রী তার কর্তৃত্বাধীন ও অধীনস্ত হলেও সেওতো স্ত্রীর ভালবাসা ও খেদমতের ঋণে তার কাছে দায়বদ্ধ। এ হিসেবে সে স্ত্রীর অনুগ্রহের অধীন। স্ত্রীর প্রতি তার অনুগ্রহ থাকলে তার প্রতিও স্ত্রীর অনুগ্রহ রয়েছে। স্ত্রীর যেমন স্বামীকে প্রয়োজন, স্বামীরও স্ত্রীকে প্রয়োজন। উভয়েই উভয়ের কাছে ঠেকা। অতএব এক তরফা ভাবে কর্তৃত্ব সুলভ মনোভাব নিয়ে কথায়

কথায় স্ত্রীর প্রতি রাগ করা তার জন্য ঠিক নয়। এরূপ চিন্তা তার রাগকে প্রশমিত করবে।

(২) স্বামীর সব সময়ই স্ত্রীর অসহায়ত্ব এবং তার জন্য স্ত্রীর আপনজন ছেড়ে চলে আসার কথা স্মরণ করা দরকার, তাহলে স্ত্রীর প্রতি রাগ নয় বরং সহানুভূতি জাগ্রত হবে এবং রাগের মুহূর্তে এটা স্মরণ করলে রাগ প্রশমিত হবে।

(৩) কোন একটা দোষের কারণে রাগ এসে গেলে তার অন্য অনেক গুণ রয়েছে সেগুলো স্মরণ করে তার প্রতি প্রীত হওয়ার চেতনা জাগ্রত করবে। হাদীছে বলা হয়েছে-তার কোন একটা কিছু অপছন্দ লাগলে অন্য আর একটা পছন্দ লাগবে।

(৪) উপরোক্ত পন্থায় রাগ প্রশমিত না হলে রাগ দমন করার স্বাভাবিক যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে তার উপর আমল করবে। (এর জন্য দেখুন দশম অধ্যায়- শিরোনাম "রাগের মুহূর্তে মন নিয়ন্ত্রণ"।)

স্ত্রীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে তার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকার

দোষ-গুণে মানুষ। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু দোষ থাকে, আবার তার অনেক গুণও থাকে। স্ত্রীর মধ্যেও এমন কিছু পরিলক্ষিত হতে পারে যা স্বামীর কাছে অপছন্দ লাগবে। যদি স্ত্রীর মধ্যে এমন কিছু পরিলক্ষিত হয় যা স্বামীর কাছে অপছন্দ লাগে এবং তার কারণে স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করতে মনে চায় বা তাকে ছেড়ে দিতে মনে চায় কিংবা তার প্রতি ভালবাসা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা বোধ হয়, সে মুহূর্তে তার প্রতিকারের জন্য স্বামীকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিন্তায় আনতে হবে-

(১) তার অন্যান্য গুণাবলীর কথা চিন্তা করা এবং এভাবে তার প্রতি মুগ্ধ হওয়ার চেষ্টা করা। যেমন পূর্বে হাদীছের উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে।

(২) এই চিন্তা করা যে, এ সব দোষ দেখেও যদি সবর করা হয়, তাহলে ছওয়াব হবে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। অতএব আল্লাহ আমাকে এ স্ত্রী দান করে আমার প্রতি অনুগ্রহই করেছেন-আমার ছওয়াব লাভ ও মর্যাদা বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছেন।

(৩) নিজের কিছু দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ করে ভাববে যে, আমার এসব দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেওতো স্ত্রী আমাকে ভালবেসে যাচ্ছে, সে সবর করে যাচ্ছে, তাহলে আমি কেন তার দোষ-ত্রুটি দেখে সবর করতে পারব না,

আমি কেন এসব সত্ত্বেও তাকে ভালবাসতে পারব না?

(৪) একান্তই তাকে ছেড়ে দিতে মনে চাইলে এই চিন্তা করবে যে, আমি তাকে ছেড়ে দিলে সে অন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের ঘরে যাবে এবং তার কষ্টের কারণ হবে। অতএব তাকে রেখে দিলে অন্য ভাইকে কষ্ট পাওয়া থেকে রক্ষা করার ছওয়াব পাওয়া যাবে। অন্যথায় আর এক ভাইকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমিও দায়ী হয়ে যাই কি-না?

(৫) স্ত্রীর এমন কোন কিছুর কারণে যদি তাকে অপছন্দ লাগে, যা তার এখতিয়ার বহির্ভূত; যেমন স্বামী ছেলে কামনা করে অথচ স্ত্রীর গর্ভে শুধু কন্যাই জন্ম নেয় বা তার সন্তানই হয় না কিম্বা স্ত্রীর একের পর এক রোগ ব্যাধি লেগে থাকে ইত্যাদি; আর এ কারণে যদি স্ত্রীকে স্বামীর অপছন্দ লাগে, তাহলে স্বামীর ভেবে দেখতে হবে যে, এ অপছন্দ লাগার জন্য স্ত্রী দায়ী নয়। এতে স্ত্রীর কোন দোষ নেই। এ ক্ষেত্রে রাগ করা হলে এ রাগ মূলত তাকদীরের উপর এবং আল্লাহর ফয়সালার উপর গিয়ে পড়ে, যা মারাত্মক অন্যায়। তাকদীরের উপর গন্তুষ্টি এবং তাকদীরের উপর যথার্থ বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমেই এ রকম অপছন্দ লাগাকে দূর করা সম্ভব।

(৬) এই চিন্তা করবে যে, আমরা আল্লাহর কত নাফরমানী করি, আল্লাহর অপছন্দ লাগার কত কাজ করি, তারপরও আল্লাহ আমাদের সাথে করুণার আচরণ করেন। আল্লাহর এ চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে আমারও উচিত করুণার আচরণ করা।

স্বামীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে তার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকার

স্ত্রীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে তার প্রতিকারের জন্য স্বামীকে যে সব বিষয় চিন্তা করে দেখতে হবে-যা পূর্বের পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে-তদ্রূপ স্বামীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে মন থেকে সে অপছন্দ লাগাকে দূর করার জন্য স্ত্রীকেও সে বিষয়গুলো চিন্তা করতে হবে। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ দেখে নিন।

স্বামীকে বশীভূত করার মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি

স্বামীকে বশীভূত করার অর্থ যদি এই হয় যে, স্বামী স্ত্রীর বাধ্যগত হয়ে থাকবে, তার কথায় স্বামী উঠা-বসা করবে এবং স্ত্রী স্বামীর নাকে রশি লাগিয়ে ঘুরাতে পারবে, এরকম বশীভূত করতে চাওয়াও ঠিক নয়।

কেননা, এটা শরীআতের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। শরীআত চায় স্বামী স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করবে এবং স্ত্রী স্বামীর অনুগত ও বাধ্যগত থাকবে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ،

অর্থাৎ, পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বের অধিকারী। (সূরা নিসা : ৩৪)

তবে হ্যাঁ স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তাকে যথাযথ ভাল না বাসে, তার হক আদায়ে ত্রুটি করে, তাহলে তাকে বশীভূত করতে চাওয়া এই অর্থে যে, সে স্ত্রীর প্রতি যেন সন্তুষ্ট হয়ে যায়, স্ত্রীকে যেন যথার্থ ভালবাসে, তার হকসমূহ যেন আদায় করে-এরূপ বশীভূত করতে চাওয়া অন্যায় নয়। স্বামীকে এরূপ বশীভূত করার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল স্ত্রী স্বামীর সাথে খোশামোদ- তোশামোদ করে চলবে, স্বামীর কল্যাণ ও স্বামীর খেদমতের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদিত করে দিবে। একথা মনে রাখা দরকার যে, জোরপূর্বক স্বামীকে বশীভূত করা যায় না। কোন স্ত্রী জোর জবরদস্তী করে, রাগারাগি করে, জিদ ধরে, তর্কাতর্কি করে, ঝগড়া ফ্যাসাদ করে স্বামীকে স্থায়ীভাবে বশীভূত করতে পারে না। একমাত্র খোশামোদ-তোশামোদ করেই স্বামীকে অনুগত করা যায়।

শ্বশুর বাড়ীতে বসবাস ও সকলের সাথে মিলে মিশে থাকার মনস্তাত্ত্বিক নীতিমালা

শ্বশুর বাড়ীতে বসবাসের কতিপয় মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি রয়েছে, যা মেনে চললে শ্বশুর বাড়ীর সকলের সাথে মিলে মিশে থাকা যায় এবং সকলের কাছে প্রিয় হওয়া যায়।

(১) স্বামীর হক যথাযথ ভাবে আদায় করা।

(২) যতদিন শ্বশুর-শাশুড়ী জীবিত থাকবেন তাদের খেদমত ও আনুগত্যকে ফরয বলে জানবে এবং সে মতে তাদের খেদমত ও আনুগত্য করবে। তাদের সাথে কথা-বার্তা ও উঠা-বসায় আদব-সম্মানের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখবে। শ্বশুর শাশুড়ীর খেদমত করা আইনত ফরয না হলেও নৈতিক ফরয। তাদের খেদমত ও আনুগত্য করলেই তারা প্রীত হবেন।

(৩) শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ প্রমুখদের থেকে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ভিন্ন সংসার গড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে না। যদিও স্ত্রীর অধিকার রয়েছে ভিন্ন হয়ে যাওয়ার, কিন্তু সে এরূপ দাবী করলে, এর জন্য পীড়াপী-

ড়ি করলে শ্বশুর-শাশুড়ী যখন জানবে, তখন তারা এই ভেবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে যে, পুত্র-বধূ আমাদের পুত্রকে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এখান থেকেই ভুল বুঝাবুঝি ও ফ্যাসাদের সূত্রপাত ঘটবে।

(৪) শ্বশুর বাড়ীর কোন দোষ-ত্রুটি মা-বাপের কাছে বলবে না শ্বশুরালয়ের কারও সম্পর্কে কোন গীবত শেকায়েত বাপের বাড়ীতে করবে না। এ থেকেই ক্রমান্বয়ে উভয় পক্ষের মন খারাপ হয়ে নানান জটিলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(৫) শ্বশুর-শাশুড়ী জীবিত থাকা অবস্থায় যদি একান্নভুক্ত সংসার হয় তাহলে স্বামী সংসার চালানোর টাকা পয়সা স্ত্রীর হাতে দিতে চাইলে সে স্বামীকে বলবে শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে দেয়ার জন্য; যাতে শ্বশুর-শাশুড়ীর মন পরিস্কার থাকে এবং তারা এই ভাবতে না পারে যে, পুত্র-বধূ আমাদের পুত্রকে কুক্ষিগত করে ফেলেছে।

(৬) শ্বশুর বাড়ীর সকল বড়দেরকে আদব এবং ছোটদেরকে স্নেহ করবে।

(৭) শাশুড়ী, ননদ প্রমুখরা যে কাজ করবে তা করতে লজ্জাবোধ করবে না। তাদের কাজে সহযোগিতা করবে এবং তারা করার পূর্বেই সম্ভব হলে তাদের কাজ করে দিবে, তাহলে তাদের ভালবাসা লাভ করা যাবে।

(৮) নিজের কাজ কারও জন্য ফেলে রাখবে না এই ভেবে যে, অমুকে করে দিবে। নিজের সব কিছুকে নিজেই সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখবে।

(৯) দুই চারজনে কোন গোপন কথা বলতে থাকলে সেখান থেকে সরে যাবে। তারা কি বলছিল জানার জন্য খোঁজ লাগাবে না। অহেতুক এই সন্দেহ করবে না যে, তারা হয়ত আমার কোন দোষ বলাবলি করছে।

(১০) শ্বশুর বাড়ীতে প্রথম প্রথম মন না বসলেও মনকে বুঝানোর চেষ্টা করবে, কাঁদা জুড়ে দিবে না। এসে পারলে না এরই মধ্যে আবার যাওয়ার জন্য পীড়া পীড়ি শুরু করবে না। এভাবে কিছুদিন পর মন ঠিক হয়ে যাবে।

পুত্র বধূর প্রতি শ্বশুর-শাশুড়ীর যা যা করণীয়

(১) পুত্র-বধূ এলেই শ্বাশুড়ী মনে করবে না যে, এখন থেকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, ঘরের কোন কাজ আর আমাকে করতে হবে না, এখন কাজের মানুষ এসে গেছে। পুত্র-বধূ ঘরের বাঁদী বা চাকরানী নয় বরং

পুত্র-বধূ ঘরের শোভা পুত্র-বধূকে চাকরানী মনে করবে না এবং চাকরানী সুলভ আচরণ তার সাথে করবে না।

(২) শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করা পুত্র-বধূর আইনত দায়িত্ব নয়, করলে সেটা তার অনুগ্রহ। অতএব শ্বশুর-শাশুড়ীর যতটুকু খেদমত সেবা সে করবে তার জন্য শ্বশুর-শাশুড়ী প্রীত হবে এবং এটাকে তার অনুগ্রহ মনে করবে। আর যতটুকু সে করবে না তার জন্য তাকে জবরদস্তি করতে পারবে না। কিম্বা তার কারণে তার সাথে খারাপ আচরণ করতে পারবে না।

(৩) পুত্র-বধূর অধিকার রয়েছে শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে একান্নভুক্ত না থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার। অতএব পুত্র-বধূ যদি পৃথক হতে চায় তাহলে তাকে বাধা দিতে পারবে না। বরং হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেছেন, এই জামানায় একান্নভুক্ত থাকার কারণেই পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। কাজেই শুরুতেই ফ্যাসাদ লাগার আগেই পুত্র ও বধূকে পৃথক করে দেয়া সমীচীন। তাতে মহব্বত ভাল থাকবে। অন্যথায় যখন ফ্যাসাদ লাগবে তখন পৃথকও করে দিতে হবে আবার মহব্বত ও সু-সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যাবে।

(৪) পুত্রের সাথে পুত্র-বধূর অত্যধিক ভালবাসা হতে দেখলে ঈর্ষাবে-াধ করবে না এবং অহেতুক এই সন্দেহ করবে না যে, বধূ আমাদের পুত্রের মাথা খেয়ে ফেলেছে, আমাদের থেকে বুঝি তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা হয়ে যাওয়াইতো শরীআতের কাম্য। তাদের মধ্যে মহব্বত হতে দেখলে ঈর্ষাবোধ করবে, আবার অমিল হয়ে গেলে মিল করানোর জন্য তাবীজের সন্ধানে ছুটাছুটি করবে-এই বিপরীত মুখিতার কোন অর্থ হয় না।

(৫) পুত্র-বধূকে স্নেহ করবে, আদর সোহাগ করবে এবং তার আরাম ও সুবিধার প্রতি খেয়াল রাখবে, যেন পুত্র-বধূ শ্বশুর-শাশুড়ীকে স্নেহময়ী পিতা-মাতার মত পেয়ে তাদেরকে আপন মনে করে নিতে পারে এবং তাদের জন্য সব রকম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করাকে নিজের গৌরব মনে করে নিতে পারে।

(৬) পুত্র-বধূর কাছে নিজেদেরকে তার কল্যাণকামী হিসেবে প্রমাণিত করতে হবে, যাতে তাদের প্রতি পুত্র-বধূর ভক্তি ও আযমত বৃদ্ধি পায়।

(৭) যৌতুকের জন্য পুত্র-বধূকে কোন রকম চাপতো দূরের কথা

ঈশারায় ইঙ্গিতেও কিছু বলবে না। এমনকি পুত্র-বধূ তার বাপের বাড়ী থেকে কি কি মাল সামান এনেছে, কি কি আনেনি বা কেন আনেনি-এ প্রসঙ্গে কোন আলোচনাই তুলবে না। মনে রাখতে হবে-যৌতুক চাওয়া হারাম এবং এই যৌতুকের কারণে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে, এখন কোন পিতা-মাতা যৌতুকের কথা তুলে পুত্রের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে কি-না, সেটা মাতা-পিতার উচিত হবে কি-না, তা তাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। অনেক সময় পুত্র পিতা-মাতাকে এসব কথা কিছুই বলে না, বরং পিতা-মাতাই নিজেদের থেকে এসব আলোচনা তুলে থাকে, কিন্তু পুত্র-বধূ মনে করে স্বামীর ইশারাতেই এগুলো বলা হচ্ছে। এভাবে পিতা-মাতার এসব আলোচনা দ্বারা পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে মন কষা-কষি শুরু হয়ে যেতে পারে।

(৮) পুত্র-বধূকে সংসার চালানো শিখিয়ে দিবে।

(৯) পুত্র-বধূকে এই নতুন সংসারে এবং নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দান করবে।

(১০) পুত্র-বধূ এক হিসেবে শ্বশুর-শাশুড়ীর অধীনস্ত, অতএব পুত্রবধূর দ্বীনদারী, ইবাদত বন্দেগী ও তার ইজ্জত আব্রুর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

বি. দ্র. পরিবার মনোবিজ্ঞান অধ্যায়ের অধিকাংশ তথ্য আমার রচিত "আহকামে যিন্দেগী" গ্রন্থ থেকে (কিঞ্চিত সংযোজন সহ) গৃহীত।

সপ্তম অধ্যায়

শিশু মনোবিজ্ঞান

(ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ)

শিশুর শারীরিক পরিচর্যায় মনোবিজ্ঞান

* শিশুদেরকে সকলের কোলে যাওয়ার অভ্যাস করাবে, যাতে একজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে। অন্যথায় সে একজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে তার অবর্তমানে শিশুর অসুবিধা হতে পারে।

* পেশাব পায়খানার পর শিশুকে শুধু মুছে দেয়া যথেষ্ট নয় বরং পেশাব পায়খানার পর তৎক্ষণাৎ পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে দিতে হবে, তাহলে তার মধ্যে পেশাব পায়খানার পর পানি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর পবিত্রতা অর্জনের মানসিকতা গড়ে উঠবে।

* শিশুদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ানোর অভ্যাস করানো ভাল, তাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, সাথে সাথে খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকতার মনোভাব গড়ে উঠবে।

* শিশুদেরকে বিশেষ কোন এক ধরনের খাদ্যের প্রতি অভ্যস্ত করে তুলবে না বরং মৌসুমী সব ধরনের খাদ্য খাওয়াবে, তাহলে অভ্যাস ভাল হবে।

* সক্ষম হওয়ার পর শিশুদেরকে নিজের হাতে নিজের খাবার খেতে অভ্যস্ত করে তুলবে, তাতে পরনির্ভরশীলতার মনোভাব হ্রাস পাবে।

* খাওয়ার পূর্বে ভালভাবে হাত পরিষ্কার করে দিবে। তাহলে শিশু পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত হবে।

* বাচ্চাদের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যেন নিজের কাজ নিজে করে। তাহলে তাদের মধ্যে আত্মনির্ভরতার মনোভাব সৃষ্টি হবে।

* বাচ্চাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে, তাহলে তাদের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার মানসিকতা গঠন হবে।

* ভাল খাবার ও মস্তিষ্কের জন্য উপকারী খাদ্য খাবার দিবে, তবে বিলাসিতায় যেন অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে। (তারবিয়াতে আওলাদ ও মাআরিফুল কুরআন প্রভৃতি থেকে গৃহীত)

শিশুর শারীরিক ব্যায়াম ও খেলাধূলা

বাচ্চাদেরকে কিছুটা হালকা ব্যায়াম যেমন হাঁটা চলা করা, দৌড়াদৌড়ি করা ইত্যাদিতে অভ্যস্ত করাতে হবে, তাহলে তাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং অলসতা আসবে না। কিছুটা খেলা-ধূলা ও ফুর্তিরও সুযোগ দিতে হবে, তাহলে মন ও স্বাস্থ্য উভয়টার উপকার হবে। সর্বক্ষণ মাতা-পিতা তাদেরকে আগলে রাখলে তাদের মধ্যে বদ্ধ মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। এতে তারা মাতা-পিতার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্বাধীনচেতা হতে শিখবে না এবং তাদের মানসিকতা বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

শিশু ও তার খেলার সাথী

শিশুদের সমবয়সী খেলা-ধূলার সাথীরাও শিশুদের জন্য একটি পরিবেশ। শিশু কিশোরদের নানা রকম ব্যবহার ও চরিত্র গঠনে এ পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। সাথীদের সংস্পর্শে এসেই তাদের মধ্যে নানা রকমের সামাজিক এবং আবেগ সম্বন্ধীয় বিকাশের সূচনা হয় এবং নতুন নতুন মনোভাব তারা অর্জন করে। তাই শিশুদেরকে অবাধ্য, দুশ্চরিত্র ও অসুস্থ পারিবারিক পরিবেশ থেকে উঠে আসা ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খেলা-ধূলা করতে দিবে না। অন্যথায় তাদের চরিত্রের কুপ্রভাব ওদের মনে রেখাপাত করতে পারে। এমনকি ছেলেদেরকে মেয়েদের সঙ্গে খেলা-ধূলা করতে দিলে ছেলেদের মধ্যে মেয়েলিপনা বা মেয়েদের মধ্যে ছেলেমিপনা বা উভয়ের মধ্যে পর্দাহীনতার মনোভাব দেখা দিতে পারে। অতএব শিশুদের খেলার সাথী নির্বাচনের বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

শিশুর মানসিক পরিচর্যায় মনোবিজ্ঞান

শিশু কিশোরদের সামনে বা তাদের সাথে কথাবার্তা ও আচার আচরণ এমন হওয়া উচিত যাতে তাদের মনে খারাপ প্রতিক্রিয়া না হয় বরং ভাল প্রতিক্রিয়া হয়। মনে রাখতে হবে শিশুরা অবুঝ হলেও তারা কোন কথা ও আচরণ পূর্ণ উপলব্ধি করতে না পারলেও তার ভাল বা মন্দ প্রতিক্রিয়া তার মনে পড়বে এবং তাদের মন মানসিকতা গঠনে সেটা ভূমিকা রাখবে। শিশুর ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয় ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে এ সবের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিশুর মন ভিডিও-এর ন্যায়, যা কিছুই তার সামনে বলা হবে বা করা হবে তার একটা চিত্র শিশুর মনে অংকিত হয়ে যাবে। যদিও সে এখন তা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন

সে প্রকাশ করতে সক্ষম হবে তখন দেখা যাবে শিশুকালে যে সব চিত্র তার মনে অংকিত হয়েছিল এখন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। তাই শিশুর সামনে অবলীলায় সব কিছু বলা বা করা যাবে না বরং শুধু এমন সব কিছুই তার সামনে বলতে বা করতে হবে যাতে তার মন-মানসিকতা ভাল এবং উন্নত হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হল।

* জন্মের সময় শিশুর (ছেলে হোক বা মেয়ে হোক) কানে আযান ও ইকামতের শব্দ বলবে, (ডান কানে আযানের শব্দাবলী এবং বাম কানে ইকামতের শব্দাবলী) তাহলে একটা ফায়দা এ-ও হবে যে, তার মনে ঈমানের শক্তি সৃষ্টি হবে।

* অবুঝ শিশুর জাগ্রত থাকা অবস্থায় তার সামনেও মাতা-পিতা অশ্লীল কথা-বার্তা ও যৌন আচরণে লিপ্ত হবে না, অন্যথায় শিশুর মধ্যে নির্লজ্জতা সৃষ্টি হতে পারে।

* শিশুর সাথে অনাদর ও অবহেলার আচরণ করবে না, তাহলে তাদের মন নিষ্ঠুর ও বিকারগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। মায়ের স্নেহ, পিতার ভালবাসা আর ভাই বোনদের আদর সোহাগ শিশুর অসহায়তাবোধকে দূর করে নিরাপত্তাবোধের সূচনা করে। তবে স্নেহ ভালবাসা এবং আদর সোহাগ পরিমিত হওয়া চাই, কেননা শিশুকে মাত্রাহীন আদর সোহাগ করলে তারা লাগামহীন হয়ে যেতে পারে।

* শিশুদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করালে তাদের পরিচ্ছন্ন মানসিকতা গঠিত হবে। অন্যথায় তাদের মধ্যে নোংরা থাকার মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

* শিশু কিশোরদেরকে যতদূর সম্ভব তাদের নিজেদের কাজ নিজেদের হাতে করতে অভ্যস্ত করাবে, তাহলে তারা আত্মনির্ভরশীল মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠবে।

* শিশু কিশোরদেরকে অতি বেশী জাঁকজমক ও বিলাসিতায় লালন-পালন করলে তাদের মধ্যে বিলাসী মনোভাব সৃষ্টি হয়।

* শিশুদের সব জিদ ও সব দাবী পূরণ করতে নেই, তাহলে তাদের মধ্যে একগুঁয়েমি ও হটকারিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। তাই তাদের সব জিদ ও সব দাবী পূরণ করতে নেই। বিশেষভাবে অন্যায় জিদ ও অন্যায় দাবী পূরণ হতে বিরত থাকা উচিত। আবার তাদের কোন দাবীই যদি পূরণ না হয়, তাহলে তাদের মন ছোট হয়ে যাবে এবং তারা সংকীর্ণ মানসিকতার

অধিকারী হয়ে যাবে।

* শিশুদেরকে বাঘের ভয়, শিয়ালের ভয়, ভূতের ভয় ইত্যাদি দেখাবে না, তাহলে তারা ভীরু প্রকৃতির হয়ে যেতে পারে।

* শিশুরা অন্যায় করলে আল্লাহ্‌র ভয় দেখাবে, জাহান্নামের আযাবের ভয় দেখাবে, তাহলে তাদের মনে খোদাভীরুতা সৃষ্টি হবে। আর তাদের অন্যায় কাজে বাধা না দিলে অন্যায়কে তারা ন্যায় বলে ভাবতে শিখবে।

* ভাল কাজের জন্য আল্লাহ্‌র খুশী হওয়ার কথা এবং জান্নাতের নেয়ামত লাভের কথা শোনালে তাদের মনে পরকালের চিন্তা গড়ে উঠতে সহায়ক হবে।

* প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহ সব কিছুই দেখেন ও জানেন-এ বিষয়টা তাদের সামনে তুলে ধরলে তাদের মধ্যে খোদামুখী চেতনা গড়ে উঠবে।

* শিশুদেরকে নেককার লোকদের কাহিনী শুনালে তাদের মধ্যে নেককার হওয়ার চেতনা সৃষ্টি হবে এবং বীর বাহাদূরের কাহিনী শুনালে তাদের মধ্যে বীরত্বের মনোভাব জাগ্রত হবে।

* শিশুদেরকে তাগিদ সহকারে অভ্যস্ত করাবে তারা যেন মুরব্বী ছাড়া কারও নিকট কিছু না চায় কিম্বা কেউ কিছু দিলে মুরব্বীর অনুমতি ব্যতীত যেন গ্রহণ না করে। এরূপ না করলে তাদের মনে লোভ-লালসা জন্ম নিবে।

* গরীব মিসকীনকে দান-সদকা করতে হলে শিশুদের হাত দ্বারা সেটা দেওয়াবে, তাহলে শিশুদের মধ্যে দানশীলতার মনোভাব জন্ম নিবে।

* শিশুরা ভাল কাজ করলে বা ভাল লেখা পড়া করলে তাদেরকে সামান্য পুরস্কার প্রদান করবে এবং সাবাশী প্রদান করবে, তাহলে ভাল কাজের প্রতি তাদের উৎসাহ সৃষ্টি হবে। এর বিপরীত মন্দ কাজ করলে অবস্থা অনুযায়ী সামান্য তিরস্কার ও সামান্য শাস্তি প্রদান করবে, তাহলে তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, এটা মন্দ। তবে মনে রাখতে হবে খুব বেশী সাবাশী দেয়া বা খুব বেশী পুরস্কৃত করা ঠিক নয়, তাহলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। পক্ষান্তরে খুব বেশী শাস্তি দিলে তারা খিটখিটে বা জেদী হয়ে যেতে পারে বা বেশী তিরস্কৃত করলে নিজের ব্যাপারে তার অনাস্থা জাগতে পারে। বস্তুতঃ সাবাশী বা পুরস্কার দান, কিম্বা তিরস্কার ও

শাস্তি প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক-এ ব্যাপারে খুব বিবেচনা সহকারে মেপে মেপে পদক্ষেপ নিতে হবে।

* শিশুদেরকে কোন খাদ্য খাবার দিলে তারা যেন সকলের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে সকলে মিলে খায়-এরূপ অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। তাহলে তাদের মধ্যে স্বার্থপরতার মনোভাব সৃষ্টি হবে না বরং সমবেদনার মনোভাব সৃষ্টি হবে।

* শিশুদের জন্য আদর্শ শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে, তাহলে তারা আদর্শবান হওয়ার চেতনা লাভ করবে।

শিশুদের আদর সোহাগ ও তার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

বাচ্চাদের আদর সোহাগ করা সুন্নাত। পরিমিত আদর সোহাগ থেকে বঞ্চিত হলে বাচ্চাদের মানসিকতা বিকৃত হয়ে যেতে পারে। মাতা-পিতার সাথে শিশুর মধুর সম্পর্ক শিশুর ব্যক্তিত্বের অনুকূল বিকাশে সহায়তা করে। পিতা-মাতার আদর স্নেহ থেকে বঞ্চিত শিশু এতটুকু আদর সোহাগ পাওয়ার জন্য লালায়িত হয়ে অন্যত্র গমন করতে শুরু করে। যার ফলাফল শিশুর ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের পক্ষে মোটেই শুভ হয় না। এমনকি অনেক সময় শিশুকে মাতা-পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে সমাজ বহির্ভূত কাজেও লিপ্ত হতে দেখা যায়। স্নেহ বঞ্চিত পারিবারিক পরিবেশ থেকে শিশু কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার সূচনা হতে পারে।

আবার বাচ্চাদেরকে আদর সোহাগ খুব বেশী করা হলেও তাদের জন্য ক্ষতিকর। এতে তারা লাগামহীন হয়ে যেতে পারে।

সন্তানকে কাপড়-চোপড়, খাদ্য-খাবার ও টাকা-পয়সা প্রদানের মনস্তাত্ত্বিক নীতিমালা

* প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য যে পোষাক ব্যবহার করা নিষেধ অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকেও সেরূপ পোষাক প্রদান নিষিদ্ধ। অন্যথায় নিষিদ্ধ পোষাককে তারা বৈধ ভাবতে শিখবে এবং শিশুকালের এই মনোভাব বয়ঃকালেও মন থেকে দূর করা কঠিন হবে।

* ছেলেদেরকে সাদা পোষাক পরিধান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে এবং রং চংয়ের পোষাকের প্রতি অনুৎসাহিত করবে এই বলে বলে যে, এরূপ পোষাক মেয়েলী পোষাক, তুমি মাশাআল্লাহ পুরুষ ছেলে ইত্যাদি।

* সন্তানকে খাদ্য খাবার প্রদানের বিষয়ে পূর্বে শিশুদের ‘স্বাস্থ্যগত

পরিচর্যা’ শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

* সন্তানকে অতিরিক্ত বিলাসী পোষাক প্রদান করবে না, এতে তাদের অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে।

* সন্তানকে অবৈধ বস্তু ক্রয়ের জন্য টাকা-পয়সা প্রদান করা জায়েয নয়; যেমন পটকা ও আতসবাজী ক্রয়ের জন্য। এরূপ খাতে ব্যয় করার জন্য তাদেরকে অর্থ প্রদান করবে না, যাতে করে অবৈধ খাতে অর্থ ব্যয়ের প্রতি তারা নিরুৎসাহিত হয়।

* সব সন্তানকেই একই মানের জিনিস ও কাপড়-চোপড় দেয়া কর্তব্য। বিনা কারণে বৈষম্য করা মাকরূহ। বৈষম্য করলে শিশুদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে থাকে।

* সন্তানদেরকে টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি ইত্যাদি হাদিয়া দিলে সকলকে সমান দেয়া কর্তব্য (উত্তম)। তবে কোন সন্তান যদি তালিবে ইলম হয়, দ্বীনের খাদেম হয় বা উপার্জনে অক্ষম হয়, তাহলে তাকে কিছু বেশী দেয়া হলে তা জায়েয। এ ক্ষেত্রে তালিবে ইলমকে অধিক দেয়া হলে অন্যদের মনে ইল্‌মের প্রতি গুরুত্ববোধ সৃষ্টি হবে এবং অসহায়কে অধিক দেয়া হলে অন্যরা সমবেদনাবোধ শিখতে পারবে। (তারবিয়াতে আওলাদ ও বেহেশতি জেওর-এর আলোকে)

শিশুদের শিক্ষা বিষয়ক মনস্তাত্ত্বিক নীতিমালা

* শিশুকে সর্বপ্রথম কালিমায়ে তাইয়্যেবা শিক্ষা দিবে।

* নিয়মিত লেখা-পড়া শুরু করানোর পূর্বেও সময় সুযোগে তার ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ঈমানের কথা এবং ভাল মন্দ সম্পর্কে শিক্ষা দিবে এবং মৌখিকভাবে দু‘আ দুরূদ ইত্যাদি শিখাবে। এতে তার মনে ঈমানের প্রভাব পড়বে এবং জীবনের শুরু থেকে ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ জানতে শিখবে।

* সর্ব প্রথম প্রয়োজনীয় দ্বীনী শিক্ষা দেয়া এবং কুরআন পাঠ শিক্ষা দেয়া কর্তব্য; যাতে এ জ্ঞানকে সে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে শিখে।

* শিশুদের শিক্ষা দানের জন্যও আদর্শ ও নেককার শিক্ষক নির্বাচন করা উত্তম। কেননা শিশুরা শিক্ষককে আদর্শের কেন্দ্র ভাবতে শিখে এবং তাদের স্বাভাবিক অনুকরণ প্রীতি শিক্ষকের সব কিছু অনুকরণে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে।

* যতদূর সম্ভব বিজ্ঞ, দক্ষ ও পারদর্শী শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষাদান

করানো প্রয়োজন, তাহলে সন্তানও তদ্রূপ বিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে গড়ে উঠবে। শুধু সস্তা শিক্ষক খোঁজা হলে শুরু থেকেই শিশুর শিক্ষার মান বিগড়ে যাবে এবং অপরিপক্কভাবে শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার মানসিকতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। তারপর সংশোধন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

* নিয়মতান্ত্রিক লেখা-পড়া শুরু হওয়ার পর মামুলী ছুটি ব্যতীত বার বার ছুটি দেয়া চলবে না। তবে নিতান্ত জরূরত হলে ভিন্ন কথা। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত বার বার ছুটি দেয়া হলে তারা লেখা-পড়াকে গুরুত্বহীন মনে করবে এবং ছুটির জন্য নানা অজুহাত বের করতে শিখবে।

* কঠিন পাঠগুলো সকালের দিকে এবং সহজ পাঠগুলো বিকালের দিকে পড়াবে। কেননা বিকালে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন কঠিন পাঠ দেয়া হলে তার মধ্যে জটিলতা দেখা দিতে পারে।

* শিশুদের পড়ার সময় ও পাঠের পরিমাণ আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করবে। যেমন প্রথম দিকে এক ঘন্টা করে তারপর দুই ঘন্টা করে। এমনি-ভাবে তার স্বাস্থ্য ও শক্তি অনুসারে সময় ও পাঠের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকবে। এক সঙ্গেই সারা দিন লেখা-পড়ার চাপ দিলে একদিকে ক্লান্তি বশত সে পড়া চুরি করতে শুরু করবে, অপরদিকে ধারণ ক্ষমতার উপর অতিরিক্ত চাপ পড়লে তার স্মৃতিশক্তি ও মেধায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে।

বি. দ্র. শিক্ষা বিষয়ক অন্যান্য নীতিমালা “শিক্ষা মনোবিজ্ঞান” অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিশুদের দাবী দাওয়া ও জিদ পূরণ করা না করার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

* সন্তানের বৈধ দাবী দাওয়া কিছু কিছু পূরণ করতে হয়, অন্যথায় তাদের মন ছোট হয়ে যায়।

* সন্তানের সব জিদ পূরণ করতে নেই, তাহলে তাদের মধ্যে একগুঁয়েমি ও হঠকারিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ সন্তান যদি কোন অবৈধ বিষয়ের জন্য দাবী করে বা জিদ ধরে, তাহলেও তা করা জায়েয নয়-হারাম। এরূপ জিদ থেকে বিরত না হলে প্রয়োজনে তাকে শাসন করতে হবে।

* যেটা দেয়ার ইচ্ছা নেই, সন্তানকে ভুলানোর জন্য বা থামানোর

জন্য এরূপ কোন বিষয়ের ওয়াদা করা নিষেধ। এটাও মিথ্যার শামিল। এরূপ কোন ওয়াদা করে ফেললে তা পুরণ করা জরূরী হয়ে পড়ে, যদি কোন অবৈধ বিষয়ের ওয়াদা না হয়ে থাকে। ভুয়া প্রতিশ্রুতি শিশুর মধ্যে প্রতারণার মানসিকতা জন্মাতে পারে।

শিশুদের শাসন ও মনস্তত্ত্ব

* অনেক সময় নম্র কথায় এবং নম্র আচরণে শিশুর সংশোধন নাও হতে পারে। এরূপ মুহূর্তে কঠোরতা অবলম্বন ও শাসনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রয়োজনের মুহূর্তে কঠোরতা অবলম্বন পূর্বক শাসন না করা খেয়ানত। কেননা এতে করে শিশুরা আদর্শচ্যুত হয়ে যায়।

শাসন ও শাস্তি প্রদানের কয়েকটা পদ্ধতি হতে পরে। যথা:

(১) তিরস্কার করা (২) ধমক দেয়া (৩) কড়া কথা বলা (৪) হাত বা লাঠি দ্বারা মারা (৫) আটক করে রাখা (৬) কান ধরে উঠা-বসা করানো (৭) ছুটি বন্ধ করে দেয়া। এই শেষোক্ত শাস্তিই সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি। শিশুদের মনে এর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। (তারবিয়াতে আওলাদ)

* মারধর অতিরিক্ত করা হলে, উঠতে বসতে লাথি জুতা করতে থাকলে শিশুরা নির্লজ্জ হয়ে যায় এবং মারের ভয় তাদের অন্তর থেকে উঠে যায়। তারপর তাকে শাসন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই মারধর-এর ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা অন্যায়। ফোকাহায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে বলেছেন, যে মারপিট দ্বারা হাত-পা ভেঙ্গে যায়, চামড়া ফেটে যায় বা চামড়ায় দাগ পড়ে যায়-সেরূপ মারপিট করা নিষিদ্ধ। এরূপ মারধর যে পিতা বা যে উস্তাদ করবে সে শাস্তির যোগ্য। (তারবিয়াতে আওলাদ-রদ্দুল মুহতার) মনে রাখতে হবে-অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করা যুলুম।

* মারধর-এর ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা থেকে বাঁচার উপায় হল-রাগ এর মুহূর্তে মারধর না করা। কেননা রাগের মুহূর্তে ব্যালেন্স ঠিক থাকে না। রাগ ঠাণ্ডা হওয়ার পর কতটুকু অন্যায় এবং তার জন্য কতটুকু কিভাবে শাস্তি দেয়াটা উপযোগী তা চিন্তা-ভাবনা করে শাস্তি দিতে হবে। হাদীছেও রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করতে নিষেধ করা হয়েছে। ব্যালেন্স হারিয়ে অতিরিক্ত মারধর করা হলে শিশুরা এটাকে যুলুম ভেবে সে জেদী হয়ে পড়তে পারে, শিক্ষকের প্রতি তার ঘৃণা জাগতে পারে।

* কখনও অতিরিক্ত শাস্তি দেয়া হয়ে গেলে শাস্তি দেয়ার পর তাকে

আদর সোহাগ করে, অনুগ্রহ করে খুশী করে দিবে। তাহলে তার জিদ দূর হবে।

* বকাবকি ও ভর্ৎসনা করার ক্ষেত্রেও সীমা অতিক্রম করবে না, লাগামহীনভাবে মুখে যা আসে বলবে না বরং পূর্বে চিন্তা করে নিবে কি কি শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন।

সন্তানকে সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনদার বানানোর মনস্তাত্তিক পদ্ধতি

* একটা সু-সন্তান লাভ করার জন্য এবং সন্তানকে সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনদার বানানোর জন্য মাতা-পিতার অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। সন্তানের জন্মের পুর্বে থেকেই শুরু করতে হবে সন্তানকে ভাল বানানোর ফিকির ও প্রচেষ্টা। আর সেই ফিকির ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত। এই ফিকির ও প্রচেষ্টার একটা মোটামুটি রূপরেখা নিম্নে প্রদান করা হল:

* একটা সু-সন্তান পেতে হলে একটা সৎ ও ভাল নারীকে বিবাহ করতে হবে। ভাল নারীর গর্ভেই ভাল সন্তানের আশা বেশী করা যায়। কেননা, সন্তান গর্ভে আসার পর থেকেই মায়ের চিন্তা-ভাবনা, মায়ের মন-মানসিকতা ও মায়ের আচার-আচরণ সবকিছুর প্রভাব পড়ে থাকে গর্ভস্থ সন্তানের উপর। তাই সন্তান গর্ভে আসার পর সব কু-চিন্তা ও পাপের চিন্তা পরিহার করতে হবে এবং নেক চিন্তা ও ভাল চিন্তা-ভাবনা রাখতে হবে, তাহলে সন্তানের উপর তার সুপ্রভাব পড়বে।

* সন্তান জন্ম নেয়ার পর তাকে গোসল দিয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে তার ডান কানে আযানের শব্দগুলো এবং বাম কানে ইকামতের শব্দগুলো শুনাবে। এতে করে শুরু থেকেই তার মনে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের নাম ও কালিমা ইবাদতের সুপ্রভাব পড়বে। যদিও সে তখন আযান ইকামতের মর্ম বুঝতে সক্ষম নয় তবুও তার সুপ্রভাব পড়বে।

* অতঃপর কোন দ্বীনদার বুযুর্গ দ্বারা খেজুর বা কোন মিষ্টান্ন দ্রব্য চিবিয়ে তার সামান্যটা নব জাতকের তালুতে লাগিয়ে দিবে। এটা করা সুন্নাত। এতে করে বুযুর্গের মুখের লালার মাধ্যমে বুযুর্গির সুপ্রভাব নব জাতকের মধ্যে প্রবেশ করবে।

* শিশুর একটা সুন্দর নাম রাখবে। কেননা, সুন্দর নামের সুপ্রভাব

তার জীবনে কার্যকরী হবে।

* শিশুকে মা ব্যতীত অন্য কোন দুধ মাতার দুধ পান করালে দ্বীনদার পরহেযগার ও সুস্বভাবের অধিকারীনী মহিলার দুধ পান করাবে। কেননা, দুধের মাধ্যমে দুধ দাত্রীর স্বভাব, চরিত্র ও মন-মাসিকতার প্রভাব ছড়িয়ে থাকে।

* শিশুর মন-মানসিকতা ও মেজায প্রকৃতি যেন ভাল হয়ে গড়ে ওঠে তার জন্য পূর্বে "শিশুর মানসিক পরিচর্যায় মনোবিজ্ঞান" শীর্ষক পরিচ্ছেদে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর উপর আমল করতে হবে।

* শিশুকে সুশিক্ষা প্রদান করতে হবে। এর জন্য পূর্বে সন্তান ও শিশুর শিক্ষা বিষয়ক যে নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে তার উপর আমল করতে হবে।

* শিশুকে প্রয়োজনে শাসন করতে হলে শাসন করার সুষ্ঠু পদ্ধতি ও নীতি অনুযায়ী শাসন করতে হবে।

* কিছুটা বুঝ হওয়ার পর থেকেই প্রত্যেকটা পদে পদে ধীরে ধীরে শিশুকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে থাকতে হবে এবং অন্যায় ত্রুটি হলে সংশোধন করে দিতে হবে। প্রয়োজনে তাম্বীহ ও মুনাছেব শাস্তিও দিতে হবে।

* সাত বৎসর বয়স থেকেই শিশুকে নামাযের হুকুম দিবে এবং পুরুষ ছেলে হলে জামাআতের সাথে নামায পড়তে অভ্যস্ত করাবে। দশ বৎসর বয়স হলে প্রয়োজনে মারপিট করে হলেও নামায পড়াতে হবে।

* শিশুদেরকে রোযা রাখানোর ক্ষেত্রে সাত বৎসরের কোন সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি, সে যখন যে কয়টা রোযা রাখতে সক্ষম হবে তখন তার দ্বারা তা রাখাতে হবে। শিশুর নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত ও আখলাক চরিত্র গঠনের ব্যাপারে জননীকেই বেশী খেয়াল রাখতে হবে। কেননা, তার কাছেই সন্তানরা বেশী সময় কাটায়।

* প্রতিদিন ঘরে একটা নির্ধারিত সময়ে দ্বীনী কথা-বার্তা আলোচনার বা দ্বীনী কিতাব তা'লীমের সিলসিলা জারী রাখতে হবে। এতে সন্তানদের সাথে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও উপকার হতে থাকবে। রাতে শুতে যাওয়ার পূর্বে এর জন্য সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে, তখন সকলের সময় অবসর থাকে। প্রথম দিকে সকলে তা'লীম শুনতে না চাইলেও তা'লীম করে যেতে হবে, আস্তে আস্তে সকলে শুনতে অভ্যস্তও হবে এবং

আছরও হতে থাকবে। অন্ততঃ শিশুদের এতটুকু উপকারিতাতো হবেই যে, তারা দ্বীনী তা'লীম ও দ্বীনী আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শিখবে।

* শুরু থেকেই সতর্ক থাকতে হবে, যেন খারাপ সাথীদের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক গড়ে উঠতে না পারে। অধিকাংশ কুসংসর্গ থেকেই সন্তানরা কু-পথে ধাবিত হয়।

* সন্তানদেরকে মুসলমানদের সাথে বিশেষভাবে গরীব সৎ মুসলমানের সাথে উঠা-বসা করতে অভ্যস্ত করাবে।

* সন্তানকে মাঝে মধ্যে দুই চার দিনের জন্য নেককার বুযুর্গদের সোহবতে থাকার ব্যবস্থা করবে। আর ছুটির সময় পুরো ছুটি না হলেও অন্ততঃ তার অর্ধেক বা একটা অংশ এ কাজের মধ্যে তাকে নিয়োজিত রাখবে। সাহচর্য মানসিকতা গঠনে অত্যন্ত ফলদায়ক।

* সন্তানকে অভ্যস্ত করাবে তারা যেন কোন কাজ গোপনে না করে। কেননা, গোপনে সে এমন কাজই করবে যেটাকে অন্যায় বলে মনে করে। এভাবে গোপনে কাজ করতে অভ্যস্ত হওয়ার অর্থ অন্যায় কাজে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া।

* সন্তানকে শরীআতের বরখেলাফ লেবাস-পোষাক পরিধান করতে দিবে না। শরীআতের বরখেলাফ কোন কাজ করতে দিবে না।

* সন্তানকে যৌন বিষয়ক ও প্রেম প্রীতি বিষয়ক বই পত্র ও নভেল নাটক পড়তে বা দেখতে দিবে না।

* মনে রাখতে হবে-সন্তানের প্রথম বয়সই তার এসলাহ বা সংশোধনের উপযুক্ত সময়। প্রথমে নষ্ট হয়ে গেলে পরে তা এসলাহ অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে অবুঝ সন্তান বলে অবহেলা করে ছেড়ে দিলে পরবর্তীতে অনুতপ্ত হতে হয়।

* সন্তানের সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রথম সন্তানকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। কেননা পরবর্তী সন্তানরা প্রায়শঃই প্রথম জনের অনুকরণ করে থাকে। (তারবিয়াতে আওলাদ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

কোন ক্রমেই শিশুকে সু-পথে আনতে না পারলে তখন কি করণীয়

সন্তানকে সুপথে আনার চেষ্টা করা মানুষের আয়ত্তের মধ্যে, কিন্তু সে চেষ্টার ফলাফল মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। অনেক সময় হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও সন্তান সু-পথে না আসতে পারে এবং তার কারণে মাতা-পিতার

পেরেশানীর অন্ত না থাকতে পারে। এরূপ মুহূর্তে পিতা-মাতার করণীয় হল:

(১) চেষ্টা অব্যাহত রাখবে, কিন্তু ফলাফল লাভের অপেক্ষায় থাকবে না। অর্থাৎ, তারা যেমন চায় সন্তান তেমনই হয়ে যাবে-এই অপেক্ষায় থাকবে না, মনে করবে যে, ফলাফল আমার হাতে নয় বরং আল্লাহর হাতে। আমার চেষ্টা করার সাধ্য ছিল করেছি বাকীটুকুর জন্য আমি দায়ী নই। তাহলে পেরেশানী কমে যাবে।

(২) সন্তান সু-পথে আসছে না এ জন্য স্বভাবত যে কষ্ট ও দুঃখ হবে তার কারণে ছওয়াব হবে-এই বিশ্বাস রাখবে, তাহলেও মনে একটা তৃপ্তি পাওয়া যাবে মনে করবে যে, এভাবেও হয়ত আল্লাহ তা'আলা আমার গোনাহ মোচন ও ছওয়াব লাভের সুযোগ করে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করছেন।
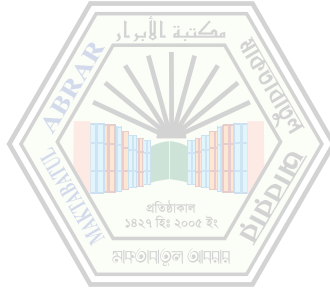
অষ্টম অধ্যায়
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান
(Clinical Psychology)

শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসায় মনোবিজ্ঞান

কেউ শারীরিক রোগে আক্রান্ত হলে কম বেশী মানসিক সমস্যাও তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশেষভাবে শারীরিক রোগটা যদি মাত্রায় বেশী বা দুরারোগ্য পর্যায়ের হয়, তাহলে মানসিক সমস্যাও বেশী দেখা দেয়। দৈহিক ব্যাধির কারণে সৃষ্ট এ সব মানসিক সমস্যার চিকিৎসা না করা হলে দৈহিক ব্যাধি তীব্রতর ও দীর্ঘায়িত হতে পারে। সাধারণভাবে দৈহিক ব্যাধির কারণে সৃষ্ট যেসব মানসিক সমস্যায় রোগী আক্রান্ত হয়ে থাকে সেগুলো কি এবং মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে তার প্রতিকার কি নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

১. দুশ্চিন্তা (Anxiety)"

কেউ শারীরিক রোগে আক্রান্ত হলে বিভিন্ন কারণে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে পারে। এ রোগের কারণে ব্যথা, যন্ত্রণা, কষ্ট প্রভৃতি অনেক অসুবিধার সম্মুখীন তাকে হতে হবে, এ রোগে তার মৃত্যুও হতে পারে; আর মৃত্যু হলে সব কিছু তাকে হারাতে হবে। এ রোগে সে দূর্বল হয়ে গেলে বা নিজের সাধ্যাতীত চিকিৎসা ব্যয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সে আপনজন ও আত্মীয় স্বজনের কাছে বোঝা হওয়ার বা তাদের অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ানোর কথা ভেবেও সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। আরও আগে বেড়ে এরূপ দুশ্চিন্তাও রোগীর মনে আসতে পারে যে, এ রোগে তার মৃত্যু হলে তার উপর নির্ভরশীল ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী প্রমুখ পরিবার সদস্যদের জীবিকা ইত্যাদির কি অবস্থা হবে? রোগীর মনে সৃষ্ট এসব দুশ্চিন্তা তথা মানসিক ব্যাধির মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা হল:

(এক) রোগকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করবে, কেননা আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তাকেই কোন বিপদ দিয়ে থাকেন। রোগের মাধ্যমে তার গোনাহ মোচন হবে, দরজা বুলন্দ হবে-রোগকে যদি এ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হয় তাহলে এর কারণে যে কষ্ট যন্ত্রণা ইত্যাদি সহ্য করতে হবে তার জন্য আর দুশ্চিন্তা আসবে না, মনোকষ্ট বোধ হবে না।

রাসূল (সা.) বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে (রোগ শোক ইত্যাদি দিয়ে) পরীক্ষা করেন। (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

রাসূল (সা.) আরও বলেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى مِّنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ، اِلَّا حَطَّ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ سَيِّئَاتِهٖ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.
(متفق عليه)

অর্থাৎ, কোন মুসলমানের রোগ ইত্যাদি কোন কষ্ট হলে তার কারণে আল্লাহ তা'আলা তার পাপরাশি ঝরিয়ে দেন, যেমন বৃক্ষ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়। (বোখারী ও মুসলিম)

এ হাদীছের মর্ম স্মরণ করলে রোগ ব্যাধির কারণে সৃষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করা সহজ হবে, এ কারণে দুশ্চিন্তা দেখা দিবে না। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, রোগ ব্যাধিকে যদি আল্লাহ্র নেয়ামত হিসেবেই মূল্যায়ন করতে হবে তাহলে রোগ মুক্তির জন্য চিকিৎসা বা দু'আ করার বিধান কেন রাখা হয়েছে? এর উত্তর হল-রোগ মুক্তি এবং সুস্থ থাকাও আল্লাহ্র একটি নেয়ামত এবং দুর্বল বান্দার পক্ষে এই প্রকারের নেয়ামতই আছান। এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই চিকিৎসা করাতে হবে এবং রোগ মুক্তির জন্য দু'আ করতে হবে।

(দুই) মৃত্যুকে খারাপ মনে না করা বরং ভাল মনে করা। কেননা, মৃত্যু দ্বারা পাপ থেকে রক্ষা ও পৃথিবীর কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। দুনিয়ার কষ্ট ক্লেশ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং মৃত ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র প্রেমিক হয়ে থাকে তাহলে এই মৃত্যুই তার প্রেমাস্পদ-আল্লাহ্র নিকট তার দ্রুত পৌঁছে যাওয়ার এবং দ্রুত জান্নাতে পৌঁছে যাওয়ার মাধ্যম। এই দৃষ্টিভ-ঙ্গিতে মৃত্যুকে মূল্যায়ন করলে রোগের অবস্থায় মৃত্যুর আশংকায় সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না। মৃত্যুকে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন,

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ (مسلم)

অর্থাৎ, দুনিয়া হল মু'মিনের জন্য কারাগার (স্বরূপ)।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

اَلْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَاَذَاهَا اِلٰى رَحْمَةِ اللّٰهِ … (متفق عليه)

অর্থাৎ, মু‘মিন বান্দা (মৃত্যুর দ্বারা) দুনিয়ার কষ্ট ক্লেশ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আল্লাহ্‌র রহমতের দিকে উপনীত হয়। (বোখারী ও মুসলিম)

অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ. (مشكاة عن البيهقى)

অর্থাৎ, মৃত্যু হল মু‘মিনের জন্য এক তোহ্‌ফা। (মেশকাত)

বস্তুত মৃত্যু মু‘মিনের নিকট সবকিছু হারানোর বিভীষিকা নয় বরং সবকিছু পাওয়ার উন্মুক্ত দুয়ার।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে, মু‘মিনের জন্য মৃত্যু খারাপ নয় বরং ভাল। তবে মৃত্যু ভাল বলে তা কামনা করা যাবে না। মৃত্যু কামনা করা নিষেধ এবং তা এ কারণে নিষেধ যে, সে নেককার হলে মৃত্যুর মাধ্যমে তার নেক কাজ-এর ধারা বন্ধ হয়ে যাবে, বরং বেঁচে থাকলে সে আরও নেক কাজের সুযোগ পাবে। আর পাপী হলে তার পাপ মোচনের ভবিষ্যত সুযোগও বন্ধ হয়ে যাবে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

لَا يَتَمَنّٰى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهٗ اَنْ يَّزْدَادَ خَيْرًا وَاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهٗ اَنْ يَسْتَعْتِبَ. (مشكاة عن البخارى)

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, সে নেককার হলে আশা করা যায় সে আরও বেশী ভাল কাজ করতে পারবে। আর বদকার হলে আশা করা যায় সামনে তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তালাশ করতে পারবে। (মেশকাত)

কেউ যদি পাপী হয়, তাহলে মৃত্যুর পর তার শাস্তি শুরু হয়ে যেতে পারে এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যেতে পারে। এরূপ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে মৃত্যুকে ভাল মনে করার দ্বারা সে তার দুশ্চিন্তা দূর করতে পারবে না বরং সে শাস্তির ভয়ে আরও বেশী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং পাপ কম বেশী সকল মানুষেরই থাকে। তাই সকল রোগীর জন্যই বিশেষভাবে গোনাহ থেকে তওবা করার বিধান রাখা হয়েছে এবং মুমূর্ষ ব্যক্তির জন্য নিয়ম রাখা হয়েছে সে তার জীবনের ভাল-মন্দ কার্যাবলী

সম্পর্কে মনে মনে হিসাব নিকাশ ও পর্যালোচনা করবে না। কেননা এতে মন্দের পরিমাণের আধিক্য দেখে আল্লাহ্‌র রহমত পাওয়ার আশা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে এবং মানসিকভাবে আরও ভেঙ্গে পড়তে পারে। যারা মুমূর্ষ রোগীর নিকট উপস্থিত থাকবে তাদেরও কর্তব্য রোগীকে আল্লাহ্‌র রহমত লাভের সুসংবাদ প্রদান করা এবং তার জীবনের ভাল কাজগুলোর কথা তার সামনে উল্লেখ করা, যাতে করে তার মনে আল্লাহর রহমত লাভের আশা প্রবল হয়। বোখারী শরীফের রেওয়ায়েতে এসেছে- হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর প্রাক্কালে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর পেরেশানী লাঘব করার জন্য তার জীবনের সুকীর্তিগুলো তাঁর সামনে তুলে ধরেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর ইন্তেকালের সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে এসেছে-হযরত আম্‌র ইবনুল আস (রা.) মুমূর্ষ অবস্থায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে তদীয় পুত্র তাঁর প্রশংসা সূচক বাক্য দ্বারা তাঁকে দুশ্চিন্তা মুক্ত করেন।

এরপরও রোগীর মনে মৃত্যুর এবং রোগ থেকে মুক্তি লাভ না করার দুশ্চিন্তা এসে যাওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে সে সম্ভাবনাকে হ্রাস করার নিমিত্তে রোগী শুশ্রুষাকারীদের জন্য সুন্নাত তরীকা রাখা হয়েছে-তারা রোগী অচিরেই রোগ মুক্ত হয়ে যাবে, সে দীর্ঘজীবি হবে ইত্যাদি আশা ব্যঞ্জক কথা রোগীকে শোনাবে; কোন হতাশা ব্যঞ্জক কথা তাকে শোনাবে না। এরূপ ক্ষেত্রের জন্য হাদীছে নিম্নোক্ত বাক্য বলে রোগীকে সান্ত্বনা দিতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে−

لَابَاسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ চাহেতো অচিরেই পবিত্রতা (সুস্থতা) লাভ হবে।

রোগীর মনে আশার সঞ্চার করতে পারা এবং রোগীর মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারা তার রোগ মুক্তির জন্য দৈহিক আনুকূল্য সৃষ্টিরও সহায়ক।

(তিন) রোগ শুশ্রুষাকারীগণ হাসি মুখে থাকবে। আপনজন, আত্মীয়- স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব যারা রোগীর সেবায় থাকবে বা রোগী দেখতে যাবে তারা হাসি মুখে থাকবে, চেহারা মলিন করবে না, ছেঁড়া-ফাটা ও নোংরা পোষাক পরিধান করে শুশ্রুষা করতে যাবে না বরং স্বাভাবিক

পরিস্কার পোষাক পরিধান করে যাবে। এগুলো রোগী শুশ্রূষার সুন্নাত ও আদবের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো রোগীর মানসিক ব্যাধির প্রতিষেধক। কেননা চেহারা মলিন দেখলে রোগী সন্দেহ করতে পারে যে, আমার কারণে তারা বিরক্ত হয়ে উঠেছে! আমি তাদের জন্য বোঝা হয়ে গিয়েছি! কিম্বা আমার রোগ খারাপ পর্যায়ে গিয়েছে তা জানতে পেরেই কি ওরা এমন বিমর্ষ হয়ে পড়েছে? এভাবে রোগী আরও বেশী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। আবার খুব বেশী জাঁক-জমকের পোষাক পরিচ্ছদ নিয়েও শুশ্রূষা করতে যাওয়া ঠিক নয়। কেননা, তাতে রোগী তার প্রতি সমবেদনা বোধের অভাব রয়েছে বলে সন্দেহ করতে পারে।

(চার) حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ এর আমল করা। রোগাক্রান্ত অবস্থায় মৃত্যুর আশংকা এবং মৃত্যু পরবর্তী অসহায় স্ত্রী পুত্র পরিজনের ভবিষ্যৎ জীবন জীবিকার দুশ্চিন্তাও এসে থাকে। সন্তানাদী স্বাবলম্বী হয়ে গেলে বা তাদের জন্য উপযুক্ত অভিভাবকত্ব করার মত লোক থাকলে এ দুশ্চিন্তার মাত্রা কম হয়ে থাকে। তাহলে দেখা গেল উত্তম অভিভাবক থাকার চিন্তা রোগীর মন থেকে এরূপ দুশ্চিন্তা হ্রাস করতে পারে। বস্তুতঃ সব চেয়ে উত্তম অভিভাবক হলেন আল্লাহ তা'আলা। তাই কারও মনে তার অনুপস্থিতিতে অসহায় স্ত্রী পুত্র পরিজনের ভবিষ্যৎ জীবন জীবিকা নিয়ে দুশ্চিন্তা দেখা দিলে সে যদি নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে বা তার অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে তার দুশ্চিন্তা লাঘব হবে। দু'আটি এই–

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট। কত উত্তম তত্ত্বাবধায়ক তিনি!

২. একাকিত্ব (Loneliness)

অসুস্থ অবস্থায় মানুষ যখন স্বাভাবিক কাজকর্ম, স্বাভাবিক যোগাযোগ ও গমনাগমনে অক্ষম হয়ে পড়ে, মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক মেলামেশা ও দেখাশোনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন একাকিত্বের জড়তা তাকে পেয়ে বসে কিম্বা সংসারে সে নিজেকে অপাংক্তেয় ভাবতে শুরু করতে পারে। এরূপ মানসিক দুরাবস্থা দূর হবে। রোগী শুশ্রূষার সুন্নাত পালনের মাধ্যমে। শুশ্রূষা- কারী আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনের আগমনে এক দিকে যেমন একাকিত্বের স্থবিরতা কেটে উঠবে, সকলের কাছে তার গুরুত্ব ফুটে উঠার মাধ্যমে নিজেকে অপাংক্তেয় ভাবার

সংকোচন দূরীভূত হবে, অপরদিকে শুশ্রুষাকারীদের সমবেদনা প্রকাশের দ্বারা রোগীর মনে আশার সঞ্চার হবে এবং এটা আস্তে আস্তে রোগীর মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

রোগী শুশ্রুষার মধ্যে রোগীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশের একটা দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয় রয়েছে। তাই রোগী শুশ্রুষার সুন্নাত ও আদবের মধ্যে রয়েছে রোগীর দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে না তাকানো বরং কোমল দৃষ্টিতে তাকানো এবং রোগীর কপালে বা হাতে হাত রেখে জিজ্ঞেস করা যে, সে কেমন আছে? ইত্যাদি। (আহকামে যিন্দেগী থেকে গৃহীত)

৩. ক্রোধ (Anger)

কেউ রোগে আক্রান্ত হলে বিশেষত দীর্ঘদিন রোগে ভুগতে থাকলে তার মেজায খিটখিটে হয়ে যায়। বিভিন্ন কারণে তখন সে অন্যের উপর ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে। যত্ন সেবাকারী, চিকিৎসক, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে এমনকি খাদ্য খাবারের প্রতিও সে রাগান্বিত হয়। কাউকে কাউকে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গেও রাগান্বিত হতে দেখা যায়।

এ রোগের চিকিৎসা হল:

(এক) রোগাক্রান্ত অবস্থার সুন্নাত ও আদবের তালিকার মধ্যে রাখা হয়েছে-যত্ন সেবাকারী ও আপনজনদের প্রতি বা খাদ্য খাবারের প্রতি রাগান্বিত না হওয়া। এটা সুন্নাত হওয়ার কারণে তার প্রতি রোগীর আমলের আগ্রহ রোগীর ক্রোধ না জন্মানো বা প্রশমিত করার ব্যাপারে সহায়ক হবে।

(দুই) রোগীর যত্ন সেবাকারী ও আপনজন হাসি মুখে প্রফুল্ল চিত্তে রোগীর সেবায় নিয়োজিত থাকলে এবং সমবেদনার মন নিয়ে তার পাশে থাকলে এটিও রোগীর ক্রোধ না জন্মানো বা জন্মালেও তা সহজে হ্রাস করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় মনোবিজ্ঞান

মানুষের যে সব মানসিক সমস্যা দেখা দেয়, সে সমস্যাগুলো জটিলতর হলেই তাকে মানসিক ব্যাধি বলে আখ্যায়িত করা হয়। এসব সমস্যা মনস্তাত্ত্বিকভাবেই দূর করা যায়। দূর করতে পারলে মানুষের জীবন সুন্দর থেকে সুন্দরতর হতে পারে। অপর পক্ষ এসব সমস্যা দূর করতে না পারলে তা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে এক সময় মানসিক বৈকল্য দেখা

দিতে পারে, মানুষ মানসিক ভারসাম্যতা হারিয়ে বসতে পারে। কোন কোন মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা না হলে রোগীর মনে আত্মহত্যার প্রবণতা পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। মানসিক কারণে ক্ষুধার অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে। কেউ কেউ ক্ষুধাহীনতার জন্য শীর্ণকায়, আবার কেউ কেউ ক্ষুধার আধিক্যের জন্য স্থুলকায় হয়ে পড়তে পারে। এভাবে মানসিক ব্যাধির কারণে দৈহিক জটিলতা এমনকি বিভিন্ন দৈহিক ব্যাধিতেও আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। নিম্নে বিশেষ কয়েকটি মানসিক ব্যাধি ও তার মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার কথা উল্লেখ করা হল।

১. হতাশা (Frustration)

মানুষ যা কিছু চায়, তার সবটাই সব সময় পূর্ণ হয় না। চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে অনেক বাধা এসে থাকে। এই চাওয়া বা প্রেষণা চরিতার্থ না হলে মনে যে উদ্যমহীনতা দেখা দেয়, আবেগ অনুভূতি ও কর্মস্পৃহার মধ্যে যে শৈথিল্য ভাব আসে তাকেই বলে হতাশা। হতাশার ফলে মানুষ মনের মধ্যে এক বেদনাদায়ক চাপ অনুভব করে, সে কাজের উদ্যম ও স্পৃহা হারিয়ে বসে, কাজে সন্দেহ প্রবণতা ও একাকিত্ব অনুভব করতে থাকে, যা তার উন্নতি ও অগ্রগতিকে ব্যাহত করে।

হতাশার প্রতিকার প্রধানত দুটি–

(এক) আল্লাহ্র রহমতের ব্যাপকতায় বিশ্বাস এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَ لَا تَايْـئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَايْـئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْـكٰـفِـرُوْنَ.

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে হতাশ হয়োনা। আল্লাহ্র রহমত থেকে তো কাফেররাই হতাশ হয়ে থাকে। (সূরা ইউসুফ : ৮৭)

অর্থাৎ, একজন মু'মিন যে আল্লাহ্র রহমত বা করুণা গুণে বিশ্বাস করে, সে জানে যে, আল্লাহ্ তা'আলার করুণা অনেক ব্যাপক। অতএব আজ আল্লাহ্র কল্যাণ বিবেচনায় আমার কোন চাওয়া পাওয়া পূর্ণ না হলেও ভবিষ্যতে যে কোন সময় পূর্ণ হতে পারে। আর কখনই আমার চাওয়া পাওয়া পূর্ণ হবে না, কখনই আল্লাহ্ আমার প্রতি করুণা করবেন না-এমন বিশ্বাস একজন মু'মিন করতে পারে না। অতএব হতাশাও কখনও তাকে স্থবির করতে পারে না। কখনও হতাশা তার মনে প্রবেশ করতে চাইলে

আল্লাহ্‌র করুণা গুণের কথা স্মরণ করে সে তাকে বিতাড়িত করে দিতে সক্ষম হবে।

(দুই) তাকদীরে বিশ্বাস হতাশা দূরীভূত করে থাকে। তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ হল আল্লাহ্ তা'আলা ভূত ভবিষ্যৎ-এর সব বিষয় নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং যা কিছু হয় সব মানুষের কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। অতএব তাকদীরে বিশ্বাসী ব্যক্তি তার কোন চাওয়া পাওয়া পূর্ণ না হলেও সে হতোদ্যম হবে না এই ভেবে যে, ভবিষ্যতেও যা কিছু হবে তা তার কল্যাণের জন্যই হবে এবং অতীতেও যা হয়েছে তার মধ্যে কোন না কোন ভাবে তার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর চেষ্টা করলেও ভবিষ্যতে হবে না এরূপ নিশ্চয়তা সে কিভাবে বোধ করতে পারে? ভবিষ্যততো আল্লাহ্ই অবগত আছেন।

২. বিষাদোন্মত্ততা (Depression)

ইষ্টহানী জনিত মনোভাব বা কাম্য ও প্রার্থিত বুস্তু না পেলে যে মনবেদনা বোধ হয়, তাকে বলে বিষাদ। মানুষের জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে কম বেশী বিষাদবোধ বা দুঃখ এসে থাকে। যে কারণে বিষাদবোধ সৃষ্টি হয় সে কারণ দুরীভূত হলে বা একটা নির্দিষ্ট সময়/কাল অতিবাহিত হলে বিষাদবোধ চলে যায়। কিন্তু যখন বিষাদ বিনা কারণে বা সামান্য কারণে আসে এবং তার তীব্রতা হয় প্রচন্ড কিম্বা যখন বিষাদ দীর্ঘস্থায়ী হয় তখন তাকে বিষাদোন্মত্ততা রোগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে রোগী অনেক কিছু সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। রোগীর মধ্যে নিদ্রাহীনতা, ক্ষুধাবোধহীনতা, নিজেকে অযোগ্য ভাবা প্রভৃতি বহু নেতিবাচকতা দেখা দিয়ে থাকে।

কোন কাম্য বস্তু অর্জিত না হলে যে মনোকষ্ট বা বিষাদ বোধ সৃষ্টি হয় তা দূর করার উপায় হল ঐ আয়াতের মর্ম স্মরণ করা, যে আয়াতে বলা হয়েছে,

وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّـكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, হতে পারে কোন কিছুকে তোমরা মনে প্রাণে কামনা করবে (ভালবাসবে), অথচ তা তোমাদের জন্য মন্দ। বস্তুত আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

কেউ যখন ভাববে যে, আমার এ কাম্য বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে হয়ত আমার জন্য কল্যাণকর নয়। আর আল্লাহ যেহেতু সকলের কল্যাণ চান

এবং তিনি জানেন যে, এটা আমার জন্য কল্যাণকর নয়, তাই তাঁর কল্যাণ বিবেচনায় এটা অর্জিত না হওয়াই আমার জন্য ভাল, ফলে এটা অর্জিত হয়নি, তাহলে এরূপ ভাবনা তার মন থেকে বিষাদবোধকে সহজেই মিটিয়ে দিবে।

৩. শোক (Bereavement)

প্রিয় ব্যক্তি বা বস্তু প্রভৃতি হারানোর ফলে যে মানসিক যন্ত্রণা দেখা দেয় তাকে বলে শোক। বিশেষভাবে প্রিয়জন হারানোর ফলেই তীব্র শোক দেখা দিয়ে থাকে। অবশ্য কখনও কখনও পোষ্য জন্তু, প্রিয়বস্তু, মান-মর্যাদা প্রভৃতি হারানোর ফলেও শোক জন্মাতে পারে। শোকার্ত ব্যক্তির শোকবোধ উপশম করতে না পারলে তার মধ্যে নানা রকম দৈহিক ও মানসিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

শোক-এর মনঃস্তত্ত্ব মূলক চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে-

(এক) শোকার্তকে সমর্থন দান করা, তাকে সান্ত্বনা জানানো। ইসলাম মৃতের পরিবারকে তা'যিয়াত বা সান্ত্বনা জানানোকে মুস্তাহাব করেছে।

(দুই) দৈনন্দিন সমস্যা দূর করতে শোকার্তের সাহায্য করা। এ প্রেক্ষিতেই প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের জন্য মুস্তাহাব করা হয়েছে মৃতের পরিবারের জন্য এক দিনের খাবার তৈরী করে পাঠানো এবং দুঃখের কারণে তারা খেতে না চাইলে পীড়াপীড়ি করে খাওয়ানো। এভাবে সবচেয়ে শোকার্ত দিনের সমস্যা দূর করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

(তিন) প্রিয় ব্যক্তি বা প্রিয় বস্তু হারানোর ফলে যে ছওয়াব বা পার্থিব যে লাভের দিক রয়েছে তা স্মরণ করা। শোকার্ত ব্যক্তি নিজেও এটা স্মরণ করবে এবং তা'যিয়াতকারীগণ (সান্ত্বনা প্রদানকারীগণও) এ কথা শোকার্তকে স্মরণ করিয়ে দিবে। এ জন্যেই তা'যিয়াতের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত রাখাকে বিধিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে-

(ক) সান্ত্বনা বাণী।

(খ) সবর ও ধৈর্যের ফযীলত বর্ণনা এবং ধৈর্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান।

(গ) আপনজনের মৃত্যুজনিত কষ্টের জন্য তাদের ছওয়াব লাভের উল্লেখ।

প্রিয়জন হারালে এবং সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করলে বহুরকম ছওয়াব লাভের কথা রয়েছে। যেমন নাবালেগ সন্তানের মৃত্যু হলে সে সন্তান পরকালে তার নাজাতের ওছীলা হয়ে দাঁড়াবে বলে হাদীছে উল্লেখ এসেছে। এক হাদীছের বর্ণনা থেকে বালেগ সন্তানের মৃত্যু হলেও সে কারণে যে কষ্ট হবে তার বিনিময়ে আল্লাহ্ জান্নাত দান করবেন বলে জানা যায়। আর আপনজনের মৃত্যু হলে পার্থিব লাভের দিকের কথাও চিন্তা করে মনে সান্ত্বনা লাভ করা যেতে পারে। যেমন সন্তান মারা গেলে এ কথা চিন্তা করা যায় যে, এই সন্তানের কারণে মানুষ কত রকম পেরেশানী ও মুসীবতের সম্মুখীন হয়ে থাকে, আল্লাহ তা'আলা হয়ত সে সব পেরেশানী থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যেই আমার সন্তানের মৃত্যু ঘটিয়েছেন। কাজেই এটা আমার প্রতি আল্লাহর এক প্রকারের অনুগ্রহ।

৪. আত্মহত্যার প্রবণতা (Suicidal tendency)

বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক কারণে আত্মহত্যার মনোভাব জাগ্রত হতে পারে। তন্মধ্যে ব্যর্থতা, বিষাদাধিক্য, শোকের তীব্রতা, দীর্ঘ রোগ ভোগান্তি, পারিবারিক কলহ প্রভৃতি হল প্রধানতম কারণ। যে কারণে আত্মহত্যার মনোভাব সৃষ্টি হয় সে কারণের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকার গ্রহণ করার মাধ্যমেই আত্মহত্যার প্রবণতাকে প্রশমিত করা সম্ভব। সাধারণভাবে তাকদীরে বিশ্বাস এবং আল্লাহ্র ফয়সালায় সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে আত্মহত্যার মনোভাবকে দূর করা যায়। কেননা, কোন বিষয়ে দীর্ঘ চেষ্টা চরিত্র করেও মানুষ যখন সফলতা অর্জন করতে সক্ষম না হয়, তখন সে ব্যর্থতার জন্য নিজেকেই দায়ী করে এবং ভাবে যে, এ ব্যর্থ জীবন আর রাখব না। এরূপ মুহূর্তে যদি সে তাকদীরে বিশ্বাসের চেতনাকে জাগ্রত করে এবং ভাবে যে, আমি কোন বিষয়ের চেষ্টাই করতে পারি মাত্র, কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল তো আল্লাহ্রই হাতে এবং আমার চেষ্টার ফলাফল কি হবে তাতো আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বাহ্নেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। অতএব ফলাফল আমার ইচ্ছা মাফিক না হওয়াতে আমার কোন ব্যর্থতা নেই বরং সেটা আল্লাহ্রই ফয়সালা এবং আল্লাহ্র ফয়সালার মধ্যেই আমার কল্যাণ নিহিত। আমার সাধ্যমত আমি চেষ্টা করতে পেরেছি এটাই আমার সফলতা। অতএব আমি সফল, আমি ব্যর্থ নই। আমি যেটা চেয়েছিলাম হয়তো কোন না কোন ভাবে তা আমার জন্য অকল্যাণকর ছিল, যা আমার বোধগম্য না হলেও আল্লাহ তা ভালভাবে অবগত আছেন, তাই আমার সে চাওয়া পূর্ণ না

হওয়াইতো আমার জন্য ভাল হয়েছে। আমি তাই আনন্দিত। এটাতো আমার আনন্দেরই কারণ।

এভাবে তাকদীরে বিশ্বাসের চেতনাকে জাগ্রত করা এবং আল্লাহ্‌র ফয়সালায় রাজী খুশী বোধ করতে পারার মাধ্যমে আত্মহত্যার মনোভাবকে অবদমিত ও প্রশমিত করা সম্ভব।

৫. দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ (Anxiety)

দুশ্চিন্তায় কম বেশী সবাই ভোগেন। দুশ্চিন্তার কারণ যদি সুনির্দিষ্ট থাকে তাহলে সে কারণটি দূর করার মাধ্যমেই দুশ্চিন্তা রোগের চিকিৎসা করতে হবে। আর দুশ্চিন্তা যদি বিনা কারণে হয়, যেমন রোগী মনে করল যে, তার একটা ভয়ানক বিপর্যয় ঘটতে যাচ্ছে বা তার প্রিয়জন একটা আসন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে অথচ এই বিপর্যয় বা ক্ষতির কোন সুনির্দিষ্ট কারণ তার জানা নেই, তা সত্ত্বেও একটা অশুভ আশংকা তার চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কিম্বা দুশ্চিন্তার কারণটি খুবই সামান্য অথচ রোগী ভীষণভাবে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এরূপ ক্ষেত্রে রোগী যদি পাঠ করে–

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি খুবই উত্তম অভিভাবক।

তাহলে অর্থ বুঝে এই দু'আ পাঠ করলে বা এর অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাব-না করলে রোগীর অহেতুক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দূরীভূত হবে। কেননা সে ভাববে যে, আল্লাহ্‌ই উত্তম অভিভাবক; অতএব তিনি সম্ভাব্য সব ধরনের বিপর্যয় ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন।

৬. অহেতুক ভয় ভীতি (Phobia)

মানুষের চার পাশে এমন অনেক বস্তু বা প্রাণী রয়েছে যা মানুষকে ভীতিগ্রস্ত করে তুলতে পারে, এটা স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু এছাড়াও অহেতুক ভীতি রোগে অনেকে ভোগেন। অন্ধকারে পথ চলতে কাল্পনিক সব প্রাণীর আতংক জাগা, পানিতে ডুব দিতে কাল্পনিক কোন কিছু টেনে নিয়ে যাওয়ার আতংক বোধ করা তার উদাহরণ। অনেক সময় অবাস্তব রোগ ভীতিও অনেককে পেয়ে বসে। সে অহেতুক ভাবতে থাকে যে, কোন দুরারোগ্য ব্যাধি তাকে পেয়ে বসেছে।

অহেতুক আতঙ্ক রোগের চিকিৎসা হল-যে বস্তুতে রোগী ভয় পায় প্রথম দিকে অল্প অল্প করে রোগী সেটা করবে, পরে বেশী সময় ধরে সেটা করবে। আর অন্ধকারে একাকী চলার পথে আতঙ্ক বোধ হলে নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু স্মরণ করবে। যাতে প্রত্যেক মানুষের সাথে হেফাযত-কারী ফেরেশতা থাকার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সে ভাববে-আমিতো একা নই-আমার সঙ্গী রয়েছে, আমার সঙ্গেতো ফেরেশতা রয়েছে। আয়াতটি এই−

لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে, তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। (সূরা রা'দ : ১১)

এখানে একের পর এক প্রহরী বলে পর্যায়ক্রমে আগমনকারী রক্ষণা-বেক্ষণকারী ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে।

অবাস্তব রোগ ভীতি (Hypochondriasis) দেখা দিলে তা যদি অন্য কোন মানসিক রোগের উপসর্গ হিসেবে দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে প্রাথমিক রোগটির চিকিৎসা করতে হবে। যেমন বিষাদোন্মত্ততা থেকে এটা সৃষ্টি হয়ে থাকলে প্রথমে বিষাদোন্মত্ততা রোগের চিকিৎসা করে নিতে হবে। আর যদি প্রাথমিকভাবেই কোন হেতু ছাড়া এরূপ আতংক দেখা দেয়, তাহলে রোগীকে বোঝাতে হবে এবং রোগী নিজেও বুঝতে চেষ্টা করবে যে, অহেতুক এই দুশ্চিন্তা পরিহার করা উচিত এবং অহেতুক ডাক্তারী পরীক্ষা করা থেকে তার বিরত থাকা শ্রেয়। তার একথা ভেবে দেখা উচিৎ যে, তাকদীরে যদি এরূপ বিপর্যয় বা রোগ ব্যাধি লেখা থাকে, তাহলে এই আতংক আমাকে তা থেকে রক্ষা করতে পারবে না, আর তাকদীরে না থাকলে কোন ক্রমেই তা ঘটবে না। অতএব অহেতুক এই ভীতির কোনই অর্থ নেই। আমি এক অর্থহীন চিন্তায় লিপ্ত রয়েছি।

৭. সন্দেহ বা কু-ধারণা (Doubt or ill feelings)

সন্দেহ বা কু-ধারণা আক্রান্ত ব্যক্তির উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আচরণের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে। সন্দেহ মন্দ প্রবণতাকে উৎসাহিত এবং কাজকর্মকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে। কেউ যদি

আল্লাহ্র প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে যে, তিনি আমাকে শাস্তিই দিবেন অথবা বিপদেই রাখবেন, তাহলে সে সৎকর্ম ও রহমত লাভের প্রার্থনা থেকে নিরুৎসাহিত হবে, তার ইবাদত ধ্বংস হবে, গোনাহ বৃদ্ধি পাবে। আর কোন ব্যক্তির প্রতি কেউ কু-ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়লে তার প্রতি সে মন্দ আচরণে ব্রতী হয়ে পড়তে পারে কিংবা তার থেকে ভাল কিছু লাভ করার উদ্যোগ গ্রহণে সে পশ্চাৎবর্তী হয়ে বঞ্চিত হয়ে যেতে পারে। ইসলাম তাই আল্লাহ্র প্রতি অনুরূপ কু-ধারণা পোষণকে হারাম করেছে। বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে যে ভাল তার সম্পর্কে প্রমাণ ব্যতিরেকে কু-ধারণা পোষণ করাও ইসলামে হারাম ও নিষিদ্ধ। নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীছে এরূপ ধারণা থেকেই নিষেধ করা হয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ.

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক, নিশ্চয় কতক ধারণা (কু-ধারণা) পাপ। (সূরা হুজুরাত : ১২)

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

অর্থাৎ, ধারণা (প্রমাণ ব্যতীত কু-ধারণা) থেকে বেঁচে থাক। কেননা, ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর।

আল্লাহ্র প্রতি অনুরূপ কু-ধারণা আসলে তা থেকে বাঁচার উপায় হল- আল্লাহর অপার করুণার কথা স্মরণ করা। আর মানুষের প্রতি কু-ধারণা আসলে তা দূরীভূত করার উপায় হল-প্রমাণ ব্যতীত এরূপ কু-ধারণা পাপ- একথা স্মরণ করে মনকে তাম্বীহ করা।

আরও এক প্রকার সন্দেহ আছে যা প্রিয়জনদের মধ্যে একজনের প্রতি আর একজনের হয়ে থাকে, বিশেষত স্বামী-স্ত্রী একে অপরের চরিত্র নিয়ে এবং অন্যত্র গমন নিয়ে করে থাকে। এ প্রকার সন্দেহের ফলে সম্পর্কের অনবতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হয়। সন্দেহ প্রবণ ব্যক্তি তাই বন্ধু ও প্রিয়জনদের সাথে শান্তিতে থাকতে পারে না। এ প্রকার সন্দেহ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রথমত পূর্ব বর্ণিত পন্থায় এ কথা ভাবতে হবে যে, দলীল প্রমাণ ছাড়া কারও ব্যাপারে কু-ধারণা করা অন্যায় এবং পাপ। অতএব দলীল প্রমাণ ছাড়া নিছক সন্দেহ হয়ে

থাকলে মন থেকে সে সন্দেহ ঝেড়ে ফেলতে হবে। যদি মন থেকে সে সন্দেহ না যায়, তাহলে যে কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয় সে কারণ উল্লেখ করে তাকে স্পষ্ট বলতে হবে যে, এ কারণে আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে তুমি এ থেকে বিরত হও। আর বিরত হতে না পারলে আমার জন্য দু'আ কর যেন আমার মন থেকে এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং নিজেও মন থেকে সে কু-ধারণা দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতে থাকবে।

৮. হীনম্মন্যতা (Inferiority complex)

হীনম্মন্যতা একটা মনের রোগ বিশেষ। নিজের সম্পর্কে অসচেতন হওয়ার ফলে অন্যের সামনে নিজের আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে হেয় হয়ে যাওয়া এবং অন্যের চেয়ে নিজেকে হীন মনে করাকে বলা হয় হীনম্মন্যতা। যেমন কোন মুসলমান নিজের আদর্শ সম্পর্কে সচেতন না থাকার ফলে অন্য কোন ধর্মের আদর্শের প্রতি মুগ্ধ হয়ে তার তুলনায় নিজের ধর্মের আদর্শকে হীন ও নীচ মনে করল এবং নিজে ইসলাম পন্থী হওয়ায় মনে মনে নিজেকে ক্ষুদ্র ভেবে জড়সড় হয়ে পড়ল। তখন বলা হবে যে, সে হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে পড়েছে বা হীনতাবোধে আক্রান্ত হয়েছে। নিজের যা আছে সে সম্বন্ধে সচেতন হলেই হীনমন্যতা দূর হয়ে থাকে। যেমন হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নিকট সাবা রাজ্যের রাণী-বিলকীছ হাদিয়া উপঢৌকন প্রেরণ করলে তিনি তাতে মোহিত হননি বরং তিনি বলেছিলেন,

فَمَآ اٰتَانِیَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتَاكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ.

অর্থাৎ, বস্তুত আল্লাহ্ আমাকে যা দান করেছেন তা তোমাদের যা দিয়েছেন তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বরং তোমাদের হাদিয়া নিয়ে তোমরাই সুখ বোধ কর। (সূরা নাম্ল : ৩৬)

৯. মানসিক ভারসাম্যহীনতা (Mental imbalance)

মানুষের আশা-আকাংখা, ভালবাসা, শত্রুতা, ভয়-ভীতি সবকিছুর মধ্যেই ভারসাম্যতা কাম্য। কোনটারই ভারসাম্যহীনতা কাম্য নয়। এমন যে আল্লাহ্র ভয় বা খোদাভীতি-যা সমস্ত নেক কাজের উৎস মূল এবং অনেক মর্যাদার বিষয়-তাও যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তাহলে মানুষকে তা অথর্ব বানিয়ে দিবে। আবার আল্লাহ্র রহমত লাভের আশায়ও এতখানি মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে না যে, আমল পরিত্যাগ করে বসবে। একজন মানুষ

আর একজনকে ভালবাসবে, কিন্তু ভারসাম্যতা হারিয়ে এমন ভাবে নিজের গোপনীয়তা কোন বন্ধুর কাছে ব্যক্ত করে দিবে না যাতে ভবিষ্যতে কোন দিন সে শত্রু হয়ে দাঁড়ালে তার ক্ষতি করতে পারে। পক্ষান্তরে কারও সাথে মনোমালিন্য বা শত্রুতা থাকলে বেসামাল হয়ে এমন কোন পদক্ষেপ নিবে না যাতে ভবিষ্যতে কোন দিন সে বন্ধুতে পরিণত হলে অতীত কার্যকলাপের কারণে লজ্জিত হতে হয়।

মানসিক ভারসাম্যতা বিধানের উপায় হল-কোন চেতনা মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে তার বিপরীত চেতনা মনে উপস্থিত করা। যেমন আল্লাহ্‌র ভয় অতিমাত্রায় এসে গেলে আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণার কথা স্মরণ করা। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র করুণার চেতনা আমলহীন বানানোর উপক্রম হলে আল্লাহ্‌র আযাবের কথা স্মরণ করা। কোন মানুষের প্রতি ভালবাসা লাগামহীন হয়ে যেতে চাইলে একথা চিন্তায় আনতে হবে যে, কখনও সে শত্রুও হয়ে যেতে পারে। আবার কারও প্রতি শত্রুতাভাব বেপরোয়া হওয়ার উপক্রম হলে সে কখনো বন্ধুও হয়ে যেতে পারে তা চিন্তায় আনতে হবে। তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে বলা হয়েছে,

اَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَّا عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَّا. وَاَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَّا عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَّا.

অর্থাৎ, তোমার বন্ধুকে ভালবাস মধ্যম ধরনের, হতে পারে কোন এক সময় সে তোমার শত্রুতে পরিণত হবে। আর তোমার শত্রুর প্রতি শত্রুতাও রাখবে মধ্যম ধরনের, হয়তো কোন এক কালে সে তোমার বন্ধুতে পরিণত হবে। (তিরমিযী)

১০. নেশা (Addiction)

নেশা ও নেশার প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে 'সমাজ মনোবিজ্ঞান' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বি. দ্র. অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি আরও বহু মানসিক ব্যাধি রয়েছে; "চরিত্র মনোবিজ্ঞান" অধ্যায়ে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়

সমাজ মনোবিজ্ঞান
(Social psychology)

সমাজ সংস্কার ও নতুন সমাজ গঠনের ধারা

১। পুরাতন ধ্যান-ধারণার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলা।
২। নতুন আদর্শ ও মূল্যবোধের দৈন্যতা দূর করা।
৩। ভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাব থেকে দূরত্ব বজায় রাখা।
৪। ব্যক্তি গঠন ও আদর্শিক নমূনা কাঠামো দাঁড় করানো।

কতকগুলো আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হয় একটি সমাজ। সুতরাং একটি সমাজের সংস্কার ও নতুন সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সমাজের স্থিত ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের পরিবর্তন সাধন। এক কথায় মনোভাবের পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সূচিত হবে একটি সমাজের সংস্কার ও নতুন সমাজ গঠনের ধারা।

কোন সমাজ সদস্যদের মনে যদি একথা বদ্ধমূল করানো যায় যে, তাদের আদর্শ বস্তাপচা, ভিত্তিহীন ও অচল, তাহলে তারা নতুন কোন আদর্শকে গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়ে উঠবে। স্থিতাবস্থার প্রতি এই বীতশ্রদ্ধা এবং নতুনত্বের প্রতি উন্মুখতা পুরাতন সমাজের সংস্কার ও নতুন সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক হয়ে থাকে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে-স্থিতাবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলার সাথে সাথে যদি নতুন আদর্শ উপস্থাপনের দৈন্যতা থেকে যায় তাহলে আদর্শিক শূন্যতা সৃষ্টি হওয়ার কারণে সমাজে দেখা দিতে পারে নানা রকম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। তাই দেখা যায় হঠাৎ গড়ে ওঠে কোন ব্যাপক গণ আন্দোলন, যুদ্ধ বা কোন বৈল্পবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে হুট করে কোন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হলে তখন নতুন আদর্শ ও মূল্যবোধের শূন্যতার ফলে সে সমাজে দেখা দেয় নানান বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। অতএব সমাজ সংস্কারের মনস্তাত্ত্বিক ধারা হল ধীরে ধীরে মনোভাবের পরিবর্তন সাধন করতে হবে এবং একে একে পুরাতন মূল্যবোধ ও আদর্শের স্থলে নতুন মূল্যবোধ ও আদর্শকে স্থলাভিষিক্ত করে যেতে হবে। সেই সাথে আরও লক্ষ্য রাখতে হবে-বিদেশী কোন সভ্যতা, কৃষ্টি ও আদর্শ যেন নতুন প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ও

মূল্যবোধে প্রভাব ফেলে কোন পরিবর্তন আনয়ন করতে না পারে। এ লক্ষ্যে সমাজকে বিদেশী সভ্যতা ও কৃষ্টি থেকে দূরে রাখার সযত্ন প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

সারকথা-সমাজ সংস্কার ও নতুন সমাজ গঠন এবং নব গঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে ধরে রাখার জন্য মৌলিকভাবে চারটি বিষয় করণীয়–

(এক) পুরাতন ধ্যান-ধারণার মূলে আঘাত হানা ও তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলা এবং এ কাজটি ধীরে ধীরে করা।

(দুই) নতুন আদর্শের দৈন্যতা দূর করা।

(তিন) ভিন্ন সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রভাব থেকে দূরত্ব বজায় রাখা।

(চার) ব্যক্তি গঠন ও আদর্শের নমুনা কাঠামো দাঁড় করানো।

ইসলাম তৎকালীন সমাজের সংস্কার সাধন ও নতুন একটি আদর্শিক সমাজ গড়ে তোলা এবং তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য উপরোক্ত ধারা চতুষ্ঠয় অত্যন্ত নিপুণভাবে অবলম্বন করেছিল। ইসলাম তখনকার স্থিত ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস তথা কুফ্র, শির্ক, বহুত্ববাদ, পূর্ব পুরুষের অন্ধ-অনুকরণ, পরকালে অবিশ্বাস প্রভৃতির অসারতা ধীরে ধীরে প্রমাণ করেছে এবং তদস্থলে ঈমান তথা তাওহীদ, রেসালাত, পরকালে একীন প্রভৃতি আকীদা-বিশ্বাসের দাওয়াত দিয়েছে এবং তাদের প্রচলিত সামাজিক নীতির বিপরীত ইনসাফ, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার মূল্যবোধ শিক্ষা দিয়েছে। আর ইসলামী আদর্শে যে দৈন্যতা নেই তা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّ هُدًى....الخ

অর্থাৎ, আমি তোমার প্রতি এমন গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে সব কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। (সূরা নাহ্ল : ৮৯)

অত্র আয়াতে জীবনের সব ক্ষেত্রের সব কিছুরই মূলনীতি কুরআনে বিদ্যমান থাকার কথা বলা হয়েছে। আর হাদীছে রয়েছে এসব মূলনীতির বিশদ ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা। অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

مَافَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থাৎ, এই কিতাবে (লওহে মাহফূজ বা কুরআনে) কোন কিছুই আমি বাদ দেইনি। (সূরা আনআম : ৩৮)

এসব আয়াতের বক্তব্যে মনস্তাত্ত্বিক উপকারিতা এই যে, কেউ যেন

ইসলামী আদর্শের দৈন্যতা বোধে আক্রান্ত না হয়। আর বিজাতীয় কৃষ্টি কালচার ও সভ্যতার বিরুদ্ধে ইসলাম অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করেছে। বলা হয়েছে,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থাৎ, যে ভিন্ন কোন জাতির (ধর্মীয় বা জাতীয় কৃষ্টি সভ্যতার) অনুসরণ করবে, সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

এ হাদীছে বিজাতির কৃষ্টি সভ্যতাকে ইসলামী আদর্শ ও কৃষ্টি সভ্যতার অস্তিত্বের বিপরীতে দাঁড় করানো হয়েছে। অর্থাৎ, বিজাতীয় কৃষ্টি সভ্যতার অনুসরণ ইসলামী আদর্শ ও কৃষ্টি সভ্যতার অস্তিত্ব বিলীন করারই নামান্তর। বলা বাহুল্য-ইসলামী আদর্শ ও কৃষ্টি সভ্যতার উপর বিজাতীয় কৃষ্টি সভ্যতা যেন কোন ক্রমেই প্রভাব ফেলতে না পারে সে ব্যাপারে অতি সতর্কতার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্যই হাদীছের এই সতর্কবাণী।

এখানে উল্লেখ্য যে, দীর্ঘকাল যাবত একটা আদর্শের অনুসরণের ফলে মনে এক ঘেঁয়েমির সৃষ্টি হতে পারে এবং এতে করে ভিন্ন কোন জাতির আদর্শের নতুনত্ব হাতছানি দিতে পারে এবং মানুষ সেই বিজাতীয় কৃষ্টি সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে পারে। এরূপ পরিস্থিতির মোকাবি-লা করার জন্য অত্যন্ত কঠোরভাবে নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ও ওতপ্রোতভাবে এর সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে ফেলতে হবে। শিখ জাতি অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদের পাগড়ি ও দাড়ির সংস্কৃতিকে আঁকড়ে থাকার ফলে এ বিষয়ে তাদের মধ্যে ভিন্ন জাতির সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করতে পারে না। একজন সমাজ সেবক নিজেকে যখন ওতপ্রোত- ভাবে সমাজ সেবা মূলক কর্মকান্ডে বিলীন করে দেয়, তখন তার মনে একঘেঁয়েমির চেতনা স্থান পায় না। একজন নামাযী যখন গুরুত্ব সহকারে নামায পড়তে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন সে আর নতুনত্বের চিন্তায় বে-দিশা হয় না, বিশেষতঃ যখন এই চেতনা সক্রিয় থাকে যে, এটা আমাকে চিরকালই করে যেতে হবে। তদ্রূপ শাশ্বত ধর্মের বিধান হিসেবে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির চিরন্তনতার বিশ্বাস ও গুরুত্ব মনে বদ্ধমূল করে নিতে পারলে আর কোন একঘেঁয়েমির চেতনা তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না।

কোন আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত শুধু পুঁথিগত বিদ্যা একদিকে

যেমন উক্ত আদর্শ ও মূল্যবোধের বাস্তবরূপ সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূরীকরণের জন্য যথেষ্ট নয়, কেননা পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষণের জন্য বলবুদ্ধি ও মেধা প্রয়োগ আবশ্যক, আর বল-বুদ্ধি ও মেধার তারতম্য অনস্বীকার্য বিষয়, অন্যদিকে শুধু পুঁথিগত শিক্ষা উক্ত আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্যও যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে 'প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণ' পদ্ধতিই অধিক কার্যকরী হতে পারে। উপস্থিত আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত ব্যবহারের প্রতীক হিসেবে কিছু সংখ্যক সমাজ সভ্যকে যদি দাঁড় করানো যায়, তাহলে অন্যদের পক্ষে একদিকে যেমন উক্ত আদর্শ ও মূল্যবোধের বাস্তব রূপ সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়, অন্যদিকে অনুরূপ কাঠামোতে নিজেদেরকে ঢেলে সাজানোর উদ্দীপনাও তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়। শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীকে বলেন তোমাকে মস্তবড় বিজ্ঞানী হতে হবে, তখন 'মস্তবড় বিজ্ঞানী'র রূপরেখা বা পরিধি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে অস্পষ্টতা থাকতে পারে। এ মুহূর্তে শিক্ষক যদি প্রতীক হিসেবে বৈজ্ঞানিক নিউটন বা গ্যালিলিউর নাম তার সামনে তুলে ধরেন, তাহলে শিক্ষার্থীর অস্পষ্টতা দূরীকরণে সহযোগিতা হবে। দু'জন খেলার সাথী বা দু'জন সহপাঠীর একজন যদি কোন অঙ্গনের প্রতীভা ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে অপরজন অনুরূপ হওয়ার উৎসাহ পাবে এবং অনুরূপ হওয়া যে সাধ্যাতীত বিষয় নয় অপর জনের মনে এরূপ প্রতীতী জন্মাতে সাহায্য করবে। সমাজ মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায়-শিক্ষণ পরিস্থিতিতে অনুকরণের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা তাড়াতাড়ি যথাযোগ্য নির্দেশকের প্রতি মনোযোগী হয়ে শিক্ষণ কার্য সমাপ্ত করতে পারে। অতএব বোঝা গেল-কোন আদর্শ বা মূল্যবোধের বাস্তব রূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা এবং তার সম্পর্কে মনোযোগ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য উক্ত আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত ব্যবহারের বাস্তব প্রতীকী ব্যক্তিত্ব দাঁড় করানো অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতি। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ.

অর্থাৎ, তোমরা ঈমান আন, যেমন এই লোকেরা (অর্থাৎ, সাহাবীরা) ঈমান এনেছে। (সূরা বাকারা : ১৩)

অত্র আয়াতে ঈমান-আদর্শের আহ্বান জানাতে গিয়ে ঈমানের প্রতীকী ব্যক্তিত্ব সাহাবায়ে কেরামকে সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সূরা নিসার ১১৫ নং আয়াতে আমলের প্রতীকী ব্যক্তিত্ব হিসেবেও সাহাবায়ে

কেরামকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতীকী ব্যক্তিত্ব সামনে থাকলে আর একটি মনস্তাত্ত্বিক উপকারিতা এই হয় যে, তখন কারও কছে সে আদর্শ গ্রহণ করাটা কঠিন মনে হয় না এই ভেবে যে, অন্যরা যখন তা গ্রহণ করতে পেরেছে, তখন আমরা পারব না কেন? এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ তোমাদের জন্য রোযার বিধান দেয়া হল, যেমন সে বিধান দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে। (সূরা বাকারা : ১৮৩)

এ আয়াতের মনস্তাত্ত্বিক বক্তব্য হল-রোযার আদর্শ পালন করা অন্যদের জন্য যখন কঠিন সাধ্য হয়নি তখন তোমাদের জন্য কেন কঠিন হবে? এরূপ মনস্তাত্ত্বিক বক্তব্য দ্বারা এ আদর্শ পালন করা যেন সহজবোধ হয় তারই চেষ্টা করা হয়েছে। 'দাওয়াত-মনোবিজ্ঞান' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

তবে আদর্শের পর্যাপ্ত নমুনা দাঁড় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিম্বা নমুনা ত্রুটিপূর্ণ থাকার ক্ষেত্রে বা অন্য কোন প্রয়োজনে আদর্শ সম্পর্কে প্রচার ও প্রেষণা সৃষ্টির জন্য আদর্শ প্রেরণের অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করা বৈ গত্যন্তর থাকে না। যেমন আদর্শের সাথে যে সব মনোভাব অথবা ব্যবহার জড়িত রয়েছে তার যথাসাধ্য সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান কিম্বা প্রয়োজনে আদর্শ কার্যকর করার জন্য বিধি-নিষেধ আরোপ করা অর্থাৎ, যারা আদর্শ মেনে চলবে না তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা এবং যারা মেনে চলবে তাদের জন্যে নগদ বা ভবিষ্যৎ পুরস্কার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান ইত্যাদি।

ইসলাম যে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে, তার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রচারক ছিলেন রাসূল (সা.)। তাঁকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

অর্থাৎ, তোমার প্রতি আমি এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি সুস্পষ্টভাবে মানুষকে বোঝাও যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তারা (সুস্পষ্টভাবে) চিন্তা করতে (ও বুঝতে) পারে। (সূরা নাহ্ল : ৪৪)

এ আয়াতে আদর্শ প্রেরণের একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ,

সুস্পষ্টভাবে আদর্শের ব্যাখ্যা প্রদান করার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আর ইসলামী আদর্শ মানার পার্থিব অপার্থিব পুরস্কার আর না মানার উভয় জগতের শাস্তির বিশদ অধ্যায়তো ইসলামে রয়েছেই।

সামাজিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা: উৎস ও প্রতিকার

সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ একে অপরের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে চায় এবং সংঘর্ষ বা কলহকে এড়িয়ে চলে কিম্বা এমনভাবে তার মোকাবিলা করে যার ফলে কলহ সংঘর্ষের অবসান ঘটে এবং সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলহ বা সংঘর্ষ সৃষ্টির রয়েছে বহুবিধ কারণ। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার বহুলাংশই মনস্তত্ব ঘটিত। অতএব সঙ্গত করণেই সে সব সমস্যা সমাধানের জন্য মনোবিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক। কারণগুলো মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ।

১. দায়িত্ব সচেতন না হয়ে অধিকার আদায়ে সোচ্চার হওয়া

পারস্পরিক সংঘর্ষ বা কলহ সৃষ্টির পশ্চাতে একটা বড় কারণ হল স্রেফ নিজের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হওয়া; অথচ যে দায়িত্ব পালনের সুবাদে তার সে অধিকার বর্তায় সে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে যত্নবান না হওয়া। সমগ্র বিশ্বব্যাপী আজ যে শ্রমিক আন্দোলনের বিভীষিকা চলছে, তার পশ্চাতে মূলতঃ এ কারণটিই কার্যকর। শ্রমিক তার দায়িত্ব যথাযথ পালনে ত্রুটি করছে অথচ যথা সময়ে নির্দ্ধারিত বেতন এমনকি আরও অধিক আদায়ের জন্য সদা তৎপর থাকছে, আন্দোলন করছে। অপর দিকে মালিক পক্ষ শ্রমিক থেকে কাজ ষোল আনায় আদায় করতে যতটা তৎপর, শ্রমিকের ন্যায্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ বা ধার্যকৃত পারিশ্রমিক যথা সময়ে যত্নসহকারে আদায়ের ব্যাপারে ততটা তৎপর নয়। একদিকে শ্রমিক পক্ষ তার দায়িত্বের ব্যাপারে অসচেতন অথচ অধিকার আদায়ে সোচ্চার, অপর দিকে মালিক পক্ষ শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার আদায়ে গড়িমসি করে নিজের-টা পুরোপুরি আদায়ের চিন্তায় সদা মগ্ন। এভাবে চলছে উভয় পক্ষের মধ্যে টানাপোড়েন, এক পক্ষ আরেক পক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য চালিয়ে যাচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উভয় পক্ষের অধিকার, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অর্থনীতি, সর্বোপরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা। এরূপ সমস্যার সমাধান একটাই। আর তা হচ্ছে প্রত্যেক পক্ষের দায়িত্ব সচেতন হওয়া এবং অপর পক্ষের দায়িত্ব পালনে

তথা নিজের অধিকার আদায়ে অপর পক্ষের কর্মে পরিলক্ষিত বিচ্যুতিকে সহনশীলতার সাথে উত্তীর্ণ হওয়া। শ্রমিক পক্ষ যখন দায়িত্ব পালনে সচেত-নতার পরিচয় দিবে এবং যার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, তখন মালিক পক্ষ শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারের প্রতি যত্নবান হয়ে উঠবে, আবার মালিক পক্ষ যখন শ্রমিকের ন্যায্য পাওণার ব্যাপারে যত্নবান হয়ে উঠবে, তখন শ্রমিক পক্ষ মালিকদের প্রতি প্রীত হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে অধিক তৎপর হওয়ার জন্য উৎসাহ পাবে।

শ্রমিক মালিক উভয় পক্ষ যেন দায়িত্ব সচেতন হয়-এজন্য ইসলাম এক দিকে শ্রমিকদের জন্য যতটুকু দায়িত্ব পালনের ত্রুটি হবে ততটুকুর পারিশ্রমিক গ্রহণ অবৈধ করেছে, অপর দিকে মালিক পক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায় করে দিতে।

অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সোচ্চার না হয়ে সহনশীলতার পরিচয় দেয়ার এবং নিজ দায়িত্ব পালনে যত্নবান থাকার শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে নিম্নোক্ত হাদীছে বিবৃত হয়েছে,

سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُوْنَ حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُوْنَ حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: رسول الله ﷺ اِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا، فَإِنَّمَا

অর্থাৎ, সালমা ইবনে ইয়াযীদ জু'ফী (রা.) রাসূল (সা.)-এর নিকট জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি এমন আমীর উমরাহ ও কর্তৃপক্ষ আমাদের উপর দাঁড় হয়, যারা আমাদের থেকে তাদের অধিকার আদায় করতে চায় অথচ আমাদের অধিকার আমাদেরকে প্রদান করা থেকে বিরত থাকে, সে মুহূর্তে আমাদেরকে কি করার নির্দেশ দেন? রাসূল (সা.) উত্তর প্রদান থেকে বিরত থাকলেন। সে আবার প্রশ্ন করলে তিনি এবারও উত্তর প্রদান থেকে বিরত থাকলেন। আবার সে প্রশ্ন করলে (দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার, তখন আশআছ ইবনে কায়ছ তাকে

عَلَيْهِمْ مَّا حُمِّلُوْا، وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ.(مسلم ج : ٢ ص : ١٢٧)

ধরে টান দিল) তখন রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা তাদের কথা শুনবে, তাদের আনুগত্য বহাল রাখবে। তাদের দায়িত্ব তাদের পালন করা কর্তব্য এবং তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের পালন করা কর্তব্য। (মুসলিম : ২য় খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِيْ اَثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ. (مسلم ج : ٢ ص : ١٢٧)

অর্থাৎ, আমার দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তোমাদের অধিকারের চেয়ে অন্যের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে-এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তোমরা, তখন তোমরা ধৈর্য্য সহনশীলতার পরিচয় দিও। এভাবে হাউযে কাওছারের নিকট আমার সাথে তোমাদের মিলন হবে। (মুসলিম : ২য় খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

এ হাদীছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিজেদের অধিকার বিবেচিত হতে না দেখলে ধৈর্য্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন এবং কর্তৃপক্ষের আনুগত্য অব্যাহত রাখার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

২. সুষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব

নানা রকম চরিত্র ও বিচিত্র স্বভাবের মানুষের সমন্বয় হল একটি সমাজ। সমাজ সভ্যদের আগ্রহ, প্রবণতা, কামনা, বাসনা, প্রেষণা তাই বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আর এই বিভিন্নতার ফলেই তাদের মধ্যে দেখা দেয় মতানৈক্য, বিভেদ ও বিরোধ এবং বিঘ্নিত হয় শান্তি ও শৃঙ্খলা। এ পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হয় একটি নেতৃত্বের, যে নেতৃত্ব সকলকে সুসংহত ও সুসংবদ্ধ করে পরিকল্পিতভাবে একটি সুষ্ঠু লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে পারে, সকলের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবহারে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে পারে, এবং সকলের সম্মিলিত সহযোগিতার মাধ্যমে সমন্বিত সামাজিক স্বার্থকে বজায় রাখতে পারে এবং প্রয়োজনে সংকটময় মুহূর্তে সংঘবদ্ধভাবে যে কোন প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে পারে। বলা

বাহুল্য-এ প্রেক্ষিতেই সমাজ নিয়ন্ত্রণে মহামানব ও মহান নেতাদের অবদান অনস্বীকার্য। আর একই কারণে নেতৃত্বশূন্য সমাজ অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার আখড়ায় পরিণত হয়ে থাকে। সুষ্ঠু নেতৃত্বের জন্য নেতার মধ্যে কি কি গুণাবলী থাকতে হবে তা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

৩. নৈতিক অবক্ষয়

নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, জিঘাংসা প্রভৃতি নৈতিক অপরাধ এবং এগুলো থেকে সৃষ্ট কার্যকলাপ সমাজের শান্তি বিঘ্নিত করে থাকে। 'চরিত্র মনোবিজ্ঞান' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

৪. সামাজিক অপরাধ

চুরি, ডাকাতি, মদ-জুয়া, নেশা প্রভৃতি সামাজিক অপরাধ সমাজের বহুবিধ অনাসৃষ্টির কারণ। এ সম্পর্কে পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. শ্রেণী বৈষম্য

সমাজে বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তি সৃষ্টির একটা অন্যতম কারণ হল শ্রেণী বৈষম্য। বংশ, বর্ণ, জাতি ও গোষ্ঠিগত সব ধরনের বৈষম্যই এর অন্তর্ভুক্ত। আইনগত, সামাজিক বা ব্যবহারিক যে কোন ধরনের বৈষম্যই হোকনা কেন তা সমাজে বিভেদ, পারস্পরিক বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাতের জন্ম দিতে পারে এবং এভাবে বিনষ্ট হতে পারে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা।

যে সব মতবাদ বা আদর্শ সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠিমূলক-যার আবেদন গোষ্ঠি বা দল বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ- সে সব মতবাদ ও আদর্শের অনুসারীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্ম নেয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইসলামী আদর্শে সমগ্র মানব জাতির সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ, তিনিই সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক। ইসলাম তাই সমগ্র মানব গোষ্ঠিকে একই পরিবারের সদস্য বলে মনে করে, একই পরিবারের সদস্যদের মত সারা পৃথিবীর মানুষকে অভিন্ন ভাবতে শিখায়, সকলকে আপন করে নেয়ার সবক দেয়। ইসলাম বংশ, বর্ণ, ভাষা, জাতি, গোষ্ঠি বা ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করে বিশ্ব মানবকে তার আওতায় আনতে

চায়। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ. (المقاصد الحسنة)

অর্থাৎ, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্‌র পরিবার, অতএব তার পরিবারের সাথে যে সদাচরণ করবে, সেই আল্লাহ্‌র নিকট সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। (আল-মাকাসিদুল হাছানাহ : ২১১ পৃষ্ঠা)

এহেন উন্মুক্ত ও সার্বজনীন মনোভাব সৃষ্টিকারী আদর্শের অনুসারী-দের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বা ভেদবুদ্ধি জন্ম নিতে পারে না। ইসলামে শ্রেণী বৈষম্যের ধারণা নেই। তাই ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাত বা শ্রেণীগত বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিতে পারে না।

নেতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী

নেতৃত্বের রয়েছে প্রকার এবং নেতা রয়েছে অনেক রকমের। যেমনঃ বিশেষজ্ঞ নেতা, বুদ্ধিবৃত্তীয় নেতা, প্রশাসনিক নেতা, সংস্কার সাধনকারী নেতা ও গণতন্ত্রী নেতা। আবার স্বৈরাচারী মনোভাবের নেতাও হতে পারে। প্রত্যেক প্রকারের নেতার সংজ্ঞা কি? নেতৃত্ব কাকে বলে এবং নেতা হয়েই কেউ জন্মায় কি-না? এসব সম্পর্কে সমাজ মনোবিজ্ঞানীদের বহু রকম তত্ত্বকথা রয়েছে। ব্যবহারিক জীবনে সেগুলোর গুরুত্ব শূন্যের কোঠায় মনে করে তার উল্লেখ পরিত্যাগ করলাম। তবে সুষ্ঠু নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও নেতার দায়িত্ব সম্পর্কে অবগতি লাভ করা আবশ্যক, যাতে নেতৃত্ব নির্বাচন বা নেতৃত্ব অর্জনের পর সুচারুরূপে দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা লাভ করা যায়। নেতার প্রধান গুণাবলী নিম্নরূপ:

১. নেতৃত্বের মোহ না থাকা

নেতৃত্ব হতে হবে জনগণের স্বার্থে, দেশ ও সমাজের স্বার্থে, ব্যক্তি স্বার্থে নয় বরং বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার তাগিদে। এরূপ নেতৃত্বকেই লোকেরা তাদের আপন নেতৃত্ব বলে মেনে নিতে পারবে। পক্ষান্তরে নেতার মধ্যে ঐশ্বর্য্য লাভ, যশ খ্যাতি অর্জন প্রভৃতি ব্যক্তি কেন্দ্রিক মোহ বিদ্যমান থাকলে সেরূপ নেতাকে জনগণ তাদের স্বার্থ রক্ষার প্রতিভূ ভাবতে পারবে না। ফলে সেরূপ নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা গড়ে উঠবে না। অনুরূপ নেতার নির্দেশে জনগণ ব্যক্তি স্বার্থ পরিহার ও বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য

সর্বস্ব ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ হবে না। এভাবে নেতা তার কর্মীদের সহযোগিতা হারাবে। ফলে নেতৃত্বের সামগ্রিক উপকারিতা ব্যাহত হবে। ইসলাম তাই নেতৃত্ব যাচঞা নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম নেতৃত্ব বা পদের জন্য যারা উন্মুখ বা যারা নেতৃত্বের যাচঞা করে তাদেরকে সেটা দিতে প্রস্তুত নয়। কেননা, নেতৃত্বের প্রতি মোহ বা নেতৃত্ব যাচঞা ব্যক্তি স্বার্থেরই ইঙ্গিত বহন করে। নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

لَانَسْتَعْمِلُ عَلٰى عَمَلِنَا مَنْ اَرَادَهٗ.

অর্থাৎ, যে নিজে পদ যাচঞা করে আমরা তাকে পদ দেই না। (মুসলিম : ২য় খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা)

আল্লামা নববী এ হাদীছ থেকে প্রমাণ করেছেন যে, নেতৃত্বের প্রতি মোহ ও নেতৃত্বের যাচঞা করা নিষেধ। অন্য এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

لَاتَسْأَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا.

অর্থাৎ, তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিও না, কেননা চেয়ে নেয়ার ফলে তোমাকে নেতৃত্ব দেয়া হলে তুমি সে ব্যাপারে সহযোগিতা হারাবে। পক্ষান্তরে দরখাস্ত ছাড়াই যদি নেতৃত্ব দেয়া হয়, তাহলে সে ব্যাপারে সহযোগিতা লাভ করবে। (প্রাগুক্ত)

উলামায়ে কেরাম এ হাদীছের ব্যাখ্যায় নেতৃত্ব যাচঞা করলে সহযোগিতা হারানোর একটা কারণ এই উল্লেখ করেছেন যে, এতে করে উক্ত নেতার প্রতি মানুষের মনে অভিযোগ থেকে যায়। (নববী) মানুষ তাকে নিঃস্বার্থ ভাবতে পারে না, যার ফলে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ হয় না।

তবে কুরআনে বর্ণিত اِجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ (অর্থাৎ, [ইউসুফ] {আ.} বলেছিলেন, আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন) বাক্যের ব্যাখ্যায় তাফসীরবীদগণ বলেছেন যে, এ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কোন বিশেষ সরকারী পদ নিজে উপযাচক হয়ে গ্রহণ করা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জায়েয। যেমন ইউসুফ (আ.) দেশীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব চেয়ে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ, যদি এই বিশেষ পদ সম্পর্কে জানা যায় যে, অন্য কোন ব্যক্তি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে

না এবং নিজে ভাল রূপে তা সম্পাদন করতে পারবে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে এবং কোন গোনাহে লিপ্ত হওয়ারও আশংকা না থাকে। তবে এ ক্ষেত্রেও শর্ত এই যে, প্রভাব প্রতিপত্তি ও অর্থ-কড়ির মোহে নয়, বরং জনগণের বিশুদ্ধ সেবা ও ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণেরই উদ্দেশ্য থাকতে হবে। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামনে এরূপ লক্ষ্যই ছিল। (মাআরেফুল কুরআন)

নেতৃত্বের মোহ না থাকলে আর একটি বড় উপকারিতা হল-যদি অবস্থার পরিবর্তনের সাথে নেতৃত্বের পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তাহলে নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে তার মধ্যে মোটেই কুণ্ঠাবোধ আসবে না।

২. বিনয় থাকা

নেতা হবেন বিনয়গুণে ভূষিত, বিনীত হবে তার কথাবার্তা ও আচার আচরণ। তাহলে সে নেতার প্রতি জনগণ মুগ্ধ হবে এবং তার আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ হবে। এর বিপরীত কোন লোক থেকে যদি অহমিকা প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে কেউ নেতা হিসেবে গ্রহণ করতে চায় না। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন,

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ.

অর্থাৎ, মানুষের নেতা হল তাদের সেবক মাত্র। (আল মাকাসিদুল হাছানা : ২৫৫ পৃষ্ঠা)

এ হাদীছে নেতাদেরকে সেবক বলে পরিচয় দেয়া হয়েছে, যাতে নেতাগণ নেতৃত্বের অহমিকা নয় বরং সেবকের বিনীত মনোভাব নিয়ে কাজ করে যান এবং সেবকের ন্যায় যেন হয় তাদের কথাবার্তা ও আচার-আচরণ। এ হাদীছের সনদ যয়ীফ হলেও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দরুন ‘হাছান’ (দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য) স্তরের মর্যাদা লাভ করেছে। এ হাদীছের আর একটি ব্যাখ্যাও করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে লোকদের সেবা কর্মে যারা নিয়োজিত, পরকালে তাদের নেতা হবে তারা। এ ব্যাখ্যার আলোকেও নেতাদেরকে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, এভাবে যে, তারা যেন পার্থিব কোন মোহে কাজ না করেন, কেননা এর বিনিময় তারা পরকালে লাভ করবেন।

রাসূল (সা.) যে কোনই অহমিকা নিয়ে চলতেন না তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে প্রতিনিয়ত তাঁর আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে। সফরে রান্নার প্রয়োজনে তাঁর জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে জঙ্গলে গমন আর জনৈক বৃদ্ধা

মহিলার প্রয়োজন শ্রবণের উদ্দেশ্যে মদীনার যে কোন গলিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি ব্যক্ত করার মত অসংখ্য প্রসিদ্ধ ঘটনাতো রয়েছেই। রাসূল (সা.) নেতাদেরকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অংশ হিসেবে বলেছেন,

قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ.

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের নেতাদের আগমনের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে যাবে। (বোখারী ও মুসলিম)

আবার নিজের বিনয় প্রকাশের জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে সাহাবীদের দাঁড়িয়ে যাওয়াকে তিনি অপছন্দ করেছেন।

৩. সংকটময় মুহূর্তে নেতার অগ্রণী ভূমিকা পালন

যে কোন সমস্যা বা সংকট দেখা দিলে নেতাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে, যাতে সংকটময় মুহূর্তে নেতাকে আগে দেখে তার প্রতি দলীয় সদস্যদের ভক্তি শ্রদ্ধা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং সমস্যা ও সংকটের ফলে দলীয় সদস্যদের মনে যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয় তা নেতার কাজের মাধ্যমে লাঘব হয়ে যায়। দলীয় সদস্যরা যদি সংকটের মুহূর্তে তাদের নেতাকে সম্মুখে না পায়, তাহলে তারা বাঘের মুখে তাড়া খাওয়া রাখাল বিহীন-মেষ পালের মত নিজেদেরকে অসহায় ভাববে এবং নেতৃত্ব শূন্যতার মনোভাব জন্মাবে তাদের মধ্যে।

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-এক রাতে মদীনাবাসীরা একটা ভীষণ ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পেল, মদীনাবাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ব্যাপারটির মূলোদঘাটনের উদ্দেশ্যে আওয়াজের পানে ছুটল। কিছু দুর গিয়ে দেখতে পেল রাসূল (সা.) আবূ তালহার ঘোড়ায় আরোহণরত অবস্থায় ফিরে আসছেন। ঘাড়ে তার নাঙ্গা তলোয়ার লটকানো। তিনি বলছেন, ভয় নেই, তোমাদের ভয় নেই, আমি এটাকে (অর্থাৎ ঘোড়াটিকে) পেয়েছি সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রের মত গতি সম্পন্ন। (মুসলিম : ২য় খণ্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা)

৪. অনুসারীদের সুবিধা-অসুবিধা ও আশা-আকাংখার খোজ-খবর রাখা

সফলকাম নেতা হতে হলে তিনি তার অনুসারীদের সুবিধা-অসুবিধা, অভাব-অনটন, তাদের মনোভাব, তাদের আশা-আকাংখা, তাদের মূল্যবে-াধ ও আদর্শ লক্ষ্যের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হবেন, তাহলেই তিনি কোন দল বা জনগোষ্ঠির সফল নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন। এ কারণেই বাইরের কোন লোক হঠাৎ এসে কোন দল বা জনগোষ্ঠির নেতৃত্ব দিতে

সক্ষম হয় না। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়-যদি কোন শ্রমিক দলে নেতার অভাব দেখা দেয়, তাহলে শ্রমিকরা বাইরের কোন বুদ্ধিজীবীকে নিয়ে এসে তাদের নেতৃত্বের আসনে বসায় না। কারণ শ্রমিকদের আশা-আকাংখা, অভাব-অনটন ও মনোভাবের সাথে তার পরিচিত না হওয়াই স্বাভাবিক।

বিশেষ একটা আদর্শ ও লক্ষ্যে কোন জনগোষ্ঠি বা জাতিকে পরিচালনার বা নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরিত হয়ে থাকেন নবী ও রাসূলগণ। আল্লাহ্ তা'আলা তাই প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকেই তাদের নবী মনোনীত করেছেন-এক জাতির জন্য নবী অন্য জাতি থেকে মনোনীত করেননি এবং প্রয়োজনে একটা গোত্রের জন্যেও তাদেরই গোত্রের মধ্য থেকে একাধিক জনকে নবী মনোনীত করেছেন।

নেতা প্রয়োজনে অনুসারীদের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা এবং অভাব- অনটনের খোঁজ-খবরও নিবেন এবং সাধ্যমত তাদের সমস্যা নিরসনের ব্যবস্থা করবেন। তাহলে এরূপ নেতার প্রতি অনুসারীরা ব্যক্তিগতভাবেও আপ্লুত হয়ে উঠবে, যা উক্ত নেতার দলীয় বা সামাজিক নেতৃত্বের অঙ্গনে তাদেরকে উৎসাহী করে রাখবে। প্রয়োজনে এবং সামর্থ সাপেক্ষে নেতা নিজের ব্যক্তিগত তহবীল থেকেও যদি ব্যয় করেন সেটাও তার নেতৃত্বকে অধিকতর স্থিত করে। কেননা, ব্যয়ের সাথে নেতৃত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান, যারা ব্যয় গ্রহণ করবে তারা ব্যয়কারীর নেতৃত্বের প্রতি মানসিকভাবে দুর্বল হয়েই যাবে। কুরআনে কারীমে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের একটা কারণ হিসেবে পুরুষ কর্তৃক নারীর ব্যয়ভার বহনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ.

অর্থাৎ, নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব রয়েছে এ কারণে যে, আল্লাহ এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ কারণেও যে, পুরুষ (নারীর জন্য) তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। (সূরা নিসা : ৩৪)

সারকথা-নেতা তার অনুসারী ও দলীয় সদস্যদের আশা-আকাংখা ও অভাব-অনটন ইত্যাদির খোঁজ-খবর রাখবেন। এ জন্য যতদূর সম্ভব তিনি অনুসারী ও দলীয় সদস্যদের সংস্পর্শে থাকবেন। এতে করে একদিকে

তিনি তাদের মনোভাব সহ সার্বিক বিষয়ে অবগতি লাভ করতে পারবেন, অন্যদিকে এরূপ সংস্পর্শের ফলে তার ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রভাবে অন্যকে মুগ্ধও করতে পারবেন। নেতা তার দলের জন্য যে কর্মসূচী দিবেন, তাতে তদের আশা- আকাংখা প্রতিষ্ঠিত হবে, যাতে তার কর্মসূচী বাস্তবায়নে দুর্লঙ্ঘ বাধা দেখা না দেয়। কর্মসূচী প্রণয়নে নেতা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

৫. ভালবাসা দিতে ও নিতে পারা

নেতার মধ্যে এমন গুণাবলী থাকতে হবে, যার জন্য সবাই তাকে ভালবাসবে এবং তিনিও সকলকে ভালবাসবেন। এরূপ অবস্থায় দলে নেতার উপস্থিতি দলীয় সদস্যদের মনে আনন্দের সৃষ্টি করবে, নেতার উপস্থিতি তাদের কাছে কাম্য হবে এবং তারা আনন্দ আবেগের সাথে নেতার কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য উন্মুখ থাকবে। কর্মীদের প্রতি ভালব-াসা থাকার ফলে তাদের বহু অবাধ্যতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিকে নেতা ভালবাসা দিয়ে জয় করতে পারবেন এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে পারবেন। আবার নেতার প্রতি ভক্তি ভালবাসা থাকার ফলে তার বহু কষ্টকর এবং কঠিন নির্দেশও কর্মীরা ম্লান বদনে ও সহাস্যে পালন করতে সক্ষম হবে। উভয় পক্ষই মনের গহীন থেকে একে অপরের কল্যাণ কামনা করবে। হাদীছে নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

خِيَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ.... الخ.

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম নেতা, যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তোমাদেরকেও তারা ভালবাসে, তোমাদের জন্য তারা দু'আ করে আর তাদের জন্য তোমরা দু'আ কর। (মুসলিম : ২য় খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা)

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ছিল-তারা প্রত্যেকেই মনে করতেন রাসূল (সা.) আমাকেই সবচেয়ে অধিক ভালবাসেন। আর যে যত বেশী রাসূলের নিকট আসত, রাসূলের প্রতি তার ভক্তি ভালবাসা তত বেড়ে যেত। দূরে থেকে রাসূলের প্রতি কারও মনে বিদ্বেষ বা অনীহা থাকলেও রাসূলের নিকট আসার পর তার আমল পরিবর্তন সাধিত হত। হযরত আম্‌র ইবনুল আস (রা.) বলতেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে (অর্থাৎ, রাসূলের

নিকট আসার পূর্বে) যে মুখচ্ছবি আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ছিল, সেটা হল মুহাম্মাদের মুখচ্ছবি। আর ইসলাম গ্রহণের পর সেটাই হল আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মুখচ্ছবি। (মুসলিম : ২য় খণ্ড,, ৭৬ পৃষ্ঠা)

বস্তুত নেতার মধ্যে আকর্ষণীয় গুণাবলী বিদ্যমান থাকলেই তার নিকট যত বেশী যাওয়া হবে ততই তার প্রতি ভক্তি ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে এরূপ গুণাবলী শূন্য নেতার প্রতি দূরের থেকে বক্তৃতা বিবৃতি শুনে বা সাময়িক কোন আবেগ বশত ভক্তি ভালবাসা সৃষ্টি হলেও নৈকট্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সে ভক্তি ভালবাসা উবে যেতে থাকবে। এমনকি নিকট থেকে দেখা নেতার মূল স্বরূপ দূর থেকে কর্মীদের মনে সৃষ্টি হওয়া ভক্তি ভালবাসাকে অনীহা ও ঘৃণায় রূপান্তরিত করে দিতে পারে।

৬. নেতার বুদ্ধিমত্তা ও সমস্যা সম্বন্ধে পরিজ্ঞান

বুদ্ধিমত্তা ও সমস্যা সম্বন্ধে পরিজ্ঞানের সাথে পদ ও নেতৃত্বের গভীর যোগাযোগ রয়েছে। নতুবা নেতার পক্ষে পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সমস্যার নানা দিক বিশ্লেষণ করে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে না। বিশেষতঃ বুদ্ধিবৃত্তীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তির প্রয়োজন অনেক বেশী। কোন কোন নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন এত বেশী না হলেও অনুসারীদের বুদ্ধিমত্তার চেয়ে নেতার বুদ্ধিমত্তা মোটামুটিভাবে প্রখর থাকা বাঞ্ছনীয়; অন্যথায় অজ্ঞতার কারণে বা কোন কুটিল চক্রের আবর্তে নেতৃত্ব আদর্শচ্যুত হয়ে যেতে পারে। অভিজ্ঞতায়ও দেখা গেছে-অতীতে যে সব মহান ব্যক্তি বড় বড় পদ ও নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করেছেন তারা প্রায় সবাই ছিলেন এক একটি প্রতিভা। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মিসরের অর্থভান্ডার পরিচালনার পদ দাবী করেছিলেন, সে সময় তিনি যে উক্ত পদের যোগ্য তা বোঝাতে গিয়ে নিজের দুটো গুণের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছি-লন,

اِنِّي حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ.

অর্থাৎ, আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান। (সূরা ইউসুফ : ৫৫)

এখানে হযরত ইউসুফ (আ.) বোঝাতে চেয়েছেন যে, এ পদের দায়িত্ব পালনের জন্য পুরোপুরি জ্ঞান আমার রয়েছে, যেমন রয়েছে আমার মধ্যে বিশ্বস্ততা।

নেতার মধ্যে জ্ঞানের অভাব থাকলে তিনি শুধু নিজেই বিভ্রান্ত হবেন

না বরং একটা বিরাট জনগোষ্ঠির বিভ্রান্তি ও আদর্শচ্যুত হওয়ার কারণ হবেন। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا.

অর্থাৎ, যখন জ্ঞানী ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না, তখন মানুষ মূর্খদেরকে নেতা বানাবে আর তাদের কাছে সমস্যার সমাধান জানতে চাইলে জ্ঞান ছাড়াই তারা সমাধান দিবে। ফলে তারা নিজেরাও বিভ্রান্ত হবে এবং অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করবে। (ইবনে মাজা)

জ্ঞানই নেতৃত্বের একটা মৌলিক যোগ্যতা এবং জ্ঞানের দ্বারাই নেতৃত্ব অর্জিত হয়ে থাকে-সে কথা আরও স্পষ্টভাবে অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন,

لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوْهُ عِنْدَ اَهْلِهِ لَسَادُوْا بِهِ اَهْلَ زَمَانِهِمْ.

অর্থাৎ, যদি জ্ঞানীরা তাদের জ্ঞানের যত্ন নিত এবং যথাস্থানে সেটা প্রয়োগ করত তাহলে এর বদৌলতে তারা যুগের নেতৃত্ব দিতে পারত। (সংক্ষেপিত) [ইবনে মাজা]

৭. আদর্শস্থানীয় হওয়া

নেতাকে হতে হবে সমাজ ও দলের কাছে আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তার স্বভাব-চরিত্র, ত্যাগ-তীতিক্ষা ও নীতি নৈতিকতা হবে সর্বজন বিদিত। তাহলে একদিকে অনুসারীদের মনে তার প্রতি আসবে গভীর শ্রদ্ধাবোধ, অন্যদিকে তার আদর্শ অনুসারীদের মনে প্রভাব ফেলবে এবং সমাজ ও দল হয়ে উঠবে আদর্শবান। নেতাকে আদর্শবান দেখলে অনুসারীরা আদর্শচ্যুত হওয়ার দুঃসাহস পায় না এই ভেবে যে, আদর্শচ্যুতি নেতার কাছে প্রশ্রয় পাবে না। পক্ষান্তরে নেতা আদর্শচ্যুত হলে দলের অনুসারীদেরকে বা দলের আদর্শহীন কর্মকান্ডকে বাধা দেয়ার মত মানসিক শক্তি সে পায় না। ফলে আদর্শচ্যুতি প্রশ্রয় পায় এবং সমাজ ও দল আদর্শচ্যুত হয়ে যায়। এক কথায়-যেমন নেতা তেমন দল বা যেমন নেতা তেমন সমাজ গড়ে ওঠে। কুরআন হাদীছের আলোকে তাই বলা হয়,

اَلنَّاسُ عَلٰى دِيْنِ مَلِيْكِهِمْ

অর্থাৎ, মানুষ তাদের সম্রাটের (অর্থাৎ, নেতার) আদর্শে গড়ে ওঠে। (আল-মাকাসিদুল হাছানাহ : ৪৩৭ পৃষ্ঠা)

তাবরানী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেছেন,

لَا تَسُبُّوْا الْاَئِمَّةَ وَادْعُوْا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ، فَاِنَّ صَلَاحَهُ لَكُمْ صَلَاحٌ.

অর্থাৎ, তোমরা নেতাদেরকে গালি দিও না বরং তাদের সংশোধনের নিমিত্তে দু'আ কর। বস্তুত তাদের সংশোধনে তোমাদেরই সংশোধন। (প্রাগুক্ত)

রাষ্ট্র-প্রধান, আমীর-উমরাহ, সমাজের নেতা ও গণপ্রতিনিধিরা আদর্শচ্যুত হলে সমাজ আদর্শচ্যুত হয়ে য়ায়, যার ফলে সে সমাজ আর বসবাসের যোগ্য থকে না। এ জন্য অসৎ লোকের নেতৃত্ব ও নিকৃষ্ট লোকদের গণপ্রতিনিধিত্বকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। হাদীছের ভাষা নিম্নরূপ–

কিয়ামতের আলামত বর্ণনার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ اَرْذَلَهُمْ.....

অর্থাৎ, আর জনগোষ্ঠির নেতৃত্ব দিবে তাদের মধ্যকার পাপাচারী এবং গণপ্রতিনিধি হবে তাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট লোক.....। (মেশকাত : ৪৭০ পৃষ্ঠা)

৮. চরমপন্থী না হওয়া

নীতিগত কাঠামোর মধ্যে থেকে যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে সকলের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য মানসিকভাবে নেতাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই তিনি চরমপন্থী হবেন না, নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দেয়ার জন্য গো ধরবেন না বরং প্রয়োজনের তাগিদে মূল আদর্শ বহাল রেখে নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে আপোষের মনোভাব নিয়ে চলবেন। এ জন্য ইসলাম কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে অনুসারী ও দলীয় সভ্যদের থেকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ.

অর্থাৎ, কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। (সূরা আলে-ইমরান : ১৫৯)

রাসূল (সা.) কর্তৃক নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে আপোষের মনোভাব নিয়ে কাজ করার দৃষ্টান্ত দেখা যায় ওহুদ যুদ্ধের জন্য মদীনার বাইরে যাওয়া

না যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়। রাসূল (সা.)-এর মত ছিল মদীনা শহরের অভ্যন্তরে থেকে প্রতিরোধ করা, কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবীর মতের সাথে আপোষ স্থাপন পূর্বক তিনি মদীনা শহরের বাইরে ওহুদ প্রান্তরে গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সারকথা-নেতাকে অনুসারী ও দলীয় সদস্যদের মত- বিরোধের প্রতি সহনশীল হতে হবে এবং মতামত বিনিময়কে উৎসাহ দিতে হবে। এতে করে তারা প্রত্যেকে কাজকে নিজের মনে করতে পারবে এবং কাজের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততার অনুভূতি কাজের জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করবে।

নেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. দলীয় সদস্যদের ঐক্য বজায় রাখা

ঐক্যহীনতার কারণে দল ও সমাজ বিপন্ন হয়ে যায়। তাই নেতার দায়িত্ব হবে দলীয় সদস্য এবং সমাজের লোকদের ঐক্য সৃষ্টি ও তা বজায় রাখার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা। অন্তর্দলীয় কোন সংঘাত আছে কি-না বা থাকলে তার নিরপেক্ষ কারণ কি তা নির্ণয় করতে নেতাকে সক্ষম হতে হবে এবং কার্যকরভাবে এরূপ সংঘাত ও সম্ভাব্য সংঘাতের উৎস অপসারণে নেতাকে সফল হতে হবে।

হযরত রাসূল (সা.) মদীনায় যে সমাজ গড়ে তুলেছিলেন সেখানে মূল আদিবাসীদের মধ্যে আউস ও খাযরাজ নামক দুটি গোত্র ছিল। জাহেলী যুগে তাদের মধ্যে বহু যুদ্ধ বিবাদ সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে একটি ছিল "বুআছ" যা সুদীর্ঘ বৎসর যাবত স্থায়ী ছিল এবং আউস গোত্র তাতে বিজয়ী হয়। রাসূল (সা.)-এর আগমনের পর উক্ত দুই গোত্রের মধ্যে আর কোন বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেয়নি, পরস্পর সম্প্রীতির সাথে তারা বসবাস করে যাচ্ছিল। একবার আউস ও খাযরাজ গোত্রের কতিপয় সাহাবীকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিবেশে দেখে শাছ ইবনে কায়ছ নামক জনৈক কুচক্রী ইয়াহুদীর মনে হিংসা জাগল। সে তাদের মধ্যকার পুরাতন শত্রুতা উস্কে দেয়ার দুষ্ট মানসে এক ইয়াহুদী যুবককে তাদের নিকট প্রেরণ করল। পরিকল্পনা মোতাবেক যুবকটি তাদের নিকট গিয়ে "বুআছ" যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করল এবং তখনকার বিবদমান দুই পক্ষের রচিত অপর পক্ষের কুৎসা সম্বলিত কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করল। ফলে আউস ও খাযরাজের মধ্যে এ সম্পর্কে কথা কাটাকাটি, উত্তেজনা এমনকি যুদ্ধের মনোভাব জাগ্রত হয়ে

উঠল। সাজ সাজ রব পড়ে গেল তাদের মধ্যে। দ্রুত এ ঘটনা রাসূলের গোচরীভূত হল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি তাদের নিকট গিয়ে তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা প্রশমিত করলেন। (আসবাবুন্নুযূল : ৯৯-১০০ পৃষ্ঠা)

মদীনার নবগঠিত সমাজের একটি বৃহৎ অংশ ছিল মুহাজিরদের। তারা ছিল ভিন্ন অঞ্চলের, ভিন্ন পরিবেশের ও ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। যার ফলে মদীনার মূল অধিবাসী-আনসারীদের সঙ্গে মুহাজিরদের স্বভাবগত বিভিন্নতার কারণে যে কোন সময়ে দ্বন্দ্ব ও বিবাদের সূত্রপাত ঘটতে পারত। সম্ভাব্য এরূপ সংঘাত এড়ানোর লক্ষ্যে মদীনায় আগমনের অব্যবহিত পরই রাসূল (সা.) আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে مُوَاخَاة (ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ)-এর বন্ধন স্থাপিত করেন। এর মধ্যে অন্যান্য আর বহু মনস্তাত্ত্বিক উপকারিতাও বিদ্যমান ছিল। ইবনে আবদিল বার-এর মতে রাসূল (সা.) মক্কাতেও মুহাজিরদের মধ্যে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। (সীরাতুল মোস্তফা : ১ম খণ্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা) আর পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদের সূত্রপাত না ঘটার ক্ষেত্রে এই বন্ধন কতটা কার্যকরী ছিল তাদের ইতিহাসই তার সাক্ষী।

সারকথা- নেতা দলীয় সদস্যদের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রশমিত করে তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করবেন, দ্বন্দ্বের উৎস বন্ধ করবেন এবং ঐক্য বজায় রাখার জন্য দলীয় সদস্য ও সমাজ সভ্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন। আর ঐক্য না থাকলে সমাজ ও দল কিভাবে বিপন্ন হয় একথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَاتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ.

অর্থাৎ, তোমরা পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদে লিপ্ত হয়ো না। তাহলে তোমাদের মাঝে সাহসহীনতা বিস্তার লাভ করবে এবং তোমাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়বে, তোমরা হীনবল হয়ে যাবে। (সূলা আনফাল : ৪৬)

২. মনোবল সৃষ্টি করা এবং অনুপ্রেরণা যোগানো

নেতা তার কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কর্মীদেরকে কাজের অনুপ্রেরণা যোগাবেন, তাদের মনোবল বৃদ্ধি করবেন, হতাশা স্থবিরতা যেন কর্মীদের মনকে আচ্ছন্ন করতে না পারে সেদিকে সচেতন দৃষ্টি রাখবেন। এই মনোবল ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনে কখনও তিনি

প্রাঞ্জল বা অগ্নিবর্ষী ভাষায় বক্তৃতা দিবেন। বিশেষত উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বা সংস্কার সাধনকারী নেতাকে বহু ক্ষেত্রে অপরিহার্যভাবেই এটা করতে হবে। কখনও নেতা কর্মীদেরকে আশার বাণী শোনাবেন, কখনও কষ্টকর কাজে কর্মীদের সাথে স্বশরীরে অংশীদার হয়ে বা উপস্থিত থেকে তাদেরকে উৎসাহিত করবেন। কর্মীদের যোগ্যতার মূল্যায়ন ও দক্ষতার স্বীকৃতি এবং উত্তম কাজের জন্য প্রশংসা বা পুরস্কৃত করার দ্বারাও বহু ক্ষেত্রে কর্মীদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তবে প্রশংসা বা পুরস্কার ক্ষেত্র বিশেষে বিরূপ প্রেষণাও সৃষ্টি করতে পারে। এ জন্য প্রশংসা ও পুরস্কারের মাত্রা এবং ক্ষেত্র উভয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও আচরণ মনোবিজ্ঞান অধ্যায়ে এ সম্পর্কে দলীল প্রমাণ সহকারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধের প্রাক্কালে যে খন্দক বা পরিখা খনন করা হয়েছিল, তা ছিল সাহাবায়ে কেরামের জীবনে এক অন্যতম কঠিন মুহূর্ত। মদীনা শহরের উত্তর ও পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে দীর্ঘ এবং সুগভীর পরিখা খনন করা হয়েছিল। শীতের মৌসুম ছিল। হিমেল হাওয়া চলছিল। আর সাহাবীদের অনেকেই ছিলেন একাধারে কয়েকদিনের অনাহারে ক্লিষ্ট জীর্ণশীর্ণ। এ মুহূর্তে সাহাবীদের সাথে রাসূল (সা.) স্বশরীরে খনন কার্যে শরীক হন এবং নিজ হাতে তাদের সাথে কোদাল চালান। খনন কার্যে রাসূল (সা.)-এর এই অংশিদারিত্ব কাজের প্রতি সাহাবীদের অনুপ্রেরণা, মনোবল ও উৎসাহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কত বেশী সহায়ক ছিল তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সাহাবীগণ আনন্দ বিহ্বল চিত্তে কবিতা আবৃত্তি পূর্বক খনন কার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন আর রাসূল (সা.)ও তাদের কবিতার উত্তরে কাব্য আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন। বোখারী, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমদের বর্ণনা অনুযায়ী পরিখার মধ্যে একটা কঠিন পাথর দেখা দেয়, যা ভাঙ্গার সাধ্য হচ্ছিল না করো, রাসূল (সা.) তিনটা আঘাতে পাথরটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। প্রথম আঘাতে পাথরটির এক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেলে রাসূল (সা.) বলে ওঠেনঃ আল্লাহু আকবার! শাম রাজ্যের চাবি আমাকে দেয়া হল (অর্থাৎ, দেশটি আমরা জয় করব) আল্লাহ্‌র কসম, এই মুহূর্তে শামের লাল প্রাসাদ আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

তৃতীয় আঘাতে শেষ অংশটি ভেঙ্গে গেলে তিনি বলেন, আল্লাহু আকবার! ইয়ামান দেশের চাবি আমাকে দেয়া হল, আল্লাহ্‌র কসম, "ছানআ"-এর দ্বার আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। বলা বাহুল্য-পরিখা খননের সেই সংকটময় মুহূর্তে রাসূল (সা.) কর্তৃক এসব দেশ বিজয়ের আশার বাণী শোনানো সাহাবীদের মনোবল, হিম্মত ও উৎসাহ সৃষ্টির অনুকূল ছিল নিঃসন্দেহে।

ইসলামের যুদ্ধ নীতিতে ইমামকে অধিকার দেয়া হয়েছে মুসলমানদের সামগ্রিক ও বৃহত্তর কল্যাণ বিবেচনায় তিনি যুদ্ধের ময়দানে বিশেষ কোন কৃতিত্ব প্রদর্শনকারীর জন্য পুরস্কার ঘোষণা করতে পারেন কিম্বা বৃহৎ দল থেকে পৃথক হয়ে কোন ক্ষুদ্র দল যদি বিশেষ কোন অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনার ঝুঁকি গ্রহণ করে, তাহলে উক্ত স্থান থেকে অর্জিত গনীমতের মাল থেকে এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালের জন্য রেখে দিয়ে অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ বা তিন পঞ্চমাংশ ইমাম তাদেরকে দিয়ে দিতে পারেন। আবার ইমাম বিশেষ কোন মুজাহিদকে যুদ্ধাঙ্গণে বিশেষ শ্রম নিবেদন ও দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য অতিরিক্ত কিছু সম্পদও দান করতে পারেন। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা : ২য় খণ্ড, জেহাদ অধ্যায়) বলা বাহুল্য-যুদ্ধের ময়দানে নেতা কর্তৃক গৃহীত এসব নীতি যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা, মনোবল ও উৎসাহ বৃদ্ধিতে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে।

সারকথা-নেতা কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য দলীয় সদস্য ও সমাজ সভ্যদের মনোবল বৃদ্ধি করবেন, তাদেরকে অনুপ্রেরণা যোগাবেন, তাদেরকে উৎসাহিত করবেন, তাদের মধ্যে হতাশা ও স্থবিরতা অনুপ্রবেশ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং মনোবল বৃদ্ধি ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক কৌশলাদি অবলম্বন করবেন। তাদেরকে আশার বাণী শোনাবেন এবং অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবেন, যাতে তাদের হতাশা কেটে যায়।

৩. বাস্তবমুখী কর্মসূচী প্রণয়ন

নেতাকে এমন কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে, যাতে তার দল ও সমাজের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে এবং যা তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে বিসদৃশ না হয়। প্রণিত কর্মসূচীতে আশা- আকাঙ্খার প্রতিফলন না ঘটলে তার প্রতি সমাজ ও দলীয় সভ্যদের অনীহা দেখা দিবে। আর তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে কর্মসূচী প্রণয়ন না করলে তার বাস্তবায়নে দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিকুল- তার সম্মুখীন হতে হবে।

মদীনায় আগমনের অব্যবহিত পরই রাসূল (সা.) তথাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের সাথে শান্তিচুক্তি স্থাপন করেন, যা 'মদীনা সনদ' নামে ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। পারস্পরিক সংঘাত-বিক্ষুদ্ধ সেই সমাজের জন্য এটা ছিল একদিকে সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতীক, অন্যদিকে মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাদের চিরশত্রু এবং তাদের উন্নয়নে ঈর্ষা-কাতর ইয়াহুদীদের সব রকম নাক গলানোর পথ প্রথম থেকেই বন্ধ করে দেয়ার এবং মুসলমানদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে কোন বিঘ্ন ঘটাতে না দেয়ার মত এক বিজ্ঞ রাজনৈতিক পদক্ষেপ। আর মদীনায় বিপুল সংখ্যক বহিরাগত মুহাজিরদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য রাসূল (সা.) গ্রহণ করেছিলেন– مُوَاخَات (মুওয়াখাত) [আনসারদের সাথে মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন]-এর কর্মসূচী।

৪. যত্ন ও দক্ষতার সাথে জবাবদিহিতার চেতনা নিয়ে কাজ করা

নেতাকে শুধু প্রতিভার অধিকারী হলে চলবে না, দক্ষতার সাথে স্বযত্নে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। নেতৃত্ব জনগণের দেয়া এক পবিত্র আমানত। এই আমানতের খেয়ানত তথা দায়িত্ব পালনে অবহেলার দরুণ নেতাকে জবাবদিহি করতে হবে, দুনিয়াতে জনগণের আদালতে জবাবদিহিতা এড়ানো গেলেও আখেরাতে কোন ক্রমেই তা এড়ানোর অবকাশ থাকবে না। যে নেতার মধ্যে এরূপ জবাবদিহিতার চেতনা সৃষ্টি হবে, সে কখনও স্বেচ্ছাচারী হতে পারবে না, দায়িত্ব পালনে অবহেলার মনোভাব আসবে না তার মধ্যে। এরূপ চেতনা সৃষ্টি করার জন্য সব রকম নেতার উদ্দেশ্যে হাদীছে বলা হয়েছে,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

অর্থাৎ, তোমাদের সকলেই (কোন না কোন ভাবে) তত্ত্বাবধায়ক, আর তোমাদের প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়ককেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। জনগণের যে নেতা, সেও তত্ত্বাবধায়ক, তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। (মুসলিম : ২য় খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা)

নেতৃত্বকে যেন কেউ যশ-খ্যাতি লাভের বা প্রভাব প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য অর্জনের একটা বিলাসী প্রক্রিয়া না ভাবে বরং সেটাকে একটা গুরু দায়িত্ব মনে করে দায়িত্ব পালনে যেন যত্নবান হয়-সে জন্য নেতৃত্বকে জনগণের আমানত বলে অভিহিত করা হয়। পূর্বে বলা হয়েছে "ইল্ম"-এর কারণে উলামায়ে কেরাম নেতৃত্ব লাভের যোগ্য, কিন্তু উলামায়ে কেরাম যেন নিজেদেরকে নেতা মনে করে অহমিকার শিকার না হয় সে জন্য আবার বলা হয়েছে,

اَلْعُلَمَاءُ اُمَنَاءُ الدِّيْنِ ... الخ অর্থাৎ, আলেমগণ দ্বীনের আমানতদার।

ইসলামের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতাকে রাষ্ট্রনায়ক নয় বরং "খলীফা" নামে অভিহিত করা হয়। খলীফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি অর্থাৎ, যাদের সে প্রতিনিধি তাদের নিকট তার জবাবদিহিতার দায়িত্ব রয়েছে। এই উপাধির মধ্যেই জবাবদিহিতার চেতনা সৃষ্টির একটা প্রচ্ছন্ন ভূমিকা রয়েছে।

৫. যোগ্য উত্তরসূরী গড়ে যাওয়া

একক প্রচেষ্টায় কোন নেতাই দলীয় কার্যক্রমকে অব্যাহতভাবে এবং সামগ্রিকতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন না। এ জন্য নেতাকে একদিকে সুদক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হয়, আবার নেতার অনুপস্থিতিতে কাজকে অব্যাহত রাখার জন্য এমনকি নেতার উপস্থিতিতেও কাজে ব্যক্তিগত সহযোগিতার জন্য কিছু আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ সহযোগীর প্রয়োজন হয়। এরূপ ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সহযোগীরা নেতার জীবদ্দশায় তাকে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে সু-পরামর্শ প্রদান ও আন্তরিক দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে, আবার নেতার ঘনিষ্ঠতা লাভের ফলে নেতৃত্ব প্রদানের কৌশল ও নিয়ম-নীতি সম্পর্কে তারা ওয়াকেফহাল হতে পারে। ফলে নেতার মৃত্যুর পর তারাই নেতার যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে কাজকে অব্যাহত গতিতে এবং একই ধারায় চালিয়ে নিতে সক্ষম হয়। নেতা যদি এরূপ ঘনিষ্ঠ এবং আন্তরিক সহযোগী বা একান্ত সু-পরামর্শদাতা নির্বাচনে ব্যর্থ হন তাহলে তার জীবদ্দশাতে যেমন তার নেতৃত্ব পদে পদে বিঘ্নিত বা ব্যাহত হতে পারে, তেমনি তার মৃত্যুর পর তার মন-মেজাযের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ও তার নেতৃত্বের কৌশল ও ধারা সম্পর্কে সম্যক অবগত উত্তরসূরী না থাকার ফলে দলীয় কর্মসূচীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে।

সারকথা-নেতাকে তার ঘনিষ্ঠ ও একান্ত সু-পরামর্শদাতা নিয়োগ করতে হবে, একান্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী রাখতে হবে এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য তাদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে; তাহলেই তার নেতৃত্বের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে। হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি সহীহ হাদীছে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন,

مَنْ وَلَّاهُ اللهُ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاَرَادَ بِهٖ خَيْرًا جَعَلَ لَهٗ وَزِيْرَ صِدْقٍ فَاِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهٗ وَاِنْ ذَكَرَ اَعَانَهٗ. (مجمع الزوايد. ج : ٥ ص : ٢١٠)

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে মুসলমানদের কোন বিষয়ের নেতৃত্ব দান করেন এবং তার (নেতৃত্বের) কল্যাণ চান তার জন্য সৎ ও যোগ্য পরামর্শ দাতার ব্যবস্থা করে দেন, ফলে তার কোন ভুল হলে সে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় আর স্মরণ থাকলে তার কাজে সহযোগিতা প্রদান করে। (মাজমাউয- যাওয়াইদ : ৫ম খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)

এ হাদীছে নেতৃত্বের কল্যাণময়তায় বা নেতৃত্বের সফলতায় সহযোগী সু-পরামর্শদাতার ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে।

সামাজিক অপরাধঃ উৎস ও প্রতিকার

মানুষ অপরাধ কেন করে, অপরাধের উৎস কি-এ সম্পর্কে নানান মত দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন অপরাধ প্রবণতা সহজাত-যাদের অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত হতে দেখা যায়, তাদের এরূপ কাজ না করে গত্যন্তর নেই। এ মত পোষণকারীদের মতে অপরাধীরা এমন সব দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যার ফলে অপরাধমূলক কাজ করার প্রবণতা এদের ভেতর প্রকটভাবে বিদ্যমান। এ ধারণার পক্ষে চৌর্য অপরাধ প্রবণতা (কষবঢ়ঃড়সধহরধ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়। যাদের ভেতর এরূপ প্রবণতা রয়েছে তারা নিজের অজ্ঞাতে বা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও চৌর্য কার্যে লিপ্ত হয়। এ মতবাদে বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা অনেক দাগী ও সিদ্ধহস্ত অপরাধীকেও অপরাধ মুক্ত সুস্থ সুন্দর জীবন ধারায় অভ্যস্ত হতে দেখা যায়। তাছাড়া ইসলামের দৃষ্টিতে সব শিশুই সুস্থ, সুন্দর, সৎ ও অনাবিল প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। হাদীছে বলা হয়েছে,

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

অর্থাৎ, সব নবজাতকই ইসলামী প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

কারও কারও মতে সমাজের অহেতুক বাধা নিষেধ মানুষকে অপরাধমূলক কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। সামাজিক নির্যাতন ও শোষণ অনেকের অপরাধমূলক কাজের জন্য দায়ী। অনেকে মনে করেন সামাজিক পরিবেশ মানুষকে অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। সৎ উপায়ে জীবিকা উপার্জনে বিফল হয়ে অনেকে অসদুপায়ে জীবিকা উপার্জনে ব্রতী হয়। ইসলামী চিন্তাধারায় শুধু সমাজ ও সামাজিক পরিবেশই নয় অসৎ সঙ্গ, পার্থিব মোহ, শয়তান ও নফসের কুমন্ত্রণা প্রভৃতি বহুবিধ কারণে অপরাধের চেতনা জাগ্রত ও প্রলুব্ধ হতে পারে। যাহোক অপরাধের কারণ বা উৎস যা-ই হোক না কেন অপরাধের কারণে সামাজিক যে সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে, সে সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিকার কি হতে পারে সেটাই হল মূল বিবেচ্য বিষয়। অপরাধ প্রতিকারের ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে দু'টি বিষয় মুখ্য–

১. ইসলামী আইনে অপরাধের শাস্তি ও শাস্তির পূর্বে মানসিকতা গঠন

দুষ্টের দমন ও অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের জন্য অনন্যোপায় অবস্থায় অপরাধ বিষয়ক আইন প্রয়োগের বিধান ইসলামে রাখা হয়েছে, তবে ইসলাম আইনের পূর্বে অপরাধ মুক্ত উন্নত জীবন গঠনের জন্য এবং আইন প্রদানের পর সে আইন যেন মানতে পারে তার জন্য মানসিকতা গঠনের সর্ব প্রযত্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় মদ ও জুয়া সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গ। তদানিন্তন আরবে মদের প্রচলন এত বেশী ছিল যে, মদ ব্যতীত কয়েক ঘন্টাকাল অতিবাহিত করাও তাদের পক্ষে ছিল প্রায় অসম্ভব। আর নেশার বস্তু পরিত্যাগ করা যে অত্যন্ত কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমতাবস্থায় একবাক্যে হঠাৎ করেই মদকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করা হলে তা মান্য করা কঠিনতর হত বৈ কি? ইসলাম তাই মদ্যপানকে পর্যায়ক্রমিক- ভাবে নিষিদ্ধ করেছে। প্রথম পর্যায়ে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ

অর্থাৎ, তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে

كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ اِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا.

মহাপাপ (মহাক্ষতি) আর মানুষের জন্য (সাময়িক) উপকারিতাও রয়েছে। তবে এগুলোর পাপ (ক্ষতি) উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। (বাকারা : ২১৯)

অত্র আয়াতে পরিস্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি বরং এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকটা তুলে ধরে এর প্রতি অনীহা সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নাযিল হয়–

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰرٰى.

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের ধারে কাছেও যেও না। (সূরা নিসা : ৪৩)

এ আয়াতে অল্প সময়ের জন্য মদকে হারাম করা হয়, তা হল নামাযের সময়। সম্পূর্ণ সময়ের জন্য নিষেধ করা হয়নি তবে ধীরমন্থর গতিতে সে দিকেই এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এভাবে অল্প সময় করে মদের অভ্যাস ছাড়তে ছাড়তে এবং মদের প্রতি অনীহা জমতে জমতে একটা পর্যায় এসেছে যখন মদকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করলে সে আইন মেনে নেয়া সম্ভব। তখন এ সম্পর্কিত চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয়েছে-ইরশাদ হয়েছে,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, নিশ্চিত জেনো যে, মদ, জুয়া, মূর্তি এবং জুয়ার জন্য তীর নিক্ষেপ এ সবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। অতএব এ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ পেতে পার। (সূরা মায়িদা : ৯০)

এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে, ইসলাম মন-মানসিকতা গঠন পূর্বক পর্যায়ক্রমে বদ-অভ্যাস ত্যাগ করানোর মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ইসলামী শরীআত মানুষের বদ-অভ্যাস সংশোধনের জন্য শুধু আইনকেই পর্যাপ্ত মনে করেনি বরং আইন প্রদানের পূর্বে মন-মস্তিষ্ককে আইন মানতে পারার মত প্রস্তুত করে নিয়েছে। আয়াতের মধ্যে লক্ষ্য

করলে দেখা যায়, একদিকে সংশ্লিষ্ট বদ-অভ্যাসের অপকারিতা তুলে ধরা হয়েছে, আবার তা পরিত্যাগ করার উপকারিতার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য কুরআন তার বর্ণনার স্বাভাবিক নীতি অনুসারে অপকারিতা ও উপকারিতার বিশদ বিবরণ প্রদানকে বর্জন করেছে।

বস্তুত জুয়া, মদ বা কোন ধরনের নেশায় যারা আসক্ত, তারা এগুলোর মধ্যে সাময়িক সুখকর অনুভূতি লাভ করে থাকে। জুয়াতে একবার হেরে গেলেও ভবিষ্যতে জয়লাভের প্রত্যাশায় মোহগ্রস্ত থাকে এবং তার আসক্তি টিকে থাকে। জুয়ার মধ্যে এই জয়লাভ এবং মদের মধ্যে এই সুখকর অনুভূতিকে আসক্তরা এক ধরনের পুরস্কার মনে করতে থাকে। তাই এদেরকে বদ-অভ্যাস ও নেশা থেকে বিরত করার জন্য এ সবের অপকারিতার দিকগুলো তাদের সামনে প্রকটাকারে তুলে ধরতে হবে। সাথে সাথে এগুলো পরিত্যাগ করলে তাদের উপকারিতা ও লাভ কি তাও তুলে ধরতে হবে, যেন সেই উপকারিতা ও লাভকে পুরস্কার প্রাপ্তি মনে করে তার জন্য ঐ বদ-অভ্যাস বা নেশা পরিত্যাগ করার সাময়িক কষ্টকে মেনে নেয়ার জন্য মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়।

এভাবে আইনের পূর্বে মন-মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং ইবাদত, আরাধনা, খোদাভীতি, তাকওয়া ও পরকালীন চিন্তা-চেতনা ভিত্তিক মানসিকতা গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তি থেকে অপরাধ সংঘটনের প্রবণতাকেই অবদমিত করে দেয়ার প্রতি ইসলাম অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। বস্তুত আইন-কানুন দিয়ে মানুষকে শোধরানো যতটা সম্ভব, তার চেয়ে খোদাভীতি ও পরকালীন চিন্তা- চেতনা দিয়েই অধিকতর সম্ভব। বরং শাসনের ডান্ডা এবং আইনের রক্তচক্ষু এড়িয়ে গোপনে নিভৃতে পর্দার অন্তরালে মানুষ অপরাধ সংঘটিত করতে পারে, কিন্তু পরকালীন চিন্তা-চেতনা সর্বাবস্থায় তাকে নিরাপরাধ থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। একই কারণে ইসলাম নৈতিক গুণে ভূষিত হওয়ার প্রতি বেশী উৎসাহিত করেছে। নৈতিক গুণের সহজাত প্রভাবে অপরাধের চেতনা হ্রাস পাবে বৈকি। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, উদারতা প্রভৃতি নৈতিক গুণ বহু ক্ষেত্রেই অপরাধ সংঘটনের প্রবৃত্তিকে দমন রাখতে সক্ষম হয়। আইনের আশ্রয় দ্বারা বহু ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি পেতে পারে, পক্ষান্তরে এসব নৈতিক গুণ আইনগত জটিলতার থেকে নিস্কৃতি দিতে পারে। এসব নৈতিক গুণের সহজাত প্রভাবে প্রতিপক্ষকেও মানসিকভাবে অনুগত করা সহজ হয়। ইসলাম তাই

আইন অপেক্ষা নৈতিকতার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে বেশী এবং নৈতিকতার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে অধিক। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ.

অর্থাৎ, যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। আর যদি সবর কর তবে তা সবরকারীদের জন্য উত্তম। (সূরা নাহ্‌ল : ১২৬)

আয়াতের সারকথা হল- প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আইনের আশ্রয় নেয়া যেতে পারে, তবে সবর করা তথা ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনই উত্তম। অত্র আয়াত উল্লেখ করার দ্বারা শুধু এতটুকুই দেখানো উদ্দেশ্য যে, ইসলাম নৈতিক গুণে ভূষিত হওয়ার ব্যাপারে কত বেশী তাগিদ প্রদান করেছে।

তবে মানসিকতা গঠনের এবং নৈতিক গুণে ভূষিত করার সর্বপ্রযত্ন চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি দ্বারা এমন কোন অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায় যা দেশ, সমাজ ও বৃহত্তর স্বার্থের তাগিদে শাস্তির দাবী রাখে, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই শাস্তি প্রয়োগের বিধান ইসলাম রেখেছে। তবে ইসলামী আইনের এমন কিছু মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা মানব রচিত অন্যান্য আইনের মধ্যে অনুপস্থিত।

২. সাহচর্য ও সঙ্গ প্রসঙ্গ

মানুষের আচার-আচরণ ও মনোভাবের উপর সমাজ, পরিবেশ ও সাহচর্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। অপরাধের মনোবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার পশ্চাতেও এই সংগদোষ অনেকাংশে দায়ী। ডাকাত দলের সাথে উঠাবসা করতে করতে ডাকাতির মনোবৃত্তি জাগ্রত হয়, দার্শনিক বিজ্ঞানীদের সাহচর্যে থাকলে চিন্তা-গবেষণার মনোভাব সৃষ্টি হয়। আস্তিকের সংস্পর্শে আস্তিক হয় আর নাস্তিকের সংস্পর্শে নাস্তিক্য জন্ম নেয়। কুরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا

অর্থাৎ, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের

فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ.

সাথে বসবে না। অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। (সূরা নিসা : ১৪০)

এ আয়াতে সাহচর্যের অনস্বীকার্য প্রভাব বর্ণিত হয়েছে।

নেককার ও ভাল মানুষ হওয়ার জন্য সাহচর্যের নির্দেশ দিয়ে কুরআনে কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর (মুত্তাকী হয়ে যাও) এবং সত্যপন্থীদের সাহচর্যে থাক। (সূরা তাওবা : ১১৯)

এ আয়াতে সত্যপন্থী তথা প্রকৃত নেককারদের সাহচর্য গ্রহণের মাধ্যমে তাকওয়া পরহেযগারী লাভ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

হাদীছে সৎ লোকের সাহচর্য গ্রহণকারীকে মেশ্‌ক বহনকারীর সাথে আর অসৎ লোকের সাহচর্য গ্রহণকারীকে হাপরে বাতাস প্রদানকারী কামারের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। (মুসলিম : ২য় খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ, মেশক বহনকারীদের নিকট গমনকারী যেমন মেশ্‌ক ক্রয় না করলেও অন্তত তার সুগন্ধি সে লাভ করতে পারবে, তদ্রূপ সৎলোকের সাহচর্য গ্রহণকারীর কিছু না কিছু উপকার হবেই। আর কর্মকারের নিকট গমন করলে হয়ত তার কাপড়ে আগুন লেগে জ্বলে যাবে, নতুবা অন্তত উৎকট দুর্গন্ধ অবশ্যই তাকে পেতে হবে। তদ্রূপ অসৎ লোকের সাহচর্য কিছু না কিছু ক্ষতি সাধন করবেই। এ হাদীছে সাহচর্যের অনস্বীকার্য প্রভাব বর্ণিত হয়েছে।

অতএব অপরাধীকে সংশোধনের একটা অন্যতম কার্যকরী পন্থা হল অপরাধ মুক্ত সৎলোকের সাহচর্যে প্রেরণ ও তাদের সহাবস্থানে রাখার ব্যবস্থা করা। মুসলিম শরীফে (দ্বিতীয় খন্ডের ৩৫৯ পৃষ্ঠায়) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছে জনৈক অপরাধীর সংশোধনের উপরোক্ত পন্থা বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীছে বর্ণিত কাহিনীর সার সংক্ষেপ হল- পূর্বের যুগে জনৈক ব্যক্তি একশতটা হত্যাকান্ড ঘটানোর পর তৎকালীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম-জ্ঞানীর নিকট তার সংশোধনের পন্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তাকে পরামর্শ দেন যে, যে অঞ্চলে থেকে এবং যাদের সংস্পর্শে থেকে অপরাধে অভ্যস্ত হয়েছ, তা ত্যাগ পূর্বক সৎ ও আবেদ (ইবাদতকারী) লোক অধ্যুষিত অমুক অঞ্চলে গমন কর.......।

এছাড়া অপরাধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রয়োগের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। তবে ইসলামী আইনের মধ্যে অপরাধ প্রতিরোধের যে ক্ষমতা রয়েছে, মানব রচিত আইনের মধ্যে সে ক্ষমতা অনুপস্থিত। ইসলামী আইনের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করলে বিষয়টি অত্যন্ত পরিস্কার হয়ে উঠবে।

ইসলামী আইনের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. আইন মানার জন্য মানসিকতা গঠন

বস্তুত আইনের সফল প্রয়োগ ও সর্বস্তরে আইনের বাস্তবায়ন ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আইন মান্য করার চেতনা জাগরিত না হয়। ইসলাম তাই প্রতিটি আইন প্রদানের সাথে সাথে তার পার্থিব অপার্থিব উপকারিতা বা অমান্য করার ক্ষতির কথাও তুলে ধরেছে, যাতে উক্ত আইন মানার জন্য মানসিকতা প্রস্তুত হয়। যেমনঃ "কেছাছ" বা হত্যার বদলে হত্যাদণ্ড প্রদানের বিধান বর্ণনার সাথে সাথে বলা হয়েছে,

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ.

অর্থাৎ, এই কেছাছ (আইন)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য প্রাণ রক্ষার মহাব্যবস্থা রয়েছে। (সূরা বাকারা : ১৭৮)

কেননা হত্যার বদলে হত্যার এই প্রতিবিধান না করা হলে হত্যাকারী ও নিহতের আপনজনদের মধ্যে হত্যা পাল্টা হত্যার ধারা চলতে থাকত, ফলে অসংখ্য হত্যাকান্ড ঘটতে পারত; আর কেছাছের বিধান হত্যার সেই বল্গাহীন ধারাকে বন্ধ করতে সক্ষম। এমনিভাবে চুরি, ডাকাতি, যেনা, যেনার অপবাদ আরোপ প্রভৃতি অপরাধের যে "হদ্দ" বা শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে কিম্বা অন্যান্য অপরাধের যে দন্ড (তা'যীরাত) বিধান করা হবে সে সব শাস্তি দুনিয়াতে ভোগ করা হলে পরকালে সেসব অপরাধের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে বলে তিরমিযী-তে বর্ণিত একটি হাদীছে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা মানুষকে এসব আইন ও শাস্তি মেনে নেয়ার জন্য উৎসাহিত এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। কেননা বৃহত্তর জনস্বার্থ উদ্ধার বা পরকালে শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ এক ধরনের পুরস্কার, আর পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় সাময়িক যে কোন কষ্ট স্বীকার করতে মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানুষ প্রস্তুত হয়ে যায়। এই মনস্তাত্ত্বিক নীতি গ্রহণের

ফলেই রাসূল (সা.)-এর যুগে চুরি করে, যেনা করে স্বেচ্ছায় রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে শাস্তির জন্য নিজেকে পেশ করার অনন্য ইতিহাস আমরা দেখতে পাই।

২. জনসমক্ষে শাস্তি প্রয়োগ

বস্তুত শাস্তি প্রয়োগ কেবল অপরাধীকেই অপরাধ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে নয় বরং শাস্তি প্রত্যক্ষ করে অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে অন্যদের মনেও যেন ভীতির সঞ্চার হয় এবং এভাবে ভবিষ্যতে অপরাধ হ্রাস পেতে থাকে-এটাও উদ্দেশ্য বরং এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। আর বলা বাহুল্য-এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনসমক্ষে শাস্তি প্রয়োগের রীতি যতটা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে, গোপনে লোক চক্ষুর অন্তরালে শাস্তি প্রয়োগ দ্বারা তা সম্ভব নয়। ইসলামে তাই সব শাস্তি বিশেষত "হুদূদ" (শরীআতের নির্ধারিত শাস্তি) প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাতে শাস্তি প্রত্যক্ষ করার ফলে জনগণের মনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে তারা সতর্ক হয়ে যায়। যেমন ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ, তাদের (ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর) শাস্তির সময় একদল মু'মিন যেন উপস্থিত থাকে। (সূরা নূর : ২)

বলা বাহুল্য- স্বচক্ষে শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে মনের মধ্যে যে ভীতির সঞ্চার হয়, লোকমুখে কিংবা পত্র-পত্রিকার সংবাদ মাধ্যমে জানা দ্বারা তা হয় না। অনেকে জনসমক্ষে শাস্তি প্রদানকে মানবতা বিরোধী বলে আখ্যায়িত করতে পারেন, কিন্তু যেখানে মৃত্যুর শাস্তিই দেয়া হল কিংবা দন্ডিতই করা হল, আবার তা অপরাধেরই কারণে, সেখানে মানবতা বিরোধী হওয়ার প্রশ্ন কেন তা বোধগম্য নয়। বরং এর দ্বারা যদি আরও হাজার মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার ঘটানো যায় এবং এভাবে তাদেরকে অনুরূপ অপরাধ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয় সেটাই কি বৃহত্তর মানবতার অনুকূল নয়? ইসলামে চুরি-র যে শাস্তি হাত কাটা, তাও মূলতঃ অন্যকে শিক্ষাদান ও অন্যের মধ্যে চৌর্যবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হওয়ার মানসিকতা গঠনে অনন্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাই দেখা যায় এই শাস্তি যখন প্রয়োগ করা হয়েছে, তখন দু'একজনের অধিক চোরকে আর হাত কাটার জন্য পাওয়া

যায়নি। এখানে এক ব্যক্তিকে আজীবন জনসমক্ষে হেয় করার প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে, কিন্তু এরূপ না করার পরিণতিতে আরও হাজার চোর যে লক্ষ মানুষের দুর্দশার কারণ হয়, সেটা কি সম্পূর্ণই উপেক্ষণীয়? বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদে ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিহার করার নীতি বাস্তবায়িত না হলে সমাজের যে কি করুণ দশা হয় তা-তো বিশ্ববাসী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। অতএব বলা যায়-জনসমক্ষে শাস্তি প্রয়োগের ইসলামী নীতি মনোবিজ্ঞান সম্মত এবং অপরাধ উৎখাতের ক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্যকরী। আর অপরাধ উৎখাত হলেই কল্যাণ সাধিত হয়।

৩. আইনের ত্বরিৎ প্রয়োগ

আইন প্রয়োগ ও বিচারকার্যে বিলম্ব বা দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অনেকগুলো মনস্তাত্ত্বিক নেতিবাচ্যতা দেখা দেয়। বিচারের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন অতিবাহিত হতে থাকায় অপরাধের শাস্তির প্রতি ঔৎসুক্য স্তিমিত হয়ে যায়। ফলে বিলম্বে প্রদত্ত শাস্তি মানুষের মনে প্রভাব ফেলে কম, যা অপরাধ বিরোধী চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে শাস্তির ভূমিকাকে হ্রাস করে দেয়। তদুপরি দীর্ঘদিন যাবত একটি অপরাধের বিষয় আলোচনা পর্যালোচনা চলতে থাকায় বিচারকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনেও অপরাধটি লঘু মনে হতে পারে এবং এরূপ হলে বিচারকার্যের গাম্ভীর্য প্রভাবান্বিত হওয়ার বিষয়টি একেবারে নাকচ করে দেয়া যায় না। বিচার পাওয়ার বিষয়টি বিলম্বিত হওয়ার এবং ইত্যবসরে মামলা পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকায় অনেক নির্ঝঞ্ঝাট ও বিত্তহীন পক্ষ আইনের আশ্রয় গ্রহণের ব্যাপারে অনীহার শিকার হয়ে যান। এতে করে একদিকে আইনের আশ্রয় না নিয়ে অন্যভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে-যা অরাজকতা ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, অন্যদিকে কোনভাবেই অপরাধের শাস্তি গৃহীত না হলে অপরাধ উৎসাহিত হয়।

এছাড়া বিচারকার্যে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অন্যান্য ক্ষতির দিকগুলোতো রয়েছেই, যেমন: মামলা পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিত্তহীন বাদী বা বিবাদী পক্ষকে সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে হয়। এমনকি বিত্তশালী পক্ষ বিত্তহীন প্রতিপক্ষকে জব্দ করার জন্য অনেক সময় বার বার তারিখ ফেলানোর অপকৌশল প্রয়োগ করে থাকে। আবার পেশাদার অসাধু উকীলদের পক্ষে বার বার তারিখ ফেলানোর কৌশল সৃষ্টি করত

মক্কেলদের পকেট উজাড় করার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং ইত্যবসরে অসাধু পক্ষ জালিয়াতির বিভিন্ন ফাঁক ফোকড় বের করারও সুযোগ করে নিতে সক্ষম হয়।

এসব কারণে ইসলামে বিচার ব্যবস্থায় কোন দীর্ঘসূত্রিতা রাখা হয়নি। ইসলামী আইনে তাই কেউ উকীল গ্রহণে বাধ্য নয় এবং ওকালতীকে ইসলাম পেশা হিসেবে মূল্যায়নও করেনি। আর বলা বাহুল্য-পেশাদার উকীলদের কথার মার-প্যাঁচই বিচারকার্য বিলম্বিত হওয়ার অন্যতম কারণ। ইসলামী বিচারের ইতিহাসে বিনা প্রয়োজনে এরূপ তারিখ ফেলানোর প্রবণতাও দেখা যায় না বরং বিচারকের দরবারে কোন বিচার আসার সাথে সাথেই যথা সম্ভব শীঘ্রই তিনি সমাধান ও ফয়সালা করে দিবেন।

৪. ইসলামী আইনে ঢালাওভাবে জেল-ব্যবস্থা নেই

ইসলামে ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি কেছাছ-এর পর চুরি, কোন সতী স্বাধ্বী নারীর প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ, মদ্যপান ও যেনা এই চারটি অপরাধের শাস্তিও নির্দ্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, যাকে ইসলামী আইনের ভাষায় "হুদূদ" বলা হয়। এছাড়া অন্যান্য অপরাধের শাস্তি এভাবে নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি বরং সে সব ক্ষেত্রে শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অথবা অপরাধের অবস্থা, গুণাগুণ, পরিবেশ ও পরিস্থিতি ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে পরিমাণ শাস্তিকে অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট মনে করবেন সে পরিমাণ শাস্তির রায় দিবেন। এ ধরনের শাস্তিকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় "তা'যীরাত" বা দন্ড বলা হয়। এই তা'যীরাতের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে জেল-শাস্তিও সঙ্গত বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু ঢালাওভাবে সব অপরাধের জন্য জেল সাজা প্রদান কোন ক্রমেই ইসলামে সমর্থিত নয় এবং তা অপরাধ দমনের অনুকূল মনোবিজ্ঞান সম্মত পন্থাও নয়। সাহচর্যের ফলে মনোভাবের সংক্রমণ সংক্রান্ত মনস্তাত্ত্বিক নীতি এবং অভিজ্ঞতার আলোকেও তাই দেখা যায়-চোর, ডাকাত, বদমাশ প্রভৃতি অপরাধীদের জেলখানায় সহাবস্থানের ফলে তাদের অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায় না বরং বহুমুখী অপরাধীদের সহাবস্থানের ফলে জেল-আসামীদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার সংক্রমণ ও বিস্তৃতি ঘটে এবং জেল-সাজা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পর তারা পূর্বের চেয়ে অধিক হারে অপরাধ ঘটাতে থাকে।

তাছাড়া ব্যাপক হারে জেল-সাজার ব্যবস্থার ফলে জেল প্রশাসন বিস্তৃত হয় এবং তার জন্য জাতীয় অর্থের বিপুল গচ্চা দিতে হয়, তাও আবার অপরাধীদের জন্য। পক্ষান্তরে ইসলামী সাজা প্রদান করা হলে একদিকে যেমন অপরাধীদের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেত না, জাতীয় অর্থের অনেকটা সাশ্রয় হত, অপর দিকে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জেলে আবদ্ধ থাকার কারণে তাদের পরিবার পরিজনকেও মানবেতর বা অসামাজিক জীবন যাপন করতে হত না।
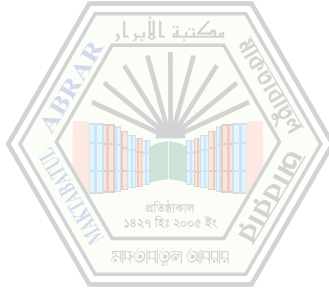
দশম অধ্যায়

চরিত্র মনোবিজ্ঞান
(Character Psychology)

চরিত্র কাকে বলে

অনবরত কোন কাজ করার ফলে মানবীয় সংকল্প যদি সে কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তা অভ্যাসে পরিণত হয়, তাহলে ঐ অভ্যাসকে চরিত্র বলা হয়। সাময়িক আকর্ষণের ভিত্তিতে কোন কাজ করা হলেই যদি তা স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা লাভ না করে তাহলে সেই আকর্ষণকে চরিত্র বলা যাবে না। যেমন: কোন ব্যক্তি হঠাৎ করে দান খয়রাতের দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং বেশ দান খয়রাতও করে বসল, কিন্তু তাতে অভ্যস্ত হওয়ার পূর্বেই পুনরায় সম্পদ পূঞ্জিভূত করার চেতনায় দান খয়রাত থেকে হাত গুটিয়ে নিল, তাহলে ঐ দান খয়রাতকে তার দানশীল চরিত্র বলা যাবে না।

চরিত্রের সাথে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক

চরিত্রের সাথে মনোবিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, মনোবিজ্ঞানে আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা কল্পনা, অনুমান, অভিপ্সা, বোধ, বিবেচনা, ইচ্ছা স্মৃতি ইত্যাদি যে সব নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে তার কোনটিকে বাদ দিয়ে চরিত্র বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা যায় না। মনস্তত্ব হল চরিত্র বিদ্যার ভূমিকা স্বরূপ। কোন কাজে মানবীয় সংকল্পকে অভ্যস্ত করতে হলে তার আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা, বিবেক, বিবেচনা, প্রেষণা সব কিছুরই যে ভূমিকা থাকে তা আর ব্যাখ্যা করে বোঝানোর প্রয়োজন নেই।

চরিত্রে বংশগতির প্রভাব

মানুষের শরীরের রঙ, চুলের ধরন, দাঁতের গঠন, চোখের রঙ ইত্যাদি দৈহিক গড়ন ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে যেমন বংশগতির প্রভাব রয়েছে, তদ্রূপ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সম্ভাবনা এবং স্বভাবও পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়ে থাকে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে সন্তান ও পিতা-মাতার বা পূর্বপুরুষদের স্বভাবজাত গুণাবলীর মধ্যে বিরোধও থেকে থাকে, তবে অধিকাংশ স্বভাবজাত গুণাবলী যে পূর্বপুরুষদের স্বভাবের প্রতিধ্বনি তা অনস্বীকার্য। এজন্যেই ভাল সন্তান চাইলে ভাল

মাতা-পিতা হতে হবে। চরিত্রে বংশগতির প্রভাবের বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায় নিম্নোক্ত হাদীছে। রাসূল (সা.) বলেছেন,

اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْجاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ. (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

অর্থাৎ, মানুষ সোনা রূপার খনির ন্যায়। তোমাদের মধ্যে যারা জাহেলিয়া (ইসলাম পূর্ব) যুগে উত্তম গুণের অধিকারী ছিল তারা ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পরও উত্তম গুণেরই অধিকারী থাকে।

হযরত মাওলানা হেফজুর রহমান সিওহারবী বলেছেন, এ হাদীছটি নিঃসন্দেহে বংশগত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলীর উত্তরাধিকারের প্রতি ইঙ্গিত করছে। (নীতিদর্শন: মূল হেফজুর রহমান সিওহারবী) হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ (রহ.)ও হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। কুরআনের একটি আয়াতেও বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ.

অথাৎ, তুমি বলে দাও, প্রত্যেকেই নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে। (সূরা বানী ইসরাঈল : ৮৪)

এখানে "পদ্ধতি" (شَاكِلَة) কথাটিকে রীতি ও অভ্যাস অর্থে যেমন নেয়া যায়, তেমনি স্বভাব ও প্রকৃতি অর্থেও নেয়া যেতে পারে। এই দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করা হলে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে আয়াতটি দলীল হয়ে দাঁড়াবে।

চরিত্রে পরিবেশের প্রভাব

মানুষের চরিত্রে বংশগতির যেমন প্রভাব রয়েছে, তদ্রূপ মানুষের ব্যক্তিত্ব, তার গুণাবলী ও চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশেরও প্রয়োজন রয়েছে। মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে স্বভাব ও গুণাবলী অর্জন করে সত্য, কিন্তু বিকশিত স্বভাব ও পরিপক্ক গুণাবলী লাভ করে না। উত্তরাধিকার সূত্রে কোন চরিত্র বা গুণের মৌলিক যোগ্যতা লাভ করা যায় কিন্তু সেটা বিকশিত ও পরিপক্ক হয় পরিবেশের সাহায্যে। তাই বলা যায় মানুষের চরিত্র হচ্ছে বংশগতি ও পরিবেশের যুগ্ম ফসল। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের পরিস্ফুটনে বংশগতি ও পরিবেশ যৌথভাবে কাজ করে থাকে।

পরিবেশ যদি প্রতিকূল হয় বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তাহলে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা সুপ্ত শক্তি বা যোগ্যতার আত্মপ্রকাশ বিলম্বিত হতে পারে। পক্ষান্তরে পরিবেশের আনুকূল্য পেলে তা শীঘ্রই বিকশিত হবে।

চারিত্রিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে যেমন নীতিটি প্রযোজ্য, তদ্রূপভাবে চারিত্রিক রোগের বেলায়ও তা প্রযোজ্য। জন্মগত সূত্রে যে চারিত্রিক রোগের যোগ্যতা লাভ হবে তা তখনই বিকশিত হবে যখন সেটি পরিবেশের আনুকূল্য পাবে, অন্যথায় সেটি সুপ্ত থাকবে। যেমন একটি সন্তান তার পিতা থেকে অহংকার বা মদ্য পানের প্রতি ঝোঁক ইত্যাদির যোগ্যতা উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করল; এখন পরিবেশের উপরই তার এ রোগের বিকশিত হওয়া না হওয়া নির্ভর করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে পরিবেশ বলতে বোঝায় মানুষের চারিদিকের প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক অবস্থা; কিন্তু মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় পরিবেশ কথাটির অর্থ আরও ব্যাপক। পরিবার, সমাজ, সংসর্গ, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি যে কোন অবস্থা বা যে কোন ঘটনা-যা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে- মনোবিজ্ঞানে তা সবই পরিবেশের অঙ্গ বলে গণ্য।

পূর্বে যে আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ–

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ.

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও প্রত্যেকেই নিজ পদ্ধতি অনুসারে কাজ করে থাকে। (সূরা বানী ইসরাঈল : ৮৪)

এ আয়াতে "পদ্ধতি" (شَاكِلَة) কথাটির তাফসীর প্রসঙ্গে স্বভাব, অভ্যাস, প্রকৃতি, নিয়ম ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে; সবগুলোর সারমর্ম হল পরিবেশ অর্থাৎ, পরিবেশ অনুসারে প্রত্যেকের অভ্যাস ও মানসিকতা গড়ে ওঠে এবং সে অনুযায়ীই প্রত্যেকে কাজ করে থাকে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ, তোমরা তাকওয়ার গুণ অর্জন কর এবং সত্যপন্থীদের সাহচর্যে থাক। (সূরা তওবা : ১১৯)

এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যপন্থীদের সাহচর্যে তাকওয়ার চরিত্র লাভ হয়ে থাকে। এখানে পরিবেশের প্রভাবকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

হাদীছে ভাল লোকের সাহচর্যের উপমা দেয়া হয়েছে আতর বিক্রেতার সাথে, যার কাছ দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে আতর ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকলেও কিছুটা সুগন্ধি লাভ হবে। আর মন্দ লোকের সাহচর্যের উপমা দেয়া হয়েছে কামারের সঙ্গে, যার কাছে কেউ গেলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু ছাই ও উৎকট গন্ধ লাগবেই। তদ্রূপ ভাল লোকের সাহচর্যে ভাল প্রভাব এবং মন্দ লোকের সাহচর্যে মন্দ প্রভাব কিছু না কিছু হবেই।

শুধু মানুষের সাহচর্যের প্রভাব নয় মানব চরিত্রে অবলা প্রাণীর সাহচর্যেরও প্রভাব পড়ে থাকে। বকরী নম্র ও বিনয়ী, তাই বকরীর রাখালের মধ্যে এর প্রভাব পড়ে থাকে। উট কঠোর স্বভাবের, তাই উটের সাহচর্যে অবস্থানকারীর মন শক্ত হয়ে থাকে। ঘোড়ার সাহচর্যে অহংকার দেখা দিয়ে থাকে। এক হাদীছে এরূপ প্রভাবের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে,

اِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوْبِ فِى الْفَدَّادِيْنَ عِنْدَ اُصُوْلِ اَذْنَابِ الْاِبِلِ.

অর্থাৎ, অন্তর শক্ত ও মনের পর্দা পুরু হয়ে যায় প্রচুর উটের মালিকদের, যখন তারা উটের লেজের গোড়ায় অবস্থান করে। (মুসলিম : ১ম খণ্ড)

আর এক হাদীছের এক অংশে বলা হয়েছে,

اَلسَّكِيْنَةُ فِيْ اَهْلِ الْغَنَمِ.

অর্থাৎ, বকরীওয়ালাদের মধ্যে বিনয় নম্রতা পাওয়া যায়। (মুসলিম : ১ম খণ্ড)

আর এক রেওয়ায়েতের এক অংশে বলা হয়েছে,

اَلْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِى الْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْخَيْلِ وَالْوَبَرِ.

অর্থাৎ, অহংকার ও রিয়া পাওয়া যায় ঘোড়ার মালিক পল্লীবাসীদের মধ্যে। (মুসলিম : ১ম খণ্ড)

চরিত্রে চেষ্টা ও প্রশিক্ষণের প্রভাব

চরিত্রের মৌলিক গুণাবলী যদিও উত্তরাধিকারের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে; তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, চরিত্রে চেষ্টা ও প্রশিক্ষণেরও প্রভাব রয়েছে। এরূপ প্রভাব রয়েছে বলেই একই গোত্রের বিভিন্ন মানুষের

মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। প্রসিদ্ধ চরিত্র বিশেষজ্ঞ ইবনে কাইয়্যেম এ প্রসঙ্গে বলেছেন, যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, চরিত্র অর্জনে চেষ্টার কোন হাত আছে, না কি এটা চেষ্টা-প্রচেষ্টার গন্ডি বহির্ভূত? তাহলে তার জবাব হল-নিঃসন্দেহে চরিত্র অর্জনে চেষ্টার হাত রয়েছে। চেষ্টা সাধনা দ্বারা অনেক গুণ অর্জিত হয়, পরবর্তীতে সেগুলো অভ্যাসে পরিণত হয়। (নীতি দর্শন-মাদারিজুস সালেকীন) আবার পূর্বের অনেক অভ্যাস চেষ্টা সাধনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে পারে। আর অভ্যাসকেই তো চরিত্র বলা হয়। তাহলে বোঝা গেল চেষ্টা সাধনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চরিত্রের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

অভ্যাস তথা চরিত্র পরিবর্তনের নীতিমালা

কোন অভ্যাসের মূল উৎস হল আকর্ষণ। প্রথমে কোন জিনিসের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তারপর সে আকর্ষণকে কার্যকরী রূপ দেয়া হয়। এই কার্যকরী রূপটিকে উপর্যুপরি বাস্তবায়িত করতে থাকলে তখনই সেটাকে অভ্যাস নামে অভিহিত করা হয়। অতএব কোন খারাপ অভ্যাস তথা খারাপ চরিত্রকে পরিবর্তন করতে হলে প্রথমেই সে অভ্যাসের মূলে যে আকর্ষণ রয়েছে সেই আকর্ষণের মোকাবিলা করতে হবে এবং এর জন্য বিপরীত আকর্ষণের প্রতি সংকল্পকে শক্তিশালী করতে হবে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, মনের মধ্য থেকে বদ্ধমূল কোন আকর্ষণ খুব তাড়াতাড়ি মূলোৎপাটিত হয় না, তার জন্য সময় লাগে। তাই কোন বর্জনীয় অভ্যাস তথা তার আকর্ষণকে মূলোৎপাটিত করতে গিয়ে তাড়াহুড়া করা উচিৎ নয়। এ জন্যেই পুরানো ক্ষতিকর অভ্যাসের বিরুদ্ধে ত্বড়িৎ মুখোমুখী সংঘাত সমীচীন নয় বরং এমন পন্থায় ক্ষতিকর আকর্ষণগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া সমীচীন, যাতে মন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সহ্য করে নিতে পারে। আর এটা সম্ভব যদি ধীরে ধীরে পুরাতন আকর্ষণের বিরুদ্ধে বিপরীত কোন ভাল আকর্ষণকে দাঁড় করানো হয় এবং আস্তে আস্তে ভাল আকর্ষণকে কার্যকরী রূপ দিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে স্বভাবকে তার প্রতি সহনীয় ও অভ্যস্ত করে তোলা হয়।

খারাপ অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য আর একটি করণীয় হল-খারাপ অভ্যাস বর্জন করার জন্য যে কষ্ট হবে তা সহ্য করার জন্য মনকে দীর্ঘ মেয়াদী প্রস্তুত রাখা। এভাবে আস্তে আস্তে কষ্টবোধও লাঘব হবে এবং খারাপ অভ্যাস থেকেও অব্যাহতি লাভ করা যাবে।

যে কোন অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য সংকল্প হচ্ছে প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিষয়। সংকল্পের দুর্বলতা থাকলে কখনই মানুষ কিছু করতে সক্ষম হয় না। তাই যে কোন অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য সংকল্প গ্রহণ ও এর উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হতে হবে।

সংকল্পের পূর্বে যে কাজটি করতে হবে তা হল চিন্তা-ভাবনা ও ফিকির। 'নীতি দর্শন' গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী মনস্তাত্ত্বিক বিধানে একথাটি স্বীকৃত যে, যখন কোন চিন্তা মানুষের মস্তিষ্কে আসে এবং মস্তিষ্ক তা গ্রহণ করে বার বার তার প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি দিতে থাকে, তখন সে চিন্তাই মস্তিষ্ককে কর্মের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। মানুষের মস্তিষ্কে যখন চিন্তাটি প্রথমবার উদিত হয় তখন যেন তার প্রভাবের একটি মামুলী রেখা চিহ্ন মস্তিষ্কে অংকিত হয়ে যায়, অতঃপর বার বার প্রভাব বিস্তারের ফলে সে চিহ্নটি গভীরতর হয় এবং সহজেই মস্তিষ্কে তার অবস্থান করে নেয়। অবশেষে এই চিন্তা কর্মের সুফল বয়ে আনে এবং ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে কাজটি অভ্যাসে পরিণত হয়।

আবার কখনো এমন হয় যে, প্রথমে চিন্তার কোন প্রভাব মস্তিষ্কে পড়ে না, কিন্তু বার বার মন্থন করার ফলে মস্তিষ্ককে প্রভাবান্বিত করে ফেলে, ফলে মস্তিষ্ক তার অভিপ্রায় অনুসারেই কাজ করতে থাকে।

সারকথা- অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য করণীয় হল:

(১) অভ্যাস পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা।

(২) সংকল্প গ্রহণ।

(৩) মনকে খারাপ অভ্যাস বর্জনের কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত করা।

(৪) অভ্যাসের পশ্চাতে যে আকর্ষণ রয়েছে তার মোকাবিলা করা এবং এ জন্য বিপরীত একটি আকর্ষণের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা।

(৫) কোন আকর্ষণকে মূলোৎপাটিত করার জন্য তাড়াহুড়া না করা বরং ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া।

বি. দ্র. উপরোক্ত বিষয়ের আরও কিছু বিস্তারিত বিবরণ ও দলীল প্রমাণ 'সমাজ মনোবিজ্ঞান' অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

কু-চিন্তা কিভাবে মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে এবং তার প্রতিকার কি

কোন কু-চিন্তা হঠাৎই মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করতে পারে না। একজন চরিত্রবান মানুষের মনে যখন কোন কু-চিন্তা উদিত হয় তখনই সে তার

আহ্বানে সাড়া দেয় না। তবে সে যদি এ চিন্তাকে সুযোগ দেয় এবং বার বার মন্থন করতে থাকে, তাহলে সেটি তার মস্তিষ্ককে প্রভাবান্বিত করে ফেলবে এবং এক পর্যায়ে তার অভিপ্রায় অনুসারেই সে কাজ করে বসবে। যেমন ধরা যাক-একজন চরিত্রবান যুবককে তার বন্ধুরা প্রথমবার যখন মদ্য পান বা কোন নেশা পানের প্রতি আহ্বান জানাবে, তখন প্রথমবার সে পরিষ্কার 'না' জবাব দিয়ে দিবে। কিন্তু এরপর চরিত্রবান যুবকটি যদি এই নেশা করার চিন্তাটি বারবার মস্তিষ্কে মন্থিত হওয়ার সুযোগ দেয় অর্থাৎ, উক্ত বন্ধুদের সাহচর্য বর্জন না করার ফলে বারবার তাদের থেকে উক্ত আহ্বান শুনতে থাকে বা তাদের এরূপ আসরে উঠা-বসা এবং নেশা করার দৃশ্য দেখা অব্যাহত রাখে, তাহলে হতে পারে তার মনের প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হতে থাকবে এবং এক সময় হয়ত এমন হয়ে যাবে যখন সে তার বন্ধুদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বসবে এবং বারবার নেশা দ্রব্য গ্রহণ করার ফলে এক সময় সে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। প্রথম থেকেই যদি এ চিন্তাকে সুযোগ দেয়া না হত, তাহলে তা মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করতে পারত না। অতএব কু-চিন্তাকে প্রতিহত করার জন্য যা যা করণীয় তা হল:

(১) মস্তিষ্কে এরূপ চিন্তা মন্থিত হওয়ার সুযোগ না দেয়া। যদি কখনও এর আবছা ছাপ পড়ে যায় তাহলে অবিলম্বে তা মুছে ফেলা।

(২) এরূপ কু-চিন্তা কার্যকরী করার সকল পরিবেশ ও উপকরণ থেকে দূরে থাকা।

(৩) এরূপ কু-চিন্তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন সুচিন্তার সাথে মনকে বেঁধে দেয়া, যাতে সেখানে কু-চিন্তা স্থান করতে না পারে।

কু-চিন্তাকে বারবার মনে উত্থিত হওয়ার সুযোগ দিলে কিভাবে তা মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে তার দ্বারা সেটি বাস্তবায়িত করায়, তার একটি সুন্দর উদাহরণ দেয়া হয়েছে 'আখলাক ও ফালসাফায়ে আখলাক' গ্রন্থে আততারবিয়াতুল ইসতিকলালিয়্যাহ-এর বরাত দিয়ে। ঘটনাটি এরূপ-একজন বিশ্বস্ত সততার অধিকারীনী মহিলা সেবিকা। তার মালিকের হাতে কোত্থেকে হঠাৎ দুটি জাল চেক এসে গিয়েছিল। সে এগুলোকে না ছিঁড়ে ঘরের মেঝেতে ফেলে দিয়েছিল। মেঝে পরিস্কার করতে গিয়ে প্রথমবার যখন সেবিকার দৃষ্টি চেক দুটির উপর পড়ল, তখন সেদিকে সে ফিরেই তাকাল না। কিন্তু সেবিকা প্রতিদিন এভাবে সেগুলো দেখতে দেখতে তার স্মৃতিতে এর চিত্র অংকিত হতে থাকল এবং এক সময়

সেগুলো উঠিয়ে নেয়ার প্রেরণা তার মনে জাগল। তবু সেগুলো সে স্পর্শ করল না। এভাবে হতে হতে একদিন সেগুলোকে হাতে তুলে নিল এবং উল্টে পাল্টে দেখল। কিন্তু পরক্ষণেই যেন হাতে আগুন লেগেছে এমনভাবে সেগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এরপর ধীরে ধীরে কু-চিন্তা শক্তি তাকে উৎসাহিত করল এবং তার উপর বিজয় লাভ করল এবং তার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ফল এই দাঁড়াল যে, একদিন সে সেগুলোকে অবলীলায় তুলে নিল অর্থাৎ, সে চুরি করল। এই পাপাচারের কারণ একটিই ছিল আর তা হল-সে কু-চিন্তাকে বারবার মস্তিষ্কে উত্থিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল, তাকে নির্বাপিত করার পরিবর্তে তাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। তাই এক সময় তার মস্তিষ্ককে সেটি আচ্ছন্ন করে নিয়েছিল।

সারকথা, কু-চিন্তাকে অবলীলায় বিচরণ করতে দেয়া উচিত নয়, অন্যথায় এক সময় সে অবশ্যই উক্ত চিন্তাকে কার্যকর করতে উৎসাহিত হয়ে উঠবে।

মন নিয়ন্ত্রণ

মনের মধ্যে নানান কু-চিন্তা, নানান প্রতিকূল চিন্তা এবং মনের খাহেশ ও প্রবৃত্তি তথা কামনা-বাসনা জাগ্রত হয়ে থাকে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এটাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব নয় এবং করতে গেলেও সেটা হবে নিজেকেই নির্মূল করার নামান্তর। এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন মনকে নিয়ন্ত্রণ করার, মনকে একটা ভারসাম্য পর্যায়ে নিয়ে আসার এবং চারিত্রিক গন্ডির ভিতরে থেকে কামনা বাসনা তথা প্রবৃত্তির চাহিদাকে পূরণ করার। চারিত্রিক বিধানে মন নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্ব তাই অনেক বেশী।

মন নিয়ন্ত্রণের বহু পন্থা রয়েছে। কিরূপ চিন্তা বা কিরূপ কামনা-বাসনা মনে জাগ্রত হয়েছে তার নিরিখেই সেখানে মন নিয়ন্ত্রণের পন্থা কি হবে তা নির্ভর করবে। এ পর্যায়ে কয়েকটি উপধারায় আলোচনাকে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। যথা:

রাগের মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রক্তের মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তাকে বলে রাগ (غَضَب) বা গোস্বা। এই রাগের মুহূর্তে মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মানুষের বুদ্ধি ঠিক থাকে না, তখন মুখ দিয়ে অনেক অন্যায় কথা বের হয়ে যায়। আবার অনেক অন্যায় কাজও করে ফেলে এবং পরিণামে

অনেক ক্ষতি ও লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়। রাগ স্বভাবগত বিষয়, এর জন্য মানুষ দায়ী নয়। তবে রাগ চরিতার্থ করা না করা মানুষের ইচ্ছার অধীন, তাই এর জন্য সে দায়ী।

রাগের মুহূর্তে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার মনস্তাত্ত্বিক পন্থা হলঃ

(১) যার উপর রাগ হয় তাকে সম্মুখ থেকে সরিয়ে দেয়া বা নিজে অন্যত্র সরে যাওয়া। তাহলে রাগের উৎস দূরীভূত হওয়ায় মনকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। অন্যথায় উৎসের উপস্থিতি অব্যাহত থাকলে উত্তেজনা প্রশমিত হবে না।

(২) তারপর এ চিন্তা করা যে, সে আমার নিকট যতটুকু অপরাধী আমি আল্লাহ্র নিকট তার চেয়ে বেশী অপরাধী। আমি যেমন চাই আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন আমারও উচিত তাকে ক্ষমা করা। এরূপ চিন্তায় মন নরম হয়ে আসবে।

(৩) এতেও রাগ না গেলে দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বে, বসে থাকলে শুয়ে পড়বে। কেননা এতে করে রক্তচাপ হ্রাস পাবে, ফলে উত্তজনা কমে আসবে।

(৪) তাতেও রাগ না গেলে ঠান্ডা পানি পান করবে বা উযূ কিম্বা গোসল করে নিবে, তাহলেও রক্তের উত্তেজনা হ্রাস পাওয়ায় ক্রোধ প্রশমিত হবে।

(৫) এই চিন্তা করবে যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না, অতএব আমি আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করার কে?

(৬) স্বভাবগতভাবে যিনি বেশী রাগী, তার রাগ দমনের পন্থা হল-যার উপর রাগ হয়, রাগ ঠান্ডা হওয়ার পর জনসমক্ষে তার হাত পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তার জুতা সোজা করে দিবে। দু একবার এরূপ করলেই রাগের হুশ ফিরে আসবে।

বি. দ্র. রাগ সব স্থানেই নিন্দনীয় নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে জায়েয এবং প্রশংসনীয় বরং জরূরী হয়ে পড়ে। অন্যায় ও যুলুমের বিরুদ্ধে রাগ শক্তির ব্যবহার করা অনেক সময় ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়।

বিদ্বেষ/মনোমালিন্য-এর মুহূর্তে মন নিয়ন্ত্রণ

রাগ চরিতার্থ করতে না পারলে রাগ দমনের দ্বারা মনের মধ্যে ক্ষোভ, মনস্তাপ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং অন্যভাবে তার প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তা-ভাবনা ও অন্যভাবে তাকে কষ্ট দেয়ার প্রয়াস জাগে, এই প্রয়াস বা

মনোভাবকে বলা হয় বুগ্য বা কীনা (বিদ্বেষ/মনোমালিন্য)। আর অন্যভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাব যদি জাগ্রত না হয় কিম্বা সেরূপ উদ্যোগ গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা না আসে বরং রাগের কারণে মনের মধ্যে শুধু একটা সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয় এবং যার উপর রাগ হয় তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে মন না চায়, তাহলে সেটাকে বলে ইনকিবাযে তব্য়ী বা 'স্বভাব সংকোচন', সেটা নিন্দনীয় নয়, কারণ সেটা স্বভাবগত বিষয়, যা ইচ্ছার অধীন নয়। তবে কারও ব্যাপারে স্বভাবের মধ্যে সংকোচন ভাব আসলে সেটা দূর করার জন্য কখনও কখনও এই ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে যে, তাকে বলে দিবে আপনার এই কথা বা আচরণে আমার কষ্ট লেগেছে। এতে অন্তর পরিষ্কার হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, বিদ্বেষ ও শত্রুতা যদি পার্থিব কোন বিষয়ের কারণে হয়, তবেই তা নিন্দনীয় ও গর্হিত। পক্ষান্তরে কোন মুসলমান দ্বীনের কারণে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যদি কারও সাথে বিদ্বেষ বা শত্রুতা রাখে তবে তা নিন্দনীয় নয় বরং প্রশংসনীয় ও উত্তম। এই বুগ্য বা কীনার প্রতিকার হল–

(১) যার প্রতি বিদ্বেষ হয় তাকে ক্ষমা করে দেয়া।

(২) মনে না চাইলেও তার সাথে মেলামেশা অব্যাহত রাখা। এভাবে ধীরে ধীরে সংকোচ ভাব দূর হয়ে যাবে।

হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা-এর মুহূর্তে মন নিয়ন্ত্রণ

কারও জ্ঞান, বুদ্ধি, সম্পদ, মান-ইজ্জত, সুখ স্বাচ্ছন্দ ইত্যাদি ভাল কিছু দেখে মনে কষ্ট লাগা এবং আকাংখা হওয়া যে, সেটা না থাকুক বা ধ্বংস হয়ে যাক এবং তা হলেই মনে আনন্দ লাগা-এই মনোবৃত্তিকে বলা হয় হাছাদ (হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা)। সাধারণতঃ তাকাব্বুর (নিজের বড়ত্ববোধ) বা শত্রুতা থেকে এই মনোভাব সৃষ্টি হয় কিম্বা কারও মন যদি এমনিতেই খবীছ হয়, তাহলেও এই মনোবৃত্তি জাগতে পারে। হাছাদের কারণে নেক আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হতে হয়। হিংসুক ব্যক্তি চিরকাল মনের কষ্টে কাল যাপন করতে থাকে, জীবনে কখনও মনে শান্তি পায় না।

এখানে উল্লেখ্য যে, কারও ভাল কিছু দেখে সেটা ধ্বংসের কামনা না করে শুধু নিজের জন্য অনুরূপ হয়ে যাওয়ার কামনা করার ক্ষেত্রে মাসআলা হল-সেটা ওয়াজিব পর্যায়ের বিষয় হলে এরূপ কামনা করা ওয়াজিব, মুস্তাহাব পর্যায়ের হলে মুস্তাহাব আর মোবাহ পর্যায়ের হলে মোবাহ।

এটাকে হাছাদ নয় বরং গেবতা বলা হয়। হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা রোগের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকার হল–

(১) যার প্রতি হিংসা হয়, মনে না চাইলেও লোক সমাজে তার প্রশংসা করা। এভাবে বলতে বলতে নিজের মনেও তার প্রভাব পড়বে।

(২) যার যে নেয়ামতের কারণে হিংসা হয়, সেটা তার জন্য আরও বৃদ্ধি পাক-আল্লাহ্‌র কাছে এই দু'আ করতে থাকা। এভাবে মনের উপর প্রতিকূল চাপ পড়ায় মনের হিংসাবৃত্তি অবদমিত হবে।

(৩) মনে না চাইলেও দেখা হলে তাকে সালাম করা, তার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা দেখানো এবং নম্র ব্যবহার করা। এভাবে মনের উপর প্রতিকূল চাপ পড়ায় মনের স্থিতাবস্থা অবদমিত হবে।

(৪) মাঝে মধ্যে তাকে হাদিয়া ও উপঢৌকন প্রদান করা।

বি. দ্র. কোন কাফের, মুরতাদ, ফাসেক ও বিদআতী লোকের কোন বিষয় সম্পদ ও নেয়ামত অর্জিত হলে এবং সে তার দ্বারা ফেতনা ফাসাদ ও দ্বীনের ক্ষতি করতে থাকলে তার সে সম্পদ ও নেয়ামত ধ্বংস হওয়ার কামনা করা নিন্দনীয় নয় বরং কোন কোন অবস্থায় তা উত্তম ইবাদত বলে গণ্য হবে।

বদগোমানী বা কু-ধারণা-এর মুহূর্তে মন নিয়ন্ত্রণ

যে সব মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ ও নেককার বলে মনে হয়, তার সম্পর্কে কোন প্রমাণ ব্যতীত কু-ধারণা পোষণ করা হারাম ও গোনাহে কবীরা। এ রোগ দেখা দিলে তার প্রতিকার হল

(১) নির্জনে বসে এই চিন্তা করা যে, কু-ধারণা পোষণ করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন, এটা করলে আল্লাহর আযাবের আশংকা রয়েছে। হে নফস, তুমি কিভাবে আযাব বরদাশত করবে?

(২) তওবা করবে।

(৩) আল্লাহ্‌র নিকট অন্তর সাফ হয়ে যাওয়ার জন্য দু'আ করবে।

(৪) যার প্রতি কু-ধারণা হয়েছে তার উভয় জগতের কামিয়াবী ও সুখ শান্তির জন্য দু'আ করবে।

(৫) প্রতিদিন তিনবার উপরোক্ত আমলসমূহ একাধারে তিন দিন করার পরও যদি মন থেকে কু-ধারণা না যায়, তাহলে যার প্রতি কু-ধারণা হয়েছে তাকে যেয়ে বলবে যে, অহেতুক আপনার প্রতি আমার কু-ধারণা

হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য দু'আ করুন যেন আমার মন থেকে এটা দূর হয়ে যায়। এভাবে মনের চুরি ফাস হয়ে যাওয়ায় মন নিবৃত্ত হয়ে যাবে।

রিয়া বা লোক দেখানোর মনোভাব থেকে মনকে নিয়ন্ত্রণ

ইবাদত ও আল্লাহর আনুগত্যের কাজে এই উদ্দেশ্য রাখা যে, এতে মানুষের চোখে আমার সম্মান বৃদ্ধি পাবে, একে বলে রিয়া বা লোক দেখানো। এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক রোগ, যা মহাপাপ।

রিয়া নানাভাবে হয়ে থাকে-কখনও মুখে বলে, কখনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে, কখনও হাটা চলার ভাব-ভঙ্গি, আওয়াজ ইত্যাদির মাধ্যমে, কখনও পোষাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমে, কখনও ইবাদত সুন্দর ও দীর্ঘভাবে আদায়ের মাধ্যমে ইত্যাদি। মোটকথা-ইবাদত ও আনুগত্যের কাজে যে কোন ভাবে মাখলুকের প্রতি নজর রাখা হল রিয়া। এমনকি লোকে দেখবে এজন্য ইবাদত গোপনে করার প্রতি জোর দেয়াও রিয়া। কেননা গোপনে ইবাদত করার প্রতি জোর সেই দিবে যার নজর মাখলূকের প্রতি রয়েছে। কেউ দেখবে কি দেখবে না এই চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়াই হচ্ছে পূর্ণ রিয়া থেকে মুক্তি এবং এটাই হল পূর্ণ এখলাস।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমার নেক কাজ দেখে অন্য কেউ তা করতে উদ্বুদ্ধ হবে-এরূপ চেতনা থেকে নেক কাজ প্রকাশ্যে করলে তা রিয়া বলে গণ্য হবে না। এমনিভাবে আমাকে কেউ নেক কাজ করতে দেখলে স্বভাবতঃ আমার মন যে খুশী হয় এই ভেবে যে, আলহামদু লিল্লাহ লোকটা আমাকে ভাল অবস্থায় দেখেছে এটাও রিয়া নয় বরং রিয়া হল এই চিন্তা এবং এই খুশী যে, প্রকাশ্যে ইবাদত করলে মানুষের কাছে আমার সুনাম হবে, আমার প্রতি লোকদের ভক্তি বৃদ্ধি পাবে ইত্যাদি। এই রিয়া অত্যন্ত সাংঘাতিক রোগ, এতে আল্লাহ্র গন্তুষ্টির স্থলে মানুষের গন্তুষ্টিকে স্থান দেয়া হয়। তাই রিয়াকে এক ধরনের শির্ক (শির্কে আছগর বা ছোট শির্ক) বলা হয়। এ থেকে মুক্তির উপায় হল–

(১) হুব্বে জাহ বা সম্মান ও যশ-প্রীতি অন্তর থেকে বের করতে হবে। কারণ এটাই হল রিয়া-র উৎস।

(২) রিয়ার চেতনা এসে গেলেও তার প্রতি ভ্র□ক্ষেপ করবে না বরং সহীহ নিয়ত অন্তরে উপস্থিত করে কাজ করে যেতে থাকবে, এভাবে আস্তে আস্তে সেটা আদত বা অভ্যাসে পরিণত হবে এবং আদত থেকে ইবাদত ও এখলাসে পরিণত হবে।

(৩) যে ইবাদত প্রকাশ্যে করার বিধান, তাতো প্রকাশ্যেই করতে হবে, এ ছাড়া অন্যান্য ইবাদত প্রকাশ করারও নিয়ত রাখবে না, গোপন করারও উদ্যোগ নিবে না। এভাবেই ধীরে ধীরে মন স্বাভাবিক চেতনায় ফিরে আসবে।

হুব্বে জাহ বা প্রশংসা ও যশ-প্রীতি-র চেতনা থেকে মনকে নিয়ন্ত্রণ

প্রশংসা, সুনাম ও সম্মানের লোভকে বলা হয় হুব্বে জাহ। এ লোভ মনে এলে অন্যের প্রশংসা, সুখ্যাতি ও সম্মান দেখে মনে আগুন জ্বলে ওঠে এবং হিংসা লাগে আর অন্যের অপমান বা পরাজয়ের কথা শুনে মনে আনন্দ জন্মে। এমনিভাবে জিঘাংসার মনোবৃত্তি জাগ্রত হওয়া ছাড়াও অনেক খারাবী এ রোগের কারণে দেখা দেয়। এ রোগের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিকার হল–

(১) এই চিন্তা করা যে, আমি যাদের নিকট ভাল হতে চাই তারাও থাকবে না আমিও থাকব না। অতএব, এমন অসার জিনিসের প্রতি মন লাগানো নির্বুদ্ধিতা বৈ কি?

(২) এমন কোন কাজ করা, যা শরীআতের খেলাফ নয় কিন্তু লোক চক্ষে সেটা লজ্জাজনক। যেমন বাড়ির কোন নগন্য জিনিস বিক্রি করা ইত্যাদি। এভাবে লোক দেখানোর চিন্তা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে তা অবদমিত হবে।

দুনিয়া এবং মালের মহব্বত থেকে মনকে নিয়ন্ত্রণ

টাকা-পয়সার লোভ এত বড় খারাপ জিনিস যে, একবার তা মনে ঢুকলে সেখানে আল্লাহ্‌র মহব্বত ও আল্লাহ্‌র স্মরণ থাকতে পারে না। এমনিভাবে ঘর-বাড়ি, বাগ-বাগিচা, আসবাব-পত্র, কাপড়-চোপড় ইত্যাদির মহব্বত এক কথায় দুনিয়ার মহব্বত তথা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সব কিছুর মহব্বত এমন এক জঞ্জাল, যার মধ্যে আল্লাহ্‌র মহব্বত থাকতে পারে না। এই দুনিয়ার মহব্বতের কারণে মানুষ হক-না হক, হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার বিচার হারিয়ে ফেলে, এমনকি মৃত্যুর সময় আল্লাহ্‌র প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ঈমান হারা অবস্থায়ও মৃত্যুবরণ করতে পারে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা।

তবে উল্লেখ্য যে, ধন-সম্পদ, মাল-আসবাব ইত্যাদির প্রতি স্বভাবগত- ভাবে মানুষের কিছু আকর্ষণ থাকে, মনকে এই স্বভাব থেকে

ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় এবং এটা শরীআতে নিন্দনীয়ও নয়। এমনিভাবে শরীআত সম্মত পদ্ধতিতে সম্পদ উপার্জন করাও নিন্দনীয় নয় বরং নিন্দনীয় হল যদি কেউ সম্পদের প্রতি মনের আকর্ষণকে এতটা বল্গাহীন ছেড়ে দেয় বা এমন ভাবে সম্পদ উপার্জনে মত্ত হয় যে, আল্লাহ্‌র হুকুম আহকামের পরোয়া থাকে না এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের আদর্শের চেয়ে সেটাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এ রোগের প্রতিকার হল–

(১) এ সব কিছু একদিন ছেড়ে যেতে হবে এবং মৃত্যুবরণ করতে হবে-একথা বেশী বেশী স্মরণ করা।

(২) ব্যবসা-বাণিজ্য, জায়গা-জমি, আসবাবপত্র, মানুষের সঙ্গে দুস্তি-মহব্বত, আলাপ-পরিচয় জরূরতের চেয়ে বেশী না করা।

(৩) অপব্যয় না করা। কেননা অপব্যয় থেকে আয় বৃদ্ধির লোভ জন্মে।

(৪) সাধারণ খাওয়া পরার অভ্যাস করা।

(৫) দরিদ্রদের সংসর্গ গ্রহণ ও ধনীদের সংসর্গ বর্জন করা।

(৬) দুনিয়াত্যাগী বুযূর্গদের জীবনী পাঠ করা।

(৭) যে জিনিসের প্রতি মন বেশী লেগে যায়, তা হয় কাউকে দিয়ে দেয়া (দান স্বরূপ দিতে মনে না চাইলে অন্তত যাকাত সদকা স্বরূপ হলেও দিয়ে দেয়া) কিম্বা বিক্রি করে দেয়া।

বুখ্‌ল বা কৃপণতার মনোভাব থেকে মনকে নিয়ন্ত্রণ

শরীআতের আলোকে যেখানে ব্যয় করা জরূরী বা মানবিক কারণে যেখানে ব্যয় করা জরূরী, সেখানে ব্যয় করতে সংকীর্ণতার মনোভাবকে বলা হয় বুখ্‌ল বা কার্পণ্য। প্রথম স্থানে ব্যয় না করা গোনাহ আর শেষোক্ত স্থানে ব্যয় না করা গোনাহ নয় তবে খেলাফে আওলা বা অনুত্তম। এই কৃপণতা এত খারাপ জিনিস যে, এর কারণে অনেক ফরয ওয়াজিব আদায় করাও সম্ভব হয় না। যেমন যাকাত দেয়া, কুরবানী করা, অভাবীকে সাহায্য করা, গরীব আত্মীয়-স্বজনের উপকার করা ইত্যাদি। এগুলো হল দ্বীনী ক্ষতি। আর কৃপণকে সকলে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, এটা হল পার্থিব একটা বড় ক্ষতি। এ রোগের প্রতিকার হল–

(১) দুনিয়ার মহব্বত ও মালের মহব্বত অন্তর থেকে বের করতে হবে। (দেখুন পুর্ববর্তী পরিচ্ছেদ)

(২) প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস মনে না চাইলেও মনের উপর জোর দিয়ে সেটা কাউকে দিয়ে দেয়া। কৃপণতা দূর না হওয়া পর্যন্ত এরূপ করতে থাকা।

হির্ছ বা লোভ লালসা-এর মুহূর্তে মনকে নিয়ন্ত্রণ

অর্থ-সম্পদ, মান-সম্মান ইত্যাদির প্রতি মনের লোভকে বলা হয় হির্ছ বা লোভ-লালসা। প্রশংসা ও যশ-প্রীতি এবং দুনিয়া ও মালের মহব্বত পরিচ্ছেদে বর্ণিত চিকিৎসাই এ রোগের চিকিৎসা। এছাড়া এই চিন্তা করতে হবে যে, লোভী ব্যক্তি সর্বদা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, শরীআতের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় জিনিসের প্রতি লোভ বা আগ্রহ নিন্দনীয় নয় বরং তা পছন্দনীয়।

এশ্রাফে নফ্ছ থেকে মনকে নিয়ন্ত্রণ

কারও থেকে কিছু পাওয়ার আশায় এমনভাবে অপেক্ষায় থাকা যে, তা না পেলে মন খারাপ হয়ে যায় এবং যার থেকে পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল তার প্রতি রাগ জন্মে, এটাকে বলা হয় এশ্রাফে নফ্ছ। এও এক প্রকারের হির্ছ বা লোভ এবং এটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী হওয়ার কারণে নিন্দনীয়। তবে শুধু যদি পাওয়ার চিন্তা মনে উদয় হয় কিন্তু না পেলে মনে কষ্ট আসে না বা তার প্রতি রাগ জন্মে না, তাহলে এতটুকু গর্হিত নয়। এমনিভাবে কোন পেশাদার যে গ্রাহকের অপেক্ষায় থাকে তাও এশ্রাফে নফ্ছের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন ডাক্তার রোগীর অপেক্ষায় থাকে ইত্যাদি। হির্ছ বা লোভ থেকে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার যে পদ্ধতি এখানেও সে পদ্ধতি প্রযোজ্য।

তাকাব্বুর বা অহংকার-এর মুহূর্তে মনকে নিয়ন্ত্রণ

জ্ঞান-বুদ্ধি, ইবাদত-বন্দেগী, মান-সম্মান, ধন-দৌলত ইত্যাদি যে কোন দ্বীনী বা দুনিয়াবী গুণে নিজেকে বড় মনে করা এবং সেই সাথে অন্যকে সে ক্ষেত্রে তুচ্ছ মনে করাকে বলে তাকাব্বুর বা অহংকার। অহংকার গোনাহে কবীরা এবং এটি একটি বড় মনস্তাত্ত্বিক রোগ। কেউ এ রোগে আক্রান্ত হলে সে কারও উপদেশ গ্রহণ করে না, কারও সৎ পরামর্শও গ্রহণ করে না। এ রোগ হক ও সত্য গ্রহণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এ হল তাকাব্বুরের দ্বীনী ক্ষতি। আর অহংকারীকে মনে প্রাণে সকলে ঘৃণা করে এবং সময় সুযোগে তার থেকে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করে, এভাবে দুনিয়াতেও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এ সব কিছুর প্রেক্ষিতে তাকাব্বুর বা অহংকারকে সর্ব রোগের মূল বলা হয় এবং তাকাব্বুর হারাম ও বড় গোনাহ। এ চেতনা মনে এলে সে মুহূর্তে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় হল–

(১) নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা যে, আমি নাপাক পানি থেকে তৈরী এবং বর্তমানেও আমার পেটে নাপাক ভরা, চোখে-মুখে ও নাকের ভিতরে ময়লা ভরা। আর মৃত্যুর পর আমার সবকিছু পচে গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে ইত্যাদি। এভাবে নিজের হীনতার চিন্তা উদিত করলে বড়ায়ীর চিন্তা আঘাতগ্রস্ত হয়ে তা অবদমিত হয়।

(২) একথা চিন্তা করা যে, সমস্ত গুণ মুলত আল্লাহ্‌রই একান্ত দান, আমার বুদ্ধি বা বাহু বলে তা অর্জিত হয়নি, নতুবা আমার চেয়ে কত বুদ্ধিমান বা শক্তিশালী ব্যক্তি এ গুণ অর্জন করতে পারেনি। অতএব আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে যা অর্জিত হয়েছে তার জন্য আমার অহংকার বা বড়ত্ববোধ বোকামী বৈ কি? বরং এর জন্য আল্লাহ্‌র সামনে আমার বিনয়ী হওয়া উচিত।

(৩) যাকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হবে, মনে না চাইলেও জোর জবরদস্তী তার সাথে নম্র ব্যবহার করতে হবে।

(৪) অভাবী ও গরীব শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে বেশী উঠা-বসা রাখলে সর্বক্ষণই অহংকার বোধ জাগ্রত হওয়া থেকে মন নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

(৫) মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করবে।

(৬) নিজের দোষ-ত্রুটি, নিন্দা অপবাদ শুনেও প্রতিবাদ না করা।

(৭) ক্রোধ প্রকাশ পেলে ক্ষমা চেয়ে নেয়া (ছোটদের থেকে হলেও)।

(৮) একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নিজের ছোট খাট কাজ নিজেই করা, মজদূর বা চাকর-নওকর না লাগানো।

(৯) সকলকে আগে সালাম দেয়া।

উজ্‌ব বা আত্মগর্ব-এর মুহূর্তে মনকে নিয়ন্ত্রণ

"অহংকার"-এর সংজ্ঞায় নিজেকে বড় মনে করার সাথে সাথে অন্যকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি কোন বিষয়ে অন্যকে তুচ্ছ মনে না করে শুধু নিজেকে বড় মনে করে গর্ব বোধ করে, তাহলে সেটাকে বলা হয় উজ্‌ব অর্থাৎ, আত্মগর্ব বা অহংবোধ। আত্মগর্ব করা গোনাহে কবীরা। এ থেকে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় হল–

(১) নিজের দোষ-ত্রুটি চিন্তা করে দেখা।

(২) উক্ত গুণকে আল্লাহর দান মনে করা।

(৩) উক্ত দানের জন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করা।

(৪) এই আশংকা রাখা যে, আল্লাহ্র শক্তি আছে যে কোন সময় তিনি এটা ছিনিয়ে নিতে পারেন। তাহলে ভয়ে ভয়ে মন স্ফীত হওয়া থেকে বিরত থাকবে। কারণ মন লোভী হয়ে থাকে, তাই কোন কিছু হারানোর চিন্তা এলে হারানোর কারণ থেকে সে নিবৃত্ত হয়।

বি. দ্র. আরও কিছু মানসিক প্রতিকূলতা যেমন হতাশা, দুশ্চিন্তা, বিষাদ, উদ্বেগ, হীনমন্যতা অহেতুক ভয়ভীতি ইত্যাদি সম্পর্কে ‘চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান’ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গোঁড়ামি থেকে মন নিয়ন্ত্রণ

ধর্ম, জাতি, দেশ, গোত্র ইত্যাদির নামে অহেতুক ও অন্যায় জিদ পোষণ করাকে বলা হয় গোঁড়ামি। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, দ্বীন ও ধর্মের ব্যাপারে যে রক্ষণশীলতা বা দৃঢ়তা পোষণ করা হয়, সেটাকে গোঁড়ামি বলা হয় না। বরং সেটাকে বলা হয় ইসতিকামাত বা অটলতা অবিচলতা; এটা ধর্মে প্রশংসনীয়। গোঁড়ামি বলা হয় যদি যুলুম ও অন্যায় কাজে এক গুঁয়েমি চালানো হয়। যেমন রাসূল (সা.)কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল “গোঁড়ামি কি”? তদুত্তরে রাসূল (সা.) বলেছিলেন–

اَنْ تُعِيْنَ قَوْمَكَ عَلٰى ظُلْمٍ.

(فلسفۂ اخلاق)

অর্থাৎ, কোন যুলুম ও অন্যায় কাজে যদি তুমি তোমার গোত্রকে সাহায্য কর তাহলে সেটাই হল গোঁড়ামি।

গোঁড়ামির বুনিয়াদ মুর্খতা অজ্ঞতা ও হক প্রীতি না থাকার উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা এক ধরনের সীমালংঘন এবং সংকীর্ণতাও বটে। তাই এই রোগের প্রতিকারের জন্য সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সংকীর্ণ মানসিকতার উচ্ছেদ সাধন করতে হবে। সংকীর্ণ মানসিকতার উচ্ছেদ সাধনে বিশেষ উপকার লাভ হয় এমন সব মনীষীদের জীবনী পাঠ করায়, যারা ছিলেন উদার মানসিকতার অধিকারী এবং যারা সার্বজনীন সৌহার্দ প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

গোনাহের প্রতি আকর্ষণ থেকে মনকে নিয়ন্ত্রণ

তাকওয়া বা পরহেযগারীর স্বাদ এবং নূর ভেতরে না থাকার কারণে গোনাহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়- বিকর্ষণ সৃষ্টি হয় না। তাকওয়ার স্বাদ অর্জিত হলে গোনাহের প্রতি বিকর্ষণবোধ সৃষ্টি হবে এবং গোনাহ করতে তখন খারাপ লাগবে। অতএব গোনাহের প্রতি

আকর্ষণ-রোগের চিকিৎসা হল তাকওয়া বা খোদা ভীতি মনে জাগ্রত করা এবং জান্নাতের নায নেয়ামতের কথা স্মরণ করে মনকে তার প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা।

অবৈধ প্রেম থেকে মনকে নিয়ন্ত্রণ

সুফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন, কোন নারী বা বালকের অবৈধ প্রেমে পড়লে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য যা যা করতে হবে তা হল–

(১) প্রথমত বুঝতে হবে যে, সাহস কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোন সহজ কাজও হয় না। শরীরের সামান্য রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে গেলেও তিক্ত ঔষধ সেবন করতে হয়। বাহ্যিক রোগের যখন এই অবস্থা, তখন আভ্যন্তরীণ রোগের ক্ষেত্রেতো আরও বেশী ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের জন্য মনকে প্রস্তুত করতে হবে।

(২) তার সাথে কথাবার্তা, দেখা-শোনা, আসা-যাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে। অন্য কেউ তার আলোচনা করলে তাকে বাধা দিতে হবে এবং লৌকিকভাবে হলেও যার প্রেমে পড়েছে পরিকল্পিতভাবে এক এক বাহানায় তার সমালোচনা করতে থাকবে।

(৩) দোযখের বর্ণনা এবং আল্লাহর নাফরমানীর কারণে আল্লাহ কিরূপ অসন্তুষ্ট হন-এ জাতীয় বর্ণনা যে কিতাবে আছে এমন কোন কিতাব বা হাদীছের গ্রন্থ পাঠ করতে থাকবে। তাহলে অবৈধ প্রেমের কারণে গোনাহের শাস্তির কথা স্মরণ হয়ে সে চিন্তা অবদমিত হবে। কারণ মন আরাম প্রিয়। তাই কোন কিছুতে শাস্তি বোধ করলে সে তা থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ হয়।

(৪) একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্জনে বসে এ চিন্তা করবে যে, আমি কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান রয়েছি, আর আল্লাহ আমাকে ধমক দিয়ে বলছেন, "হে বেহায়া! বেশরম!! তোমার লজ্জা হয় না, আমাকে ছেড়ে একটা মুরদার দিকে ঝুঁকে পড়লে? এর জন্য তোমাকে আমি পয়দা করেছিলাম? বেহায়া, আমার দেয়া চোখ আমার দেয়া অন্তরকে তুমি আমার নাফরমানীর কাজে ব্যবহার করলে? তোমার শরম হয় না? ইত্যাদি ইত্যাদি।

বি. দ্র. মন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়াদির অধিকাংশ তথ্য "বাছায়েরে হাকীমুল উম্মত" এবং "শরীআত ও তরীকত" গ্রন্থদ্বয় থেকে গৃহীত।

কয়েকটি বদ-অভ্যাস ও তার প্রতিকার

গান বাদ্য শ্রবণ

গান-বাদ্য শ্রবণ একটি স্বভাবগত আকর্ষণীয় বিষয়। এক পর্যায়ে এটি মনের রোগ এবং বদ অভ্যাসে পরিণত হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে গান-বাদ্যের কারণে স্বভাব, মন-মানসিকতাগত ও চিন্তাগত বহুবিধ ক্ষতি সাধিত হয় বলে গান-বাদ্যকে স্বমূলে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

আবূ দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান, মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি হাদীছের কিতাবে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য হাদীছে গান-বাদ্য হারাম হওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ এসেছে। কুরআন শরীফেও এরূপ বর্ণনা এসেছে। কেবল সুললিত কণ্ঠে যদি কোন কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক/পাঠিকা কোন নারী বা কিশোর না হয়, সাথে সাথে কবিতার বিষয়বস্তু অশ্লীল বা অন্য কোন পাপ পঙ্কিলযুক্ত না হয় তবে তা জায়েয।

যদি কেউ গান বাদ্য শ্রবণের বদ-অভ্যাসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তবে তার থেকে পরিত্রাণের উপায় হল−

(১) গান-বাদ্যের প্রতি স্বভাবগত আকর্ষণ থেকে থাকে, এ আকর্ষণ সম্পূর্ণ বিলীন করে দেয়া স্বাভাবিকভাবে অসম্ভব। তবে মন চাইলেও ইচ্ছাকৃত ভাবে মনের চাহিদার বিরুদ্ধে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এতে কষ্ট হলেও কারও তাড়াতাড়ি বা কারও ধীরে ধীরে সেই চাহিদা দুর্বল হয়ে যায়। মনস্তাত্ত্বিক নিয়মানুসারে ক্রমাগত মনের কোন চাহিদার বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকলে মনের সে চাহিদা দূর্বল হয়ে যায়।

(২) গান-বাদ্যের উপকরণ ও পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে হবে। উপকরণ ও পরিবেশ থেকে উক্ত পাপের চাহিদা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

অশ্লীল উপন্যাস, কবিতা ও নভেল নাটক পাঠ

অনেক যুবক-যুবতী অশ্লীল উপন্যাস, নভেল, নাটক, পেশাদার-অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠের বদ-অভ্যাসে অভ্যস্ত। এসব বিষয়ও নিষিদ্ধ। এ সবের বদ-অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত পন্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃতভাবে মনের চাওয়ার বিরুদ্ধে তা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এসবের উপকরণ থেকে দূরে থাকতে হবে। কিছুদিন এরূপ করলেই মনে এসবের চাহিদা দুর্বল হয়ে যাবে।

খেলাধূলা করা ও দেখা

যে খেলা শারিরীক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে অথবা কোন ধর্মীয় বা পার্থিব উপকারিতা লাভের উদ্দেশ্যে অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার লক্ষ্যে হয়, সে খেলা শরীআত অনুমোদন করে, যদি তাতে বাড়াবাড়ি না করা হয়, শরীআতের কোন হুকুম লংঘন না করা হয় এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিঘ্নিত না হয়। পক্ষান্তরে যে খেলায় কোন ধর্মীয় বা পার্থিব উপকারিতা নেই, কিম্বা যে খেলায় শরীআতের বিধান লংঘন হয়, যেমন সতর খোলা হয়, বা যাতে মত্ত হয়ে নামায রোযা ইত্যাদি ফরয কর্ম বিঘ্নিত হয় অথবা জুয়ার ভিত্তিতে হার জিতে যে সব খেলা হয়ে থাকে, সেগুলো শরীআতে নিষিদ্ধ-কতক পরিষ্কার হারাম আর কতক নিষিদ্ধ। কারণ খেলাধূলাও মানুষের এমন বদ অভ্যাসে পরিণত হয় যে, তার থেকে মন-মানসিকতাকে মুক্ত করা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

খেলাধূলা করা ও দেখার বদ-অভ্যাসে যারা অভ্যস্ত তাদের এই বদ-অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য।

(১) মনে চাইলেও ইচ্ছাকৃতভাবে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাহলে ধীরে ধীরে মন থেকে খেলাধূলার চাহিদা দুর্বল হয়ে যাবে। কারণ মনস্তাত্ত্বিক নিয়মানুসারে ক্রমাগত মনের কোন চাহিদার বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকলে মনের সে চাহিদা দূর্বল হয়ে যায়।

(২) খেলাধূলার আলোচনা করা ও আলোচনা শোনা থেকে বিরত থাকতে হবে। আলোচনা শুনলে মনের সুপ্ত চাহিদা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

(৩) খেলাধূলার উপকরণ ও পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে হবে। উপকরণ ও পরিবেশ থেকে দূরে না থাকলে চাহিদা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। কিছুদিন এরূপ করলে মন থেকে খেলাধূলার আকর্ষণ হ্রাস পেতে থাকবে।

জুয়া

জুয়া বলা হয় এমন লেন-দেনকে, যেখানে কোন মালের মালিকানা এমন সব শর্ত নির্ভর হয় যাতে মালিক হওয়া না হওয়ার উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে, যার ফলে পূর্ণ লাভ বা পূর্ণ লোকসান উভয় দিকই থাকে-কেউ কেউ প্রচুর সম্পদ পেয়ে যায় এবং অনেকে কিছুই পায় না। শরীআতে সব ধরনের জুয়াই হারাম। আজকাল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লটারী জুয়ার

অন্তর্ভুক্ত এবং তা হারাম। কেননা এসবেও অনেক ক্ষেত্রেই টাকা পয়সার বাজী ধরা হয়ে থাকে। ফলে তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাশ খেলাতে যদি টাকা পয়সার হারজিত শর্ত থাকে অর্থাৎ, বাজি ধরা হয় তবে তাও হারাম ও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

জুয়াও খেলাধূলার মত একটি বদ অভ্যাস বা নেশায় পরিণত হয়। ফলে দেখা যায় জুয়াড়ী ব্যক্তি নেশাখোর ব্যক্তির ন্যায় ভিটে মাটি বিক্রি করেও জুয়ার রসদ জোগাড় করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যায়। খেলাধূলা করা ও দেখার বদ-অভ্যাস থেকে পরিত্রাণের যে পন্থা, জুয়ার বদ অভ্যাস থেকে পরিত্রাণের জন্যও সে সব পন্থা গ্রহণীয়। "চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান" অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সিনেমা বাইস্কোপ ও অশ্লীল ছায়াছবি দর্শন

সিনেমা বাইস্কোপ এবং অশ্লীল ছায়াছবি দর্শনও একটি স্বভাবগত আকর্ষণীয় বিষয়। এক পর্যায়ে এটি মনের রোগ এবং বদ অভ্যাসে পরিণত হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে সিনেমা বাইস্কোপ এবং অশ্লীল ছায়াছবি দর্শনের কারণে স্বভাব, মন-মানসিকতাগত ও চিন্তাগত বহুবিধ ক্ষতি সাধিত হয় বলে সিনেমা বাইস্কোপ এবং অশ্লীল ছায়াছবি দর্শনকে স্বমূলে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে পাঁচ রকমের পাপ বা ক্ষতি রয়েছে। (১) সময় নষ্ট (২) সম্পদ নষ্ট (৩) স্বভাব-চরিত্র নষ্ট (৪) স্বাস্থ্য নষ্ট (৫) ঈমান ও আমল নষ্ট। যদি নারী চরিত্র ও অশ্লীলতাকে বাদ দিয়ে শিক্ষামূলক ফিল্ম তৈরি করা হয়, তাহলে তার মধ্যে এতগুলো পাপ বা ক্ষতি থাকবে না শুধু জীবের ছবি তোলার পাপ থাকবে। আর জীবের ছবিও বাদ দিয়ে শুধু সু-শিক্ষামূলক ফিল্ম তৈরি করা হলে তাতে কোন পাপ থাকবে না। সিনেমার পার্ট ও প্লে করা, এর ব্যবসা করা এবং এডভারটাইজ করা সবই কবীরা গোনাহ

সিনেমা বাইস্কোপ এবং অশ্লীল ছায়াছবি দর্শনের বদ-অভ্যাস থেকে পরিত্রাণের জন্য খেলাধূলা করা ও দেখা পরিচ্ছেদে বর্ণিত পন্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে।

মদ, গাজা, ভাং, আফিম, হেরোইন প্রভৃতির নেশা

মদ, গাজা, ভাং, আফিম, হেরোইন প্রভৃতির নেশা যে একটি মনস্তাত্ত্বিক রোগ তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। তাই দেখা যায় জটিল

রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় নেশাখোর ব্যক্তি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে অবলিলায় নেশা চালিয়ে যেতে থাকে। নেশা করতে পারলে সে স্বস্তি বোধ করে, অন্যথায় কোন ভাবেই সে স্বস্তি বোধ করতে পারেনা। মনস্তাত্ত্বিক রোগের ধরনই এমন।

শরীআতে এসব নেশাকর দ্রব্য সম্পূর্ণ হারাম, অল্প হোক চাই বেশী হোক। এসবের শারীরিক, আত্মিক, নৈতিক, আর্থিক ও জাগতিক বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতির কারণেই শরীআত এগুলোকে নিষিদ্ধ করেছে। এসবের বদ অভ্যাসে কেউ জড়িত হয়ে পড়লে তা ছাড়ানো কঠিন ও কষ্টকর। তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতি সমূহ গ্রহণ করলে ফল পাওয়া যাবে।

(১) প্রথমত এসব নেশার মন্দ ও ক্ষতিকর দিকগুলো নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির মনে বদ্ধমূল করাতে হবে এবং তার মনে এর প্রতি ভয়, আতংক ও ঘৃণা জাগিয়ে, তুলতে হবে।

(২) যে কোন নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর, তাই ধীর মন্থর গতিতে অল্প অল্প করে তাকে ছাড়াতে হবে।

(৩) তার কাছ থেকে নেশার উপকরণ এবং পাত্র, তৈজস পত্র ইত্যাদি দূরে সরিয়ে দিতে হবে বা তাকে নেশাটির উপকরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, যতদিন তার মন থেকে নেশার ঘোর সম্পূর্ণ কেটে না যায়।

(৪) সবচেয়ে বড় কথা মানুষ ইচ্ছা ও সাহস করলে অনেক কঠিন কিছুও করে ফেলতে পারে- নেশাখোর ব্যক্তির মনে এরূপ ইচ্ছা ও সাহস জাগিয়ে তুলতে হবে।

বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা ও তামাক সেবন

বিড়ি, সিগারেট হুক্কা ইত্যাদি ধুমপান ও তামাক সেবন মাকরূহ তানযীহী আর এগুলোর দুর্গন্ধ মুখে থাকা অবস্থায় মসজিদে গমন করা হারাম। ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৫ম খণ্ডে বলা হয়েছে, তামাক যদি নেশাযুক্ত হয় তাহলে নিষিদ্ধ, দুর্গন্ধযুক্ত হলে মাকরূহ, অন্যথায় জায়েয। বিড়ি-সিগারেট প্রভৃতির বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করার জন্য পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত নিয়মাবলী প্রযোজ্য। যথা–

(১) প্রথমত এ সব নেশার মন্দ ও ক্ষতিকর দিকগুলো নেশাখোর ব্যক্তির মনে বদ্ধমূল করাতে হবে এবং তার মনে এর প্রতি ভয়, আতংক ও ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে হবে।

(২) যে কোন নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর, তাই ধীর মন্থর গতিতে অল্প অল্প করে তাকে ছাড়াতে হবে।

(৩) তার কাছ থেকে নেশার উপকরণ এবং পাত্র তৈজসপত্র ইত্যাদি দূর করে দিতে হবে বা তাকে নেশার উপকরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, যতদিন তার মন থেকে নেশার ঘোর সম্পূর্ণ কেটে না যায়।

(৪) সবচেয়ে বড় কথা মানুষ ইচ্ছা ও সাহস করলে অনেক কঠিন কিছুও করে ফেলতে পারে- নেশাখোর ব্যক্তির মনে এরূপ ইচ্ছা ও সাহস জাগিয়ে তুলতে হবে। 'নেশা' সম্পর্কে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অপব্যয়

শরীআতের আলোকে যে ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষেধ সে ক্ষেত্রে ব্যয় করাকে বলা হয় তাবযীর বা অপব্যয়। কুরআন অপব্যয়কারীকে "শয়তানের ভাই' বলে আখ্যায়িত করেছে। অপব্যয় করা গোনাহে কবীরা। অপব্যয় করতে করতে এটা মানসিক ব্যধিতে পরিণত হয়।

অমিতব্যয়

যেসব ক্ষেত্রে ব্যয় করা জায়েয সে সব ক্ষেত্রেও প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করাকে বলা হয় এছরাফ বা অমিতব্যয়। এটা শরীআতে নিষিদ্ধ। এটাকে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমাল□ঘন বা অতিরিক্ত ব্যয় বলেও আখ্যায়িত করা যায়। প্রয়োজন বলতে বোঝায় এতটুকু পরিমাণ, যা না হলে কোন দ্বীনের কাজ বা দুনিয়ার কাজ করা সম্ভব হয় না বা অত্যন্ত কষ্ট ও পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় কল্পিত প্রয়োজনকে আমরা জরূরত বা প্রয়োজন মনে করে বসি; অথচ সেটা জরূরত বা প্রয়োজন নয় বরং তা হল খাহেশাত বা লোভ। দুনিয়ার মহব্বত এবং লোভ প্রতিকারের জন্য যে ব্যবস্থা, অপব্যয় ও অমিতব্যয়ের বদ অভ্যাস প্রতিকারের জন্যও তাই গ্রহণ করতে হবে।

যেনা : (ব্যভিচার)

যেনা অর্থাৎ, নারীর সতীত্ব এবং পুরুষের চরিত্র নষ্ট করা। যেনা মনের আকর্ষণ থেকে হয়ে থাকে। এটি একটি মানসিক ব্যাধি। এ থেকে বেঁচে থাকার জন্য যা যা করতে হবে তা হল–

(১) যেনার উপসর্গ যেমন প্রেমালাপ, গোপন যোগাযোগ, গায়রে মাহরামের সাথে নির্জনবাস, পর্দা লংঘন ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা।

(২) যেনার কারণে জাহান্নামের যে কঠিন শাস্তি হবে তা স্মরণ করা।

(৩) একথা স্মরণ করা যে, আল্লাহ সবকিছুই দেখেন, আমার এ অবস্থাও তিনি দেখবেন এবং কোন মানুষ এখন না দেখলেও কিয়ামতের ময়দানে সকলের সামনে এটা প্রকাশ করে দেয়া হবে।

(৪) বিবাহ না করে থাকলে বিবাহ করা, আর স্ত্রী থাকার পরও কোন নারীর প্রতি খাহেশ হলে এই চিন্তা করা যে, তার যা আছে আমার স্ত্রীরওতো তা আছে, তাহলে অহেতুক কেন তার প্রতি ঝুঁকতে হবে?

(৫) যে নারীর সাথে যেনার কামনা জাগে বা যে পরিবেশে যেনার সুযোগ সৃষ্টি হয় তার কাছে না যাওয়া বা কাছে থাকলে সেখান থেকে দূরে সরে যাওয়া।

(৬) যে বুযুর্গের প্রতি ভক্তি আছে নির্জনে বসে তার সম্পর্কে এই কল্পনা করবে যে, তিনি আমার অন্তরের মধ্যে বসে আমার অন্তর থেকে সব জঞ্জাল ধরে ধরে বাইরে নিক্ষেপ করছেন।

(৭) যে সব কথা শুনলে, যেখানে গেলে বা যা দেখলে কিম্বা যা পড়লে অথবা যা চিন্তা করলে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বা যেনার মনোভাব জাগ্রত হয় তা থেকে বিরত থাকা।

হস্ত মৈথুন

হস্তমৈথুন করা মহাপাপ। এটা করতে করতে এটা মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হয়। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য পূর্বের পরিচ্চেদে বর্ণিত ২, ৩, ৬, ও ৭ নং পন্থা গ্রহণ করতে হবে।

বালক মৈথুন

বালকের সাথে কুকর্ম করা যেনার চেয়েও বড় পাপ। এজন্যই বালকের সাথে কুকর্মকারীর শাস্তি বলা হয়েছে আগুন দিয় জ্বালিয়ে দেয়া। যেনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য যে সব পন্থা গ্রহণীয়, বালক মৈথুন থেকে পরিত্রাণের জন্যেও সে সব পন্থা গ্রহণীয়।

বদ-নজর

গায়রে মাহরাম মহিলার দিকে নজর করা বা শ্মশ্রু বিহীন বালকের দিকে খাহেশাতের দৃষ্টিতে তাকানো হল বদ-নজর। বদ-নজর দ্বারা কলব

অন্ধকার হয়ে যায়, ইবাদতের নূর নষ্ট হয়ে যায়। এতে নজরের যেনা হয়, আবার তাকে নিয়ে কোন পাপের চিন্তা করলে মনের যেনা হয়। অনিচ্ছাকৃত হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে যায় তাতে কোন পাপ নেই কিন্তু তারপর ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিকে দীর্ঘায়িত করলে বা বার বার দেখলে পাপ হবে।

এই বার বার কিম্বা দীর্ঘক্ষণ দেখতে চাওয়া আসলে মনের একটা রোগ বিশেষ। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হল–

(১) এ চিন্তা করা যে, আল্লাহ আমার মনের অবস্থা দেখছেন এবং কিয়ামতের দিন এ নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তখন সবার সামনে লজ্জিত হতে হবে এবং এই পাপের দরুণ জাহান্নামের আযাব হবে।

(২) এ চিন্তা করবে যে, আমার আপনজনকে কেউ এভাবে দেখলেতো আমার অপছন্দ লাগে, তাহলে আমার দেখাটা কি তাদের অপছন্দনীয় নয়?

(৩) এরপরও তাকে সুন্দর মনে হলে এবং নজর দিতে মনে চাইলে তাকে কুৎসিত কল্পনা করবে। তাহলে আবার তাকানোর ঔৎসুক্য হ্রাস পাবে।

(৪) হিম্মত এবং এরাদা করা যে, এ থেকে বিরত থাকব। আর হঠাৎ নজর পড়ে গেলে তার থেকে নজর ফিরিয়ে নিলে কলবে নূর পয়দা হয়- এই ফিকির রাখা।

গীবতঃ (অপরের দোষ চর্চা)

হেয় করে তোলার উদ্দেশ্যে পশ্চাতে কারও প্রকৃত দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করাকে গীবত বলে। আর প্রকৃত পক্ষে সে দোষ তার মধ্যে না থাকলে সেটাকে বলে বুহতান, যা গীবতের চেয়েও বড় অপরাধ। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, পোষাক-পরিচ্ছদ, শারীরিক গঠন, বংশ ইত্যাদি যে কোন বিষয়ের দোষ বর্ণনাই গীবতের অন্তর্ভুক্ত। মুখে বলা দ্বারা যেরূপ গীবত হয়, তদ্রূপ অঙ্গভঙ্গী এবং ইশারা ইঙ্গিতেও গীবত হয়। গীবত যেমন জীবিত মানুষের হয় তেমনি মৃত মানুষেরও হয়। ছোট, বড়, মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের দোষ চর্চাই গীবত।

গীবত করা হারাম, যেনার চেয়েও গুরুত্বর কবীরা গোনাহ। অবশ্য ন্যায় বিচার প্রার্থনা করতে গিয়ে বিচারকের নিকট প্রতিপক্ষের যে দোষ বর্ণনা করতে হয়, কিম্বা কাউকে অপরের দ্বীনী বা দুনিয়াবী ক্ষতি থেকে

সাবধান করার উদ্দেশ্যে বা গুরুজনের নিকট অধীনস্তদেরকে শাসন করানোর জন্য যে দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা হয় তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

স্বেচ্ছায় এবং মনোযোগ সহকারে গীবত শ্রবণ করাতেও গীবতের গোনাহ হয়। কারও গীবত করে ফেললে নিজে এস্তেগফার করা, তার জন্য এস্তেগফার করা এবং সম্ভব হলে ও সংগত মনে করলে তার নিকট ওযরখাহী করা উচিত। এভাবেই গীবতের পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। কাউকে গীবত করতে শুনলে তাকে বাধা দাও, না পারলে সে মজলিস ত্যাগ কর, না পারলে সে কথা থেকে মনোযোগ হটিয়ে মনে মনে অন্য কিছু ভাবতে বা পড়তে থাক।

নিজের বড়ত্ব বোধ এবং অন্যকে ক্ষুদ্র জানার মনোভাব থেকে গীবত করার মনোবৃত্তি জাগ্রত হয়। তাই এটা মানসিক ব্যাধির অন্তর্ভুক্ত।

গীবতের বদ অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য করণীয় হল–

(১) কারও গীবত করে ফেললে তার প্রশংসা করা। এভাবে মনের উপর উল্টো চাপ দিলে মনের বক্র চাহিদা সোজা হয়ে যাবে।

(২) তার জন্য দু'আ ও এস্তেগফার করা। এ দ্বারাও মনের উপর উল্টো চাপ সৃষ্টি হবে।

(৩) তাকে এ বিষয়টা জানিয়ে দিয়ে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। তবে হিতে বিপরীত হওয়ার আশংকা থাকলে তাকে জানাবে না।

(৪) কারও সম্পর্কে কিছু বলতে মনে চাইলেও চিন্তা করে নেয়া যে, এটা গীবত হয়ে যাচ্ছে না তো? যদি গীবতের পর্যায়ভুক্ত হয় তাহলে তা না বলা।

(৫) গীবত হয়ে গেলে নিজে তওবা এস্তেগফার করা এবং ভবিষ্যতে আর গীবত না করার প্রতিজ্ঞা করা।

(৬) গীবত কখনো ক্রোধ থেকে করা হয়, কখনও অহংকারের কারণে হয়, কখনও সম্মানের মোহ থেকে হয় আবার কখনও হিংসা-বিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্যে হয়ে থাকে। যে কারণে গীবত হয় সে কারণের চিকিৎসা করা দরকার।

চোগলখোরী: (কুটনামী)

চোগলখোরী অর্থ ফ্যাসাদ লাগানোর জন্য কারও এমন কথা বা কাজ সম্পর্কে অন্যকে অবহিত করে দেয়া, যা সে তার কাছে গোপন করতে ও গোপন রাখতে চায় এবং তার শ্রুতিগোচর হওয়াকে সে অপছন্দ করে।

এটা কোন দোষের কথা বা দোষের কাজ হলে চোগলখোরীর সাথে সাথে গীবতও হয়ে যাবে, তাহলে তা একই সাথে দুটো পাপের হবে। আর প্রকৃত পক্ষে সে দোষ তার মধ্যে না থাকলে বুহতান বা মিথ্যা অপবাদের গোনাহও হবে। চোগলখোরী করা কবীরা গোনাহ, যা মানুষের পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ককে ধ্বংস করে দেয় এবং সামাজিক ফ্যাসাদ ঘটায়। গীবত ও মিথ্যা বলার বদ-অভ্যাস থেকে পরিত্রাণের যে পন্থা, চোগলখোরী থেকে পরিত্রাণের পন্থাও তাই।

গালি-গালাজ ও অশ্লীল কথা বলা

যেটা প্রকাশ করতে মানুষ শরমবোধ করে, এটাকেই পরিস্কার ভাষায় ব্যক্ত করাকে বলা হয় গালি বা অশ্লীল কথা। আর যদি সেটা অবাস্তব হয় তাহলে মিথ্যা অপবাদের গোনাহও হবে। কাউকে গালি দেয়া হারাম, এমনকি কাফের বা জীবজন্তুকেও। মিথ্যা ও বেশী কথা বলার বদ-অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য যে চিকিৎসা এর চিকিৎসাও অনুরূপ।

রসিকতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা

কারও চলা ফেরা, উঠা-বসা, বলা, দেখা, গঠন-আকৃতি ইত্যাদি যে কোন বিষয়ের দোষ এমনভাবে প্রকাশ করা যে, মানুষের হাসির উদ্রেক করে, কিম্বা কাউকে লোক সমক্ষে হেয় করাকে বলা হয় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা। যে কোন রকম ব্যঙ্গ দ্বারাই মানুষ আত্মমর্যাদায় আঘাত পেয়ে থাকে। শরীআতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা তাই নিষিদ্ধ। তদ্রূপ এমন রসিকতাও শরীআতে নিষিদ্ধ যাতে কেউ মনে কষ্ট পায়। রসিকতা শরীআতে জায়েয, যদি রসিকতার মধ্যে অবাস্তব কিছু বলা না হয় এবং শ্রোতার মনে আঘাত না লাগে। যে রসিকতা দ্বারা শ্রোতার অন্তরে আঘাত লাগা নিশ্চিত, সেরূপ রসিকতা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তাছাড়া রসিকতাকে অভ্যাস বানানোও ঠিক নয়, মাঝে মধ্যে উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে করা যেতে পারে। এ রোগের চিকিৎসাও পূর্বে উল্লেখিত রোগের চিকিৎসার ন্যায়।

রুক্ষ কথা বলা

কথা নরমে এবং মিষ্টভাবে বলা শরীআতের কাম্য। এমনকি হক কথাও এমন রুক্ষভাবে বলা ঠিক নয় যাতে শ্রোতার মনে আঘাত লাগে। কারণ তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। অনেক সময় রুক্ষ কথা স্বভাবগত কারণে হয়ে থাকে, আবার বদ-অভ্যাসের কারণেও হয়। স্বভাবেরতো

পরিবর্তন হয় না তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতি সমূহ গ্রহণ করলে অভ্যাসগত কারণে হয়ে থাকলে তার পরিবর্তন হবে এবং স্বভাবগত করণে হয়ে থাকলেও কিছুটা মার্জিত হবে –

(১) কথা বলার সময় এই অভ্যাসটা ক্ষতিকর-এই চিন্তা করে লৌকিকতা করে হলেও নরমে এবং মিষ্টভাবে বলার চেষ্টা করা।

(২) হক কথা কারও কাছে তিক্তবোধ হলেও বলবে- এই মনোভাব যখন আসবে তখন সে হক কথা তখনই বলার একান্ত প্রয়োজন হলে নিজে না বলে অন্যের দ্বারা বলাবে, আর তখনই বলার আবশ্যকতা না থাকলে কিছুদিন সে নসীহত করা বা এরূপ কথা বলা বন্ধ রাখবে। এভাবে কিছু দিনের মধ্যে স্বভাবে ভারসাম্যতা পয়দা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

মিথ্যা বলা

যেটা বাস্তব নয়-এরূপ কথা হল মিথ্যা। মিথ্যা বলাও একটা মানসিক রোগ। কথার চমৎকারিত্ব ফোটানো, জানার কৃতিত্ব ফলানো বা কোন স্বার্থ উদ্ধারের মানসিক চাহিদা থেকেই সাধারণত মিথ্যা বলা হয়ে থাকে।

মিথ্যা বলা গোনাহে কবীরা। হাদীছে মিথ্যাকে গোনাহের মাতা অর্থাৎ, বহু গোনাহের জন্মদাত্রী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাহ্কীক তদন্ত ও যাচাই না করেই কোন কথা বর্ণনা করা বা তাহ্কীক ছাড়াই যে কোন কথা শুনে সাথে সাথে তা বলে দেয়াও মিথ্যা বলার মত গোনাহ। তবে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে কোন কথা জানলে তা তাহ্কীক ছাড়াই বলা ও বর্ণনা করা যায়। তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা হারাম ও গোনাহে কবীরা। যে তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বা অবাস্তব কিছু বলার অনুমতি রয়েছে তা হল-

(ক) বিবদমান দুইজন বা দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ নিরসন ও মিল মহব্বত সৃষ্টি করে দেয়ার উদ্দেশ্যে

(খ) স্ত্রীকে খুশী করার উদ্দেশ্যে।

(গ) যুদ্ধের সময় যুদ্ধের কৌশল হিসেবে। তবে কেউ কেউ এক্ষেত্রে সরাসরি মিথ্যা না বলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার পরামর্শ দিয়েছেন।

মিথ্যা বলার বদ-অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য একটা জিনিসেরই প্রয়োজন আর তা হল "ইচ্ছা"। প্রত্যেকটা কথা বলার পূর্বে চিন্তা করা যে, এটা মিথ্যা নয়তো? হলে তা বর্জন করা। এভাবেই মিথ্যা বর্জনের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

বেশী কথা বলা

দ্বীনী ও প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া বেশী কথা বলাও একটি বদ-অভ্যাস। এর দ্বারাও মানুষ শত শত গোনাহে লিপ্ত হয়; যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা, নিজের বড়াই বয়ান করা, কাউকে অভিশাপ দেয়া, কারও সাথে অহেতুক তর্ক জুড়ে দেয়া, অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা করতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেলা ইত্যাদি। এর বিপরীত কম কথা বলার অভ্যাস থাকলে বহু পাপ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। তাই কম কথা বলা ভাল। বেশী বলার রোগের চিকিৎসা হল−

(১) কথা বলার পূর্বে চিন্তা করে নেয়া। ছওয়াবের বা দরকারী হলে বলা আর না হলে বর্জন করা।

(২) ভিতর থেকে নফ্স বলার জন্য খুব বেশী তাগাদা করলে তাকে এই বলে বোঝানো যে, এখন চুপ থাকতে যে কষ্ট, তার চেয়ে বেশী কষ্ট হবে দোযখের আযাবে। একান্ত না বলে থাকতে না পারলে অল্প বলে চুপ হয়ে যাবে। এভাবে কথা কম বলার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

(৩) একান্ত জরুরত না হলে কারও সাথে দেখা সাক্ষাৎ করবে না।

বি. দ্র. চরিত্র মনোবিজ্ঞান অধ্যায়ে "মন নিয়ন্ত্রণ" বিষয় থেকে এ পর্যন্ত বিষয়গুলোর সিংহ ভাগ তথ্য তাসাওউফ-এর কিতাবাদি থেকে গৃহীত। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকায় এসবের দলীল পেশ করা থেকে বিরত থাকা গেল।

তোষামোদ বা চাটুকারিতা

তোষামোদ বা চাটুকারিতা হল নিজের স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে অন্যকে খুশী করার জন্য নিজের ধারণা ও বিশ্বাসের উল্টো তার প্রশংসা করা এটা এক ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণা। আরবীতে তোষামোদকে বলা হয় তামাল্লুক। এর বিপরীত পক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষে সকলের সাথে স্বচ্ছ ও খোলা মন নিয়ে বাস্তবতার নিরিখে মনের কথা যথাযথ ভাবে প্রকাশ করাকে বলা বাস্তববাদিতা বা স্বচ্ছতা। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বচ্ছতা বা বাস্তববাদিতার অর্থ আদৌ এই নয় যে, প্রত্যেকটা সত্য কথাই সব স্থানে প্রকাশ করে দিতে হবে। বরং অনেক স্থানে বলার চেয়ে চুপ থাকাই শ্রেয় হতে পারে। বিনা প্রয়োজনে অন্যের অনুভূতিতে আঘাত হানবে বা অন্যকে বিব্রত করবে-এরূপ কথা প্রকাশ করাকে বাস্তববাদিতা আখ্যা দেয়া যাবে

না। কিম্বা বাস্তববাদিতার যুক্তিতে নিজের কৃতিত্বের কথা গেয়ে বেড়ানো, নিজের মনের গোপন কথা, নিজের পরিবার পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবের গোপন রহস্য প্রকাশ করে দেয়া সমীচীন নয়। বাস্তববাদিতার অর্থ হল যেখানে যতটুকু বলতে হবে তা যেন অবশ্যই বাস্তবানুগ হয় এবং তাতে কোনরূপ কপটতা না থাকে।

তোষামোদ যে প্রতারণা, কপটতা ও পাপ একথা স্মরণে রাখলেই তোষামোদের মনোবৃত্তি অবদমিত হবে।

কয়েকটি উত্তম চরিত্র ও তা অর্জনের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া

সবর বা ধৈর্য

সবর অর্থ মনকে মজবূত রাখা, মনকে ধরে রাখা। সবর কয়েক প্রকার–

(ক) ইবাদতের সময় সবর অর্থাৎ, ইবাদত ও নেক কাজের উপর মনকে পাবন্দির সাথে ধরে রাখা এবং ধৈর্য সহকারে সহীহ তরীকায় আদায় করা।

(খ) গোনাহের সময় সবর অর্থাৎ, মনকে গোনাহ থেকে দূরে ধরে রাখা,

(গ) কষ্ট ও বিপদ-আপদের সময় সবর অর্থাৎ, কেউ কোন কষ্ট দিলে প্রতিশোধ না নেয়া এবং রোগ-ব্যাধি হলে বা জান-মালের ক্ষতি হলে বে-সবর হয়ে শরীআতের খেলাফ কোন কথা মুখ থেকে বের না করা বা বয়ান করে ক্রন্দন না করা।

সবর গুণ একটি মনের গুণ। মন থেকেই তার উৎপত্তি ও মন কর্তৃক তা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সবর গুণ বহু ধরনের সচ্চরিত্রের বুনিয়াদ বা ভিত্তি। সবর অর্জন করার মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হল–

(১) খাহেশাতে নফছানী বা প্রবৃত্তিকে দুর্বল করা।

(২) ধর্মীয় উপায় উপকরণকে সুদৃঢ় করা। যেমন ইবাদত করলে, গোনাহ থেকে বিরত থাকলে এবং কষ্ট ও বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা যে ছওয়াবের ওয়াদা করেছেন তা স্মরণ করা।

(৩) রোগ-ব্যাধি ও জান-মালের ক্ষয় ক্ষতি হলে মনকে এই বলে বোঝানো যে, এই সবই আমার কোন না কোন মঙ্গলের জন্য হচ্ছে, যদিও আমি বুঝছি না। তা ছাড়া ধৈর্য ধারণ করলে এতে আমার পাপ মোচন হয়ে দরজা বুলন্দ হবে। তদুপরি আমি সবর না করলেও তাকদীরে যা আছে তাতো হবেই। আমি বে-সবরী করে অহেতুক ছওয়াব হারাব কেন?

হিল্‌ম বা সহনশীলতা

রাগ দমন করার গুণটি যখন স্বভাবে পরিণত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে সে গুণটিকে বলা হিল্‌ম বা সহনশীলতা। যেমন রাগের মুহূর্তে উত্তেজনাকে বলপূর্বক দমন করে রাখলে সেটা হবে রাগ দমন, আর সর্বক্ষণ এরূপ করতে করতে যখন রাগ দমন করাটা তার স্বভাবে পরিণত হবে তখন সেটা সহনশীলতা বলে আখ্যায়িত হবে।

রাগ-এর মুহূর্তে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার যে মনস্তাত্ত্বিক কৌশলাদি বর্ণনা করা হয়েছে উপর্যুপুরি সেগুলি অবলম্বন করতে থাকলে সহনশীলতার গুণ অর্জিত হবে। বিশেষভাবে সহনশীলতার গুণ আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় একথাও স্মরণে রাখতে হবে। রাসূল (সা.) আব্দুল কায়ছ গোত্রের নেতাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

اِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمَ وَالْاَنَاةَ.

অর্থাৎ, তোমার মধ্যে এমন দুটো চরিত্র আছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন। তা হল সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য। (মুসলিম : ১ম)

ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন

বিপদ-আপদে মানুষের প্রতি দয়া করা এবং অপরাধীকে ক্ষমা করাও উত্তম চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী যে মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে না আল্লাহও তার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এখানে ক্ষমা করার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যদিও যে পরিমাণ যুলুম কেউ করে ততটুকু প্রতিশোধ তার থেকে নেয়া জায়েয, তবে উত্তম হল প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেয়া। তবে উল্লেখ্য যে, এই ক্ষমা করার প্রশ্ন ব্যক্তিগত হক নষ্ট করার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে কেউ দ্বীনের হক নষ্ট করলে, যেমন মুরতাদ হয়ে ধর্মের অবমাননা করলে তা ক্ষমাযোগ্য নয়। এমনিভাবে বিচারক আইন অনুযায়ী অপরাধের বিচার করবে, অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারবে না কারণ, সেটা তার ব্যক্তিগত হক নষ্ট হওয়ার সাথে জড়িত বিষয় নয়।

দয়া শুধু মুসলমানদের প্রতি নয় বা আপনজনদের প্রতি নয়। আপন-পর, শত্রু-বন্ধু, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের প্রতি, এমনকি অবলা জীব-জন্তুর প্রতিও দয়া প্রদর্শনের আদর্শ ইসলামে রয়েছে। এই দয়া যেমন পার্থিব কষ্ট ক্লেশ দূর করার জন্য হবে, তেমনি পরকালীন

কষ্ট ক্লেশ দূর করার জন্যও দয়া প্রদর্শিত হতে হবে। ঈমানহীনের ঈমান এবং আমলহীনের আমল পয়দা করার জন্য মনের পেরেশানীও তাই বড় দয়া বলে গণ্য।

আমার দোষ-ত্রুটি অন্যে বড় করে না দেখুক বরং ক্ষমা করুক আমি যেমন এটা চাই, অন্যেওতো অনুরূপ চাইবে-একথা স্মরণ করলে ক্ষমা করার মনোভাব জাগ্রত হবে। আর দয়া প্রদর্শন মহত্ত্বের গুণ এবং তা আল্লাহর দয়া লাভের মাধ্যম-একথা চিন্তা করলে দয়ার জন্য মনে উদ্বেলতা জাগতে থাকবে।

উদারতা

ব্যক্তি স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে সার্বজনীন স্বার্থের চিন্তায় মনের বিকশিত হওয়াকে বলা হয় উদারতা। উদারতার বিপরীত চরিত্রকে বলা হয় সংকীর্ণতা। চিন্তার সংকীর্ণতা বহু ধরনের পংকিলতার উৎস হয়ে থাকে। সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে উন্নত চরিত্র সৃষ্টি হয় না। এরূপ মানসিকতা মানুষের জ্ঞানকে পক্ষপাতগ্রস্ত ও অনুভূতিহীন করে ফেলে। এই সংকীর্ণ মন-মানসিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ মানুষ আমিত্বকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ফলে ব্যক্তি স্বার্থের বাইরে সে কিছু চিন্তা করতে পারে না, সমাজ দেশ ও জাতির জন্য কোন বিরাট অবদান রাখতে পারে না। ক্ষমা, দয়া, আত্মত্যাগ প্রভৃতি বহু গুণ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়ে যায় এই উদারতা না থাকার ফলে। এদিক থেকে চিন্তা করলে উদারতা এমন এক চরিত্র যা বহু চরিত্রের উৎসমূল। আমি শুধু আমার জন্য নই, আমার সবকিছু শুধু আমারই জন্য নয়-আমি পূর্ণাঙ্গ সমাজ- দেহের একটি অংশ মাত্র- এরূপ চিন্তা করা অর্থাৎ, চিন্তার পরিধিকে বিস্তৃত করা উদারতা সৃষ্টির সহায়ক হয়ে থাকে। তদুপরি উদার মানুষের সাহচর্য এবং এমন মহামনীষীদের জীবনী পাঠও উদারতার মনোভাব জাগ্রত করে থাকে, যারা আত্মত্যাগ ও সার্বজনীন সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন।

সদ্ব্যবহার

ইসলাম আপন-পর, ছোট-বড়, মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের সাথে এমনকি অবলা প্রাণীর সাথেও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। কারও সাথে সদ্ব্যবহারের অর্থ হল তার সাথে যা করণীয় তা করা এবং তার হক বা অধিকার সমূহ আদায় করা। তাই মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও

বন্ধু-বান্ধব থেকে শুরু করে সর্বশ্রেণীর মানুষ এমন কি জীব-জন্তুর অধিকার পর্যন্ত সবকিছু রক্ষা ও আদায় করা এই সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত।

মনকে সকলের অধিকার আদায়ের জন্য সচেতন করে তুললেই সদ্ব্যবহার গুণ অর্জিত হবে।

ইনসাফ ও ন্যায় পরায়ণতা

যার যা হক ও প্রাপ্য, তাকে তা যথাযথভাবে দেয়া তথা প্রত্যেকটা বিষয়কে স্বস্থানে ও স্বগন্ডির মধ্যে রাখাকেই বলা হয় ইনসাফ বা ন্যায়-পরায়ণতা। আর তার চেয়ে কম করা হল যুলুম বা অবিচার। ইসলামে ইনসাফ ও ন্যায্য বিচারের গুরুত্ব এত বেশী যে, অমুসলিমদের সাথেও তা রক্ষা করার হুকুম দেয়া হয়েছে। যুলুম ও অবিচারকে হারাম করা হয়েছে। ফয়সালার ক্ষেত্রে নিজের ও অন্যের মধ্যে ব্যবধান করার তথা পক্ষপাতিত্ব করার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ইনসাফ করতে হবে, যদিও তা আপনজনের বিরুদ্ধে চলে যায়।

ইনসাফের পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হল পক্ষপাতিত্বমূলক মানসিকতা। প্রেম, ভালবাসা, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, ব্যক্তি স্বার্থ, বাহ্যিক প্রভাব প্রভৃতি আকর্ষণের প্রতি অন্ধভাবে ঝুঁকে পড়া থেকে পক্ষপাতিত্বের মনোভাব সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব যে কোন আকর্ষণের প্রতি অন্ধভাবে ঝুঁকে পড়ছি কি-না- এ ব্যাপারে সচেতন থাকলে ইনসাফের উপর কায়েম থাকা সহজ হবে। স্বীয় প্রবৃত্তি ও স্বভাবজাত আকর্ষণাবলী প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখতে হবে এবং উদার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। তাহলেই ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।

অঙ্গীকার রক্ষা করা

অঙ্গীকার রক্ষা করা তথা ওয়াদা খেলাফ না করা সততারই অংশ বিশেষ। অন্য কথায় অঙ্গীকার পূরণ করা সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার সমপর্যায়ের একটা গুণ। এর বিপরীত হল প্রতারণা, যা মিথ্যা ও অবিচারের সমপর্যায়ভুক্ত। অঙ্গীকার রক্ষা করা ওয়াজিব। এমনকি বালক বা শিশুকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য কোন কিছু প্রদানের অঙ্গীকার করলেও তা পূরণ করা জরূরী। পুরণ করার নিয়ত না থাকলে অঙ্গীকার করবে না। কেননা এরূপ অঙ্গীকার শিশুদের মধ্যে প্রতারণার মানসিকতা সৃষ্টি করবে। তবে কোন পাপ কাজের অঙ্গীকার করলে তা পুরণ করা যাবে না।

অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূল (সা.) তাঁর ভাষণে প্রায়ই বলতেন, যে ব্যক্তি নিজ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের বিষয়ে যত্নবান নয়, দ্বীন ইসলামের মধ্যে তার কোন অংশ নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, অঙ্গীকার করার সময় যদি তা পূরণ করার নিয়ত থাকে, পরে বাস্তবসম্মত অসুবিধার কারণে তা পূরণ করতে পারল না বা বিলম্ব হল, তাহলে তাতে পাপ হবে না। কেননা, এটা প্রতারণার পর্যায়ে পড়ে না। অতএব অঙ্গীকার করার সময় মন প্রতারণা করছে কি-না-এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

পাক-সাফ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাকে আল্লাহ পছন্দ করেন। এজন্যেই ইসলাম শরীর, কাপড়-চোপড়, ঘর-বাড়ির আঙ্গিনা ইত্যাদিকে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। শরীরের অবাঞ্ছিত পশম নিয়মানুযায়ী কেটে বা উপড়ে ফেলা, খতনা করা, নখ কাটা, মোচ কাটা এসবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আওতাভুক্ত। এসব হল যাহেরী অর্থাৎ, বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা। এর সাথে রয়েছে বাতেনী অর্থাৎ, আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার দিক। মনের রোগ থেকে নফস ও আত্মাকে এবং কু-চরিত্র থেকে আখলাককে পবিত্র করার মাধ্যমেই এ দিকটি অর্জিত হবে। বাহ্যিকভাবে অপরিচ্ছন্ন থাকলেও তার মন অপরিচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে। বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং বাহ্যিক শৃঙ্খলা মানসিক পরিচ্ছন্নতা এবং মানসিক শৃঙ্খলা বোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে থাকে।

বিনয় ও নম্রতা

তাওয়াযু অর্থাৎ, বিনয় বা নম্রতা বলা হয় নিজেকে ছোট মনে করা ও নিজের অহমিকাবোধ বিলীন করাকে। সমস্ত মুসলমানের চেয়ে নিজেকে ছোট মনে করতে হবে। যদিও আপাত ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাউকে নিজের চেয়ে অধিক পাপী ও অপরাধী বলে মনে হয়, তবুও তার থেকে নিজেকে ছোট মনে করতে হবে এই ভেবে যে, হতে পারে তার মধ্যে এমন কোন গুণ রয়েছে যার ভিত্তিতে আল্লাহর নিকট সে আমার চেয়ে বেশী পছন্দনীয়, কিম্বা ভবিষ্যতে সে আমার চেয়ে অধিক গুণাবলীর অধিকারী হবে এবং সে অবস্থায়ই সে আল্লাহর নিকট হাজির হয়ে আমার চেয়ে বেশী পছন্দনীয় হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে আমার পরিণতি কি হবে তা আমার জানা নেই।

পরিণামের দিকে নজর দিয়ে একজন কাফের থেকেও নিজেকে বড় মনে করার উপায় নেই। কেননা, মৃত্যুর পূর্বে তারও ঈমান নছীব হতে পারে; পক্ষান্তরে ঈমানের সাথে আমার মৃত্যু হওয়ার কোন গ্যারান্টি আমার কাছে নেই। তবে বর্তমানের অবস্থায় একজন কাফেরের যেহেতু ঈমান নেই আর আমার ঈমান নছীব হয়েছে, তাই বর্তমানের বিচারে আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ-এই বোধ রাখতে হবে। এটা তাওয়াযু' বা বিনয়ের পরিপন্থী অর্থাৎ, অহংকার নয় বরং এটা হল দ্বীনী আত্মমর্যাদাবোধ এবং আল্লাহ আমাকে ঈমানের মত বড় নেয়ামত দান করেছেন এই নেয়ামতের প্রতি বড়ত্ববোধ।

মনে রাখতে হবে তাওয়াযু' প্রকাশ করতে গিয়ে যেন আল্লাহর কোন নেয়ামতের না শুকরী প্রকাশ না হয়ে পড়ে, কিম্বা আত্মমর্যাদাকে যেন জলাঞ্জলি দেয়া না হয়। বস্তুত আত্মমর্যাদা জলাঞ্জলি দেয়া আর বিনয় বা নম্রতা প্রকাশ এক কথা নয়। নিজের ক্রটি ও অক্ষমতার দিক বিবেচনা থেকে সৃষ্টি হয় বিনয় বা নম্রতা আর নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যখন নিজের অপমান ও লাঞ্ছনাকে মাথা পেতে নেয়া হয় তাকে বলা হয় আত্মমর্যাদা জলাঞ্জলি দেয়া। বিনয় হল প্রকৃষ্টতা আর শেষোক্তটি হল হীনতা।

সততা ও সত্যবাদিতা

ইসলামে সততা ও সত্যবাদিতার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, মোআমালা-মোআশারা যাবতীয় ক্ষেত্রে সত্য কথা বলা ও সততার উপর টিকে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সত্যবাদী ও সত্যপরায়ণ লোকদের সঙ্গ ও পক্ষ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে এবং এর বিপরীত মিথ্যাকে করা হয়েছে হারাম। মিথ্যাচারিতার পরিণাম হল ধ্বংস ও ব্যর্থতা। কথা-বার্তার ক্ষেত্রে যেমন সত্যবাদিতা রয়েছে, তেমনিভাবে আচার-আচরণ ও হাব-ভাবের ক্ষেত্রেও সততার উপর টিকে থাকতে হবে। এমনকি সত্য ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তা পর্যন্ত করা যাবে না। কর্ম, চিন্তা সংকল্প সব ক্ষেত্রেই থাকতে হবে সত্যবাদিতা।

আমানতদারী

আমানতদারী হল সততা ও সত্যবাদিতার একটি বিশেষ অংশ। মানুষ অর্থ সম্পদ গচ্ছিত রাখলে তা যথাযথ ভাবে আদায় করা যেমন আমানতদারী, তেমনিভাবে কেউ কোন গোপনীয় কথা জানালে বা

কোনভাবে কারও কোন গোপনীয় বিষয় জানতে পারলে তা গোপন রাখাও আমানতদারীর অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শরীআতের যে বিধি-বিধান দিয়েছেন তা সমুদয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমানত, তার হক আদায় করাও আমাদের উপর ওয়াজিব। টাকা-পয়সার আমানত, কথার আমানত, কাজের আমানত, দায়িত্বের আমানত ইত্যাদি যে কোন আমানতের খেয়ানত করা কবীরা গোনাহ।

গায়রত বা আত্মমর্যাদাবোধ

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বা শ্রদ্ধেয় বস্তুর নিন্দা বা অবমাননা দেখলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে একটা ক্রোধভাবের উদ্রেক হয়, এই ক্রোধভাবকে বলা হয় গায়রত বা আত্মমর্যাদাবোধ। যেমন মাতা-পিতাকে কেউ গালি দিলে বা নিন্দা করলে ক্রোধের অনুপ্রেরণা জাগ্রত হয় এবং আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লেগে থাকে। এরূপ আল্লাহ, আল্লাহ্র রাসূল, কুরআন, কা'বা, ইসলাম, দ্বীন, ঈমান প্রভৃতির অবমাননা বা তিরস্কার ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য হতে দেখলে মুসলমানদের অন্তরে এই গায়রত জাগ্রত হওয়া উচিত। এই গোস্বা দোষণীয় নয় বরং প্রশংসনীয়। এটা মানুষকে ইজ্জত-সম্মান বহাল রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। এ চেতনা ঈমানের পরিচায়ক। আর এই চেতনা না থাকা ঈমানহীনতার পরিচায়ক। নিজের সম্মান, পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান এবং দেশ ও জাতির সম্মান সংরক্ষণের জন্যে ক্রোধের অনুপ্রেরণাও এই আত্মমর্যাদা বোধের পরিধিভুক্ত।

দেশাত্মবোধ

নিজের জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা ও প্রেমানুভূতিকে বলা হয় দেশাত্মবোধ। শরীআতের দৃষ্টিতে দেশাত্মবোধ একটি প্রশংসনীয় গুণ। তিরমিযী শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে-রাসূল (সা.) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় রওয়ানা হন তখন বারবার মক্কাভূমির দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন এবং বলছিলেন, হে মক্কার মাটি! আমার গোত্র যদি আমাকে দেশত্যাগে বাধ্য না করত, তাহলে কখনো তোমায় আমি ছেড়ে যেতাম না। এখানে একথাও উল্লেখ্য যে, দেশপ্রেমের এই প্রেরণা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশংসনীয়, যতক্ষণ তা জাতীয় গোঁড়ামি ও বিদ্বেষে পরিণত না হয় এবং

মানবীয় ভ্রাতৃত্বের সাথে তার সংঘাত না ঘটে; যেমনটি ঘটেছিল হিটলার ও নাজিবাদের আধুনিক ইউরোপীয় দেশাত্মবোধের ফলশ্রুতিতে এবং যা সূচনা করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের।

দেশাত্মবোধ একটি স্বভাবজাত প্রেরণা। জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণকে গভীরতর পর্যায়ে নিয়ে গেলেই তা দেশাত্মবোধে পরিণত হয়। আল্লাহ যে ভূখন্ডকে আমার জন্মভূমি বানিয়েছেন, আমার জীবন কর্মময়তায় মণ্ডিত হবে সেখানে, সেই আমার আপন ভূমি-এরূপ চিন্তা থেকেই দেশাত্মবোধ জন্ম নিয়ে থাকে।

হায়া বা লজ্জা

নিন্দা সমালোচনার ভয়ে কোন দোষণীয় কাজ করতে মানুষের মধ্যে যে জড়ত্ববোধ হয়ে থাকে, সেটাকে বলে হায়া বা লজ্জা। এই লজ্জা মানুষকে ভাল কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্যেই হাদীছে বলা হয়েছে,

اَلْحَيَاءُ لَايَاْتِيْ اِلَّا بِخَيْرٍ.

অর্থাৎ, লজ্জা কেবল সুফল ও কল্যাণই বয়ে আনে। (বোখারী ও মুসলিম)

এর বিপরীত লজ্জা না থাকলে সে যে কোন অন্যায় কাজই করতে পারে। তাই প্রসিদ্ধ আছে–

اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ.

অর্থাৎ, যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন যা ইচ্ছা তাই কর।

এখানে উল্লেখ্য যে, কোন ভাল কাজ করতে যদি কখনও জড়তা বোধ হয়, তাহলে সেটা লজ্জা বা প্রশংসনীয় গুণ বলে আখ্যায়িত হবে না। যেমন পর্দা করতে বা দাড়ি রাখতে বা টুপি মাথায় দিতে জড়তা বোধ হল। এটা লজ্জা বা হায়া নয় বরং এটা হল ধর্মীয় হীনমন্যতা বোধ। এমনিভাবে নিজেকে অত্যন্ত ছোট করে প্রকাশ করা, যেখানে সেখানে চুপ করে থাকা এবং হীনতা প্রকাশ করা, এটাও লজ্জা বা হায়া বলে প্রশংসিত হবার নয় বরং এটা হল স্বভাবগত দুর্বলতা।

কেউ যদি দৈহিক ও আত্মিক শক্তিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও যথাস্থানে প্রয়োগ করে এবং পানাহারের চাহিদা ও আত্মিক কামনা সমূহকে নিয়ন্ত্রণ ও যথাস্থানে প্রয়োগ করে, তাহলে তার মধ্যে লজ্জার যথার্থ বিকাশ ঘটবে। (নীতি দর্শন-আদাবুদ্দুনিয়া ওয়াদ্দীন)

অতিথি পরায়ণতা

অতিথি পরায়ণতা মূলত একটি মনের চরিত্র। মেহমানকে শুধু পর্যাপ্ত আপ্যায়ন করানোর নাম অতিথি পরায়ণতা নয় বরং সাধ্য অনুযায়ী মেহমানকে আপ্যায়নতো রয়েছেই, সেই সাথে প্রফুল্ল চিত্তে মেহমানকে গ্রহণ করা ও তার সাথে সম্মানজনক আচরণ করা এবং বিকশিত মনে মেহমানকে গ্রহণই হল সত্যিকার অতিথি পরায়ণতা।

মেহমান এলে আমার পানাহারে শরীক হবে, আমার আর্থিক ক্ষতি হবে, ঝামেলা বাড়বে-এইসব চিন্তা মনকে বিকশিত হতে দেয় না, আর এটাই অতিথি পরায়ণতা গুণ সৃষ্টি হওয়ার অন্তরায়। পক্ষান্তরে যদি কেউ চিন্তা করে যে, তাকদীরের বিশ্বাস অনুসারে মেহমান তারই হিস্যা ভোগ করবে, আমার নয়। তদুপরি আমি মেজবানের প্রতি মেহমানের হক বা অধিকার রয়েছে, তাহলে আতিথ্যের জন্য মন আর সংকুচিত হবে না বরং বিকশিত হবে এবং এভাবেই সৃষ্টি হবে অতিথি পরায়ণতার চরিত্র। হাদীছে এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমার প্রতি তোমার মেহমানের হক বা অধিকার রয়েছে।

ভ্রাতৃত্ব ও স্নেহ-মমতা

ভ্রাতৃত্ব ও স্নেহ-মমতা উত্তম চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। হৃদয়ের যে কমনীয়তা, মাধুর্য, আবেগ, অনুরাগ এবং অনুগ্রহ; ক্ষেত্র বিশেষে সেটাকে স্নেহ-মমতা বলা হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে সেটাকে প্রেম-ভালবাসা বলে ব্যক্ত করা হয়। আবার গুরুজন ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির প্রতি সেটাকে নিবেদন করা হলে তা ভক্তি-শ্রদ্ধা বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। আর এসব অনুভূতি যখন আপন মনের গণ্ডি ছাড়িয়ে সার্বজনীন মানুষের প্রতি মানুষ হিসেবে নিবেদিত হয়, তখন তাকে বলা হয় সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং শুধু মুসলমানদের প্রতি নিবেদিত হলে সেটাকে বলা হয় ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

ইসলামে স্নেহ-মমতা ও ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব এত বেশী যে, কারও মধ্যে এ গুণ উপস্থিত না থাকলে সে যেন মুসলমান বলেই আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য থাকে না। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا.

অর্থাৎ, যারা ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা এবং বড়দের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। (তিরমিযী)

ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে,

اَلْمُسْلِمُوْنَ كُلُّهُمْ كَجَسَدٍ وَاحِدٍ.

অর্থাৎ, সমস্ত মুসলমান একটা দেহের ন্যায়।

একটা দেহের কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয়, তাহলে অন্যান্য অঙ্গ যেমন তা উপলব্ধি করতে পারে, তদ্রূপ সমস্ত মুসলমানের মধ্যে একের প্রতি অন্যের এরূপ একাত্মতা ও সহমর্মিতা থাকতে হবে।

সমস্ত মানুষ একই পরিবারভুক্ত, সকলেই এক আল্লাহ্‌র বান্দা, সকলেই এক আদমের সন্তান- মনের মধ্যে এই উপলব্ধি বদ্ধমূল ও উজ্জীবিত থাকলে পারস্পরিক একাত্মতা ও সহমর্মিতা বোধ উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। এক হাদীছে বলা হয়েছে,

كُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ اِخْوَانًا.

অর্থাৎ, তোমরা সকলে এক আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে জীবন যাপন কর। (বোখারী ও মুসলিম)

হাদীছে আরও ইরশাদ হয়েছে,

اَلَا كُلُّكُمْ اِبْنُ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ.

অর্থাৎ, তোমরা সকলেই এক আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ত্যাগ ও বদান্যতা

চরিত্র বিশেষজ্ঞ হাফেজ ইবনে কাইয়েমের মতে ত্যাগ হল কৃপণতার বিপরীত এবং দানশীলতার চূড়ান্ত পর্যায়। আর বদান্যতা অর্থ দানশীলতা। ইমাম গাযযালীর মতেও ত্যাগ হল বদান্যতার চূড়ান্ত রূপ। দানশীলতার তিনটি স্তর রয়েছে। যথা–

(১) নিজের প্রয়োজন পূরণে যেন কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে এই পরিমাণ অন্যের জন্য খরচ করা।

(২) অন্যকে এই পরিমাণ দান করা, যার সমপরিমাণ বা তার চেয়ে কিছুটা কম নিজের কাছে অবশিষ্ট থাকে।

(৩) নিজের প্রয়োজনে ব্যয় না করে নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়া। এই শেষোক্ত পর্যায়টিকে বলা হয় ত্যাগ।

ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্র হক ও বান্দার হকের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে, কৃপণতা বা বখীলীর চেতনা থেকে মনকে নিয়ন্ত্রণ ও কৃপণতার বিপরীত প্রেরণা লাভ করতে হবে এবং সুন্দর চরিত্রের প্রতি আকর্ষণ বোধ সৃষ্টি করতে হবে। (নীতি দর্শন গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

কানাআত বা অল্পে তুষ্টি

অল্পে পরিতৃপ্ত থাকার নাম কানাআত বা অল্পে তুষ্টি। এর বিপরীত মনোভাবকে বলা হয় লোভ-লালসা। পূর্বে বর্ণিত লোভ-লালসা থেকে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি গ্রহণ করলে কানাআত বা অল্পে তুষ্টি গুণ অর্জিত হবে। দুনিয়ার মহব্বত ও সম্পদের মোহ অন্তর থেকে দূরীভূত করতে পারলেও এই অল্পে তুষ্টির গুণ অর্জিত হবে।

জীবিকার ব্যাপারে, অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে সদুপায়ে চেষ্টা করতে হবে, তবে সীমাহীন দূরাকাংখাকে মনে স্থান দেয়া যাবে না বরং বৈধ উপায়ে স্বাভাবিক চেষ্টা সাধনার পর যা পাওয়া যাবে তাতেই তুষ্ট থাকতে হবে। এতেই প্রকৃত মনের শান্তি; অন্যথায় কোটি কোটি টাকার উপর শুয়ে থেকেও মনে শান্তি জুটবে না।

এখলাস ও সহীহ নিয়ত

ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্কে রাজী খুশী করার নিয়তে করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে রাজী খুশী করার ইচ্ছা বা নিজের নফছের কোন খাহেশকে মিশ্রিত না করার নাম হল এখলাস তথা খাঁটি নিয়ত। কোন কোন ইবাদতে কিছু কিছু পার্থিব ফায়দাও হাছিল হয়ে থাকে, তবে সেটাকে উদ্দেশ্য বানিয়ে ইবাদত করা ঠিক নয়। এই এখলাস ও খাঁটি নিয়ত না হলে কোন ইবাদতের ছওয়াব পাওয়া যায় না। নিয়ত খাঁটি করা তথা এখলাস হাছিল করার পদ্ধতি হল–

(১) ইবাদত করার পূর্বে আল্লাহ্র উদ্যেশ্যে করছি-এই চিন্তা করে নেয়া এবং দেলের মধ্য থেকে অন্যান্য বাজে উদ্দেশ্য দূরে নিক্ষেপ করা।

(২) অন্তর থেকে 'রিয়া' দূর করার পদ্ধতি গ্রহণ করা। বস্তু তঃ রিয়া দূর করাই হল এখলাস।

তাকওয়া ও খোদাভীতি

'তাকওয়া' কথাটি শরীআতে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) ভয় (২) বিরত থাকা। বস্তুত ভয় আসলেই মানুষ কোন কিছু থেকে বিরত থাকে; তাই ভয় হল বিরত থাকার কারণ, আর বিরত থাকা

(অর্থাৎ, গোনাহ থেকে বিরত থাকা) হল আসল উদ্দেশ্য। তাকওয়ার কয়েকটি স্তর রয়েছে।

(ক) কুফ্‌র ও শির্‌ক থেকে বিরত থাকা।

(খ) হারাম ও গোনাহে কবীরা থেকে বিরত থাকা।

(গ) গোনাহে সগীরা থেকে বিরত থাকা।

(ঘ) যেখানে হালাল না হারাম-এই সন্দেহ থাকে সেখান থেকে বিরত থাকা।

(ঙ) অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা।

(চ) যে সব মোবাহ কাজ গোনাহের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে তা থেকে বিরত থাকা।

তাকওয়া অর্জনের পন্থা হল–

(১) আল্লাহ্‌র আযাব গযবের কথা, পরকালের আযাবের কথা চিন্তা করা এবং স্মরণ করা।

(২) বুযুর্গদের সোহবত গ্রহণ করা।

(৩) ওলী-আউলিয়াদেরকে কষ্ট না দেয়া।

(৪) সঠিক কথা বলা।

তাফবীয বা নিজেকে আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করা

মানুষ তার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তারপর তার যাহেরী, বাতেনী শারীরিক, মানসিক যা কিছু অনুকূলে বা প্রতিকূলে ঘটবে সেটাকে সে আল্লাহ্‌র হস্তক্ষেপ মনে করবে। এভাবে সে নিজেকে আল্লাহর সোপর্দ করবে। মানুষ চেষ্টা করবে কিন্তু ফলাফল আল্লাহর উপর সোপর্দ করবে। এটাকে বলা হয় তাফবীয। এরূপ করলে ব্যর্থতা আসলেও তার মনে কষ্ট আসবে না-সর্বাবস্থায় আরামবোধ হবে। তবে আরামের নিয়তে তাফবীয করা দ্বীন নয় বরং দুনিয়া; এতে তাফবীযের ছওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে বরং তাফবীয করা কর্তব্য এবং এটা আল্লাহর হক-এই নিয়তেই তাফবীয করতে হবে। এটা হাছিল করার তরীকা হল–

(১) কোন অযাচিত বা অপছন্দনীয় বিষয় ঘটলে সেটাকে আল্লাহর হস্তক্ষেপ মনে করা।

রেযা-বিল-কাযা বা আল্লাহর ফয়সালায় রাযী থাকা

আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহর ফয়সালার উপর অভিযোগ পরিত্যাগ করাকে বলা হয় ‘রেযা বিল কাযা’। মানুষ আসবাব

গ্রহণ করবে, চেষ্টা চরিত্র করবে, দু'আ করবে সুন্নাত এবং আনুগত্য হিসেবে। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফয়সালা ঘটবে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং মুখে বা অন্তরে কোন অভিযোগ আনবে না। স্বয়ং চেষ্টা এবং দু'আ করার সময়ও মনের এই অবস্থা রাখবে যে, উদ্দেশ্য মোতাবেক না ঘটলে তাতেও আমি সন্তুষ্ট। এটাই হল রেযা বিল কাযা। এটা হাছিল করার তরীকা হল–

(১) আল্লাহর মহব্বত হাছিল হলেই রেযা বিল কাযা হাছিল হয়ে যাবে। অতএব এর জন্য আল্লাহর মহব্বত হাছিল করার পন্থা গ্রহণ করতে হবে। (দেখুন শিরোনাম "আল্লাহ্র মহব্বত ও শওক")

(২) বিশেষভাবে এই চিন্তা করা যে, আল্লাহ ভাল, তাঁর সব কাজই ভাল, তিনি পরম দয়ালু, বিন্দুমাত্রও নিষ্ঠুর নন। অতএব তিনি যা করেন তাতেই মঙ্গল নিহিত।

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর ভরসা

আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু হতে পারে না-এই বিশ্বাস রাখা ঈমানের অংশ। যেহেতু তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু হতে পারে না, তাই শরীআতের নিয়মানুযায়ী যে কোন চেষ্টা-তদবীর গ্রহণ করার পর তার কামিয়াবীর জন্য মনে মনে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে। এরূপ ভরসা রাখাকে বলা হয় তাওয়াক্কুল।

উল্লেখ্য যে, চেষ্টা তদবীর না করে হাত-পা গুটিয়ে অকর্মন্য হয়ে বসে থাকা বা চেষ্টা না করে ফলের আশা করা শরীআতের বিধান নয় এবং এটাকে তাওয়াক্কুলও বলা হয় না বরং নিয়মমত চেষ্টা-তদবীর করে নিয়মমত আসবাব গ্রহণ করে তার ফলের জন্য এবং কামিয়াবীর জন্য মনে মনে আল্লাহর উপর ভরসা রাখাকেই বলা হয় তাওয়াক্কুল।

তাওয়াক্কুল হাছিল করার পন্থা হল–

(১) কিছুক্ষণ সময় নির্ধারিত করে এই চিন্তা করা যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ দয়াময়, তিনিই মঙ্গলময়, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কারও কিছু করার ক্ষমতা নেই।

(২) অতীতে আল্লাহর অনুগ্রহে যে সব কামিয়াবী হাছিল হয়েছে সে গুলোকে স্মরণ ও চিন্তা করা।

শোকর

নেয়ামতকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনে করতে হবে। আর যে ব্যক্তি নেয়ামতকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনে করবে, স্বাভাবিকভাবে তার ফলশ্রুতি

স্বরূপ সে আল্লাহ্‌র প্রতি মনে মনে প্রফুল্ল হবে এবং সর্বাগ্রহে সেই অনুগ্রহ দানকারী আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হবে, তাঁর নির্দেশ পালনে তৎপর হবে এবং তাঁর দেয়া নেয়ামতকে তাঁর নাফরমানীর কাজে লাগাবে না। এটাকেই বলা হয় শোকর বা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা।

শোকর হাছিলের তরীকা হল–

(১) আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহ সমূহকে স্মরণ করা এবং চিন্তা করা।

(২) সব নেয়ামতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করা।

উল্লেখ্য, তাওয়াক্কুল মনের বিষয়, মুখের বিষয় নয়। তাই আল্লাহর কোন নেয়ামতের ভিত্তিতে শুধু মুখে ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বললেই শোকর আদায় হয়ে যায় না বরং প্রকৃত শোকর হল নেয়ামতের ভিত্তিতে মনে মনে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রফুল্ল হওয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে নেয়ামত দাতা আল্লাহর হুকুম পালনে তৎপর হওয়া। তবে এর সাথে সাথে খুশীতে যবান থেকে আলহামদু লিল্লাহ বের হলে সেটাও ইবাদত বলে গণ্য হবে এবং ছওয়াবের হবে।

খুশু’ খুযূ’ (স্থিরতা ও একাগ্রতা)

দেহ মন স্থির করে ইবাদত করা, একাগ্রতা সহকারে ইবাদত করা এবং চলাফেরা উঠা-বসায় উগ্রতা পরিহার করাকে বলা হয় খুশু’ খুযূ’। ইবাদতের মধ্যে দেহ স্থির করার অর্থ হল অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া না করা। আর মন স্থির করার অর্থ হল ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে উপস্থিত না করা এবং ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য কিছু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা। অনিচ্ছাকৃত ভাবে যেটা মনে এসে যায়, বান্দা তার জন্য দায়ী নয়।

এই খুশু’ খুযূ’ হছিল করার তরীকা হল–

(১) এই চিন্তা করবে যে, আমি আল্লাহর সামনে উপস্থিত, আল্লাহ আমার সব কিছু শুনছেন এবং দেখছেন, আর আল্লাহর কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে।

(২) আল্লাহর ভয় অন্তরে বসানো। এর জন্য পরবর্তী পরিচ্ছেদের বর্ণিত অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টির পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। বিশেষভাবে নামাযে মন স্থির করার পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

খাওফ বা আল্লাহর ভয়

শরীআতে খাওফ বা ভয় বলতে নিজের ব্যাপারে আল্লাহর আযাবের ভয়-ভীতির সম্ভাবনা বোধ করাকে বোঝানো হয়। এই ভয় এত উত্তম জিনিস যে, এটা এসে গেলে মানুষ থেকে কোন গোনাহ হতে পারে না। খাওফ বা আল্লাহর ভয় অর্জন করার উপায় হল−

(১) আল্লাহর আযাব গযবের কথা স্মরণ করা এবং চিন্তা করা।

রজা’ বা আল্লাহর রহমতের আশা

আল্লাহর আযাবের যেমন ভয় রাখতে হবে, তেমনি ভাবে আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত, জান্নাত এবং অনুগ্রহ লাভের আশাও মনে থাকতে হবে-নিরাশ হওয়া যাবে না। ভয় এতটা কাম্য নয় যে, আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে হতাশা জন্মাবে। আবার আল্লাহর রহমতের আশাও এতটা প্রবল হওয়া ঠিক নয় যাতে আল্লাহর বিধান লংঘন করার মত দুঃসাহস দেখা দেয় এই ভেবে যে, আল্লাহ রহমত করবেন। বরং ভয় ও আশা এতদুভয়ের মধ্যে ব্যালেন্স বা ভারসাম্যতা থাকতে হবে। এই রজা’ বা আল্লাহ্‌র রহমত হাছিলের মনোভাব সৃষ্টি করার উপায় হল−

(১) আল্লাহর অসীম ও অপার রহমতের কথা চিন্তা করা।

উল্লেখ্য, কেউ যদি শুধু আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও জান্নাত লাভের আশা করে আর তা লাভের পদ্ধতি অর্থাৎ, নেক আমল, তওবা প্রভৃতি অবলম্বন না করে, তাহলে সেটাকে রজা’ বা আশা বলা হবে না বরং সেটা হবে বীজ বপন না করে ফসল অর্জনের আশা করার মত অলীক কল্পনা।

আল্লাহর মহব্বত ও শওক

আল্লাহর সঙ্গে মহব্বত বা ভালবাসার অর্থ আল্লাহর গন্তুষ্টিকে অন্য সকলের গন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দেয়া। এরূপ মহব্বত রাখা ওয়াজিব। এরূপ মহব্বতের সর্বনিম্ন স্তর হল কুফ্‌রের উপর ঈমানকে প্রাধান্য দেয়া। এটা না হলে মানুষ মুমিনই থাকে না। তার পরের স্তর হল আল্লাহর বিধানকে অন্যের বিধানের উপর প্রাধান্য দেয়া। বিধান যে পর্যায়ের, তার প্রতি ভালবাসা বা সেটাকে প্রাধান্য দেয়ার হুকুমও সেই পর্যায়ের-ওয়াজিব হলে ওয়াজিব, মুস্তাহাব হলে মুস্তাহাব। উপরোক্ত ভালবাসাকে বলা হয় মহব্বতে আক্‌লী বা বুদ্ধিজাত ভালবাসা।

আর এক প্রকারের ভালবাসা রয়েছে যাকে স্বভাবজাত ভালবাসা বলে। তা হল-আল্লাহর সঙ্গে প্রাণের টান হয়ে যাওয়া, তাঁর কথা শুনলে তা মানার জন্য মন উদ্বেল হয়ে উঠা এবং তাঁর নাফরমানী ছেড়ে তাঁর আনুগত্য শুরু করে দেয়া। প্রথম প্রকারের ভালবাসা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত এবং তার উপর টিকে থাকলে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভালবাসা মনে সৃষ্টি হয়ে যায়। কুরআন ও হাদীছের আলোকে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টির জন্য বুযুর্গানে দ্বীন নিম্নোক্ত পন্থাসমূহ গ্রহণের কথা বলেছেন। পন্থাগুলি অত্যন্ত মনস্তাত্ত্বিক।

(১) দ্বীনের ইল্‌ম শিক্ষা করা। কারণ জ্ঞান অর্জন আল্লাহ সম্বন্ধে এমন পরিচিতি অর্জন হবে, যা আল্লাহ্‌র প্রতি আন্তরিক করে তুলবে।

(২) হিম্মত সহকারে শরীআতের যাহেরী বাতেনী সব ধরনের আমলের পাবন্দী করা, যাহের এবং বাতেন উভয়কে শুদ্ধ ও পবিত্র করা।

(৩) আমলের মধ্যে যে দিকটি আরামের সে দিকটি গ্রহণ করা (যদি তা গ্রহণে শরীআতের কোন বাধা না থাকে)। এভাবে নফ্‌ছ আমলে কষ্ট নয় বরং আরাম বোধ করবে। আর তাতেই আমলে আন্তরিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

(৪) আল্লাহ্‌র হুকুম আহকাম পুরাপুরি মেনে চলা। ফরয সমুহকে পুরাপুরি আদায় করার সাথে সাথে বেশী বেশী নফলে লিপ্ত হওয়া।

(৫)সাথে সাথে আল্লাহ্‌র মাহবূব-রাসূল (সা.)-এর পূর্ণ পায়রবী করা। আল্লাহ্‌র মহব্বত বৃদ্ধি করার নিয়তে নেক আমলে অটল থাকা।

(৬) কিছুক্ষণ নির্জনে বসে আল্লাহ আল্লাহ করা।

(৭) আল্লাহর সাথে যাদের মহব্বত সৃষ্টি হয়েছে এরূপ বুযুর্গদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা, তাঁদের সাহচর্য গ্রহণ করা, তাঁদের কাছে যাতায়াত করা, সম্ভব না হলে অন্ততঃ চিঠি পত্রের মাধ্যমে সম্পর্ক অব্যাহত রাখা।

(৮) নিজে কি করছি এবং তা সত্ত্বেও আল্লাহর কত দয়া এবং নেয়ামত তা স্মরণ করা। (নির্জনে বসে কিছুক্ষণ এটা চিন্তা করবে)।

(৯) দু'আ করবে যেন আল্লাহ তাঁর সাথে মহব্বত বৃদ্ধি করে দেন।

(১০) এই মোরাকাবা (ধ্যান) করা যে, আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন, তিনি আমাকে চান। এর দ্বারা বান্দার অন্তরেও ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

(১১) আল্লাহর আছমায়ে হুছনা (উত্তম নামসূমহ)-এর সাথে মহব্বত পয়দা করা এবং বেশী বেশী সেগুলো পাঠ করা।

(১২) বেশী বেশী তওবা করা।

হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগ্য ফিল্লাহ

ঈমান পূর্ণ করার জন্য যেমন আল্লাহকে ভালবাসতে হবে, আল্লাহর প্রতি ভক্তি রাখতে হবে, তদ্রূপ আল্লাহ যে ব্যক্তিকে, যে বস্তুকে বা যে কাজ ও যে গুণকে ভালবাসেন তাকেও ভালবাসতে হবে। একে বলা হয় হুব্ব ফিল্লাহ অর্থাৎ, আল্লাহর জন্য দুস্তী রাখা বা আল্লাহর ভালবাসার পাত্রকে ভালবাসা। এর বিপরীত আল্লাহ যে ব্যক্তিকে, যে বস্তুকে বা যে কাজ ও যে দোষকে ঘৃণা করেন, না পছন্দ করেন তাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করতে হবে। একে বলে বুগয ফিল্লাহ অর্থাৎ, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা বা আল্লাহর দুশমনের সঙ্গে দুশমনী রাখা। এমনিভাবে রাসূলের প্রিয় যারা তাদেরকে ভালবাসা এবং রাসূলের দুশমন যারা অন্তর থেকে তাদের সাথে দুশমনী রাখাও ঈমানের জন্য জরূরী।

যুহ্দ বা দুনিয়ার মোহ ত্যাগ

বৈধ আসবাব সম্পদ বর্জন করা নয় বরং সম্পদের মোহ বর্জন করার নাম হল যুহ্দ। সম্পদ পেলেও খুব আনন্দিত নয় আবার না পেলেও বা পেয়ে হাতছাড়া হলেও দুঃখিত নয়-মনের এই অবস্থাই হল যুহ্দের উচ্চস্তর। একজন যাহেদ বা দুনিয়ার মোহত্যাগকারী ব্যক্তি সম্পদ উপার্জনের জন্য চেষ্টা করবে সম্পদের প্রতি মোহের কারণে নয় বা প্রবৃত্তির চাহিদা পুরণের উদ্দেশ্যে নয় বরং প্রয়োজন পুরণ করার এবং আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে। তার নজর থাকবে আল্লাহর ও আল্লাহর নিকট যে পুরস্কার রয়েছে তার প্রতি, পার্থিব সম্পদের প্রতি নয়।

যুহ্দ অর্জনের পন্থা হল-এই চিন্তা করা যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাত স্থায়ী, দুনিয়ার সব কিছুই ত্রুটিপূর্ণ ও দোষযুক্ত আর পরকালের সব কিছু দোষ ও ত্রুটিমুক্ত।

শৈথিল্য, সংকল্পহীনতা প্রভৃতি ইচ্ছার ব্যাধি প্রসঙ্গ

'চরিত্র মনোবিজ্ঞান' অধ্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন কু-চরিত্র বর্জন, সু-চরিত্র অর্জন ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করার যাবতীয় ক্ষেত্রে একটা বিষয় প্রধানতঃ লক্ষণীয়। তা হল-নিজের প্রবৃত্তি ও রিপুর তাড়না সমূহকে প্রতিহত করতে ইচ্ছা ও সংকল্পকে শক্তিশালী করতে হয় এবং মন্দের দিক থেকে ভালর দিকে তাকে ধাবমান করতে হয়। কিন্তু অনেক সময় এই ইচ্ছা ও সংকল্প শক্তিও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইচ্ছা ও সংকল্পে শৈথিল্য এবং জড়তা এসে

অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তখন ব্যক্তি একটা কাজকে মন্দ জানা সত্ত্বেও এবং তার বিপরীতটাকে ভাল এবং তা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় জানা সত্ত্বেও ইচ্ছার দুর্বলতার ফলে তা করতে পারে না। কখনও ভালর বিপরীতে মন্দ চিন্তাও এক ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এগুলো সব ইচ্ছা শক্তির ব্যাধি। ইচ্ছা শক্তি এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়লে অভ্যাস ও সংশ্রব থেকে পুনঃ পুনঃ সাহায্য নিয়ে তাকে শক্তিশালী করে তুলতে হয়। এরূপ অবস্থায় মনের উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিতে হয়, যা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও চেষ্টা সাপেক্ষ হওয়ার ফলে চিন্তা শক্তিকে সবল করে তুলতে পারে। যেমন শরীরে ব্যাধি হলে শরীরের জন্য কষ্টসাধ্য ব্যায়াম করলে শরীরের ব্যাধি ও দুর্বলতা দূর হয়, তদ্রূপ ইচছা ও মনের জন্য কষ্টকর কাজ করলেও ইচ্ছা ও মন সবল হয় এবং ইচ্ছার দুর্বলতা দূরীভূত হয়।

গ্রন্থ সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জী

লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম
ابن کثیر	ابن کثیر (تفسیر)
ابو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة	ابن ماجۃ
ابو داؤد السجستاني	ابوداؤد شریف
حضرت مولنا شاہ اشرف علی تھانوی	آداب المعاشرت
ابوالحسن علي بن احمد الواحدى	اسباب النزول
عارف باللہ ڈاکٹر محمد عبدالحی	اسوۂ رسول اکرم
حضرت مولنا شاہ اشرف علی تھانوی	اصلاح انقلاب امت
شاه ولي الله الدهلوى	الفوز الكبير
جلال الدين السيوطي	اللالي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة
الشيخ شمس الدين السخاوى	المقاصد الحسنة
محمد بن اسماعيل البخارى	بخاری شریف
شیخ الحدیث مولنا زکریا	تاریخ مشائخ چشت
ترتیب جدید از رسائل تھانوی	تربیت اولاد اور اس کے متعلقات
ابوعیسی محمد بن عیسی الترمذی	ترمذی شریف
شیخ الحدیث مولنا محمد زکریا	تقریر بخاری
الفقيه ابو الليث السمرقندى	تنبيه الغافلين
محمد بن محمد بن سليمان	جمع الفوائد
شاه ولي الله الدهلوى	حجة الله البالغة
حکیم الاسلام قاری محمد طیب	دینی دعوت کے قرآنی اصول
علامه محمود الوسى	روح المعانى
ادریس کاندھلوی	سیرۃ المصطفی
ابوعیسی محمد بن عیسی الترمذی	شمائل ترمذی

طالبان علوم نبوت کا مقام اور انکی ذمہ داریاں	ابوالحسن علی ندوی
عمدة القارى (شرح بخارى)	بدر الدين العينى
فتح البارى (شرح بخارى)	علامه ابن حجر عسقلاني
فتح الملهم (شرح مسلم)	علامہ شبیر احمد عثمانی
فضل الباری (شرح بخاری)	علامہ شبیر احمد عثمانی
كتاب الاذكار	محيي الدين ابو زكريا يحيي بن شرف النووى
ماهنامہ دار العلوم ۱۹۷۴ ستمبر	مقالہ تعلیم و تربیت محمد رضوان قاسمی
مجمع الزوائد	الحافظ نور الدين الهيثمي
مسلم شریف	ابوالحسن مسلم بن الحجاج النيسابورى
مشكوة المصابيح	ولي الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الله
معارف القران	مفتی محمد شفیع
আহকামে যিন্দেগী	মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
নীতি দর্শন	মুল. মাও. হেফজুর রহমান সিওহারবী
মানসিক ব্যাধি	ডা. দেওয়ান ওয়াহিদুন নবী
মনোবিজ্ঞান ও জীবন	নিহাররঞ্জন সরকার
সমাজ মনোবিজ্ঞান	ড. জামান